গল্প সূচি

সিওতার সৈনিক ॥ বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট্‌ / জার্মানি ৯
বিনিদ্র রাত ॥ আবু রায়েদ / প্যালেস্টাইন ১২
সেবাস্তপোলের কাহিনী ॥ লেভ তলস্তয় / রাশিয়া ১৭
আন্দ্রেস্কো ॥ এলিন পেলিন / বুলগেরিয়া ৩৬
চেলসোর বিয়ে ॥ বি ট্রাভেন / আমেরিকা ৪৬
স্যুটকেস ॥ এজকেল মেফাহেলি / দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৬
সহযোগী ॥ লুই আরাগঁ / ফ্রানস ৬৩
একনায়কের ছেলে ॥ সিগফ্রিড লেনৎস / জার্মানি ৭৯
সিডনীর জন্য স্মারকলিপি ॥ হাওয়ার্ড ফাস্ট / আমেরিকা ৮৭
ইফতারী ॥ রশীদ জাহান / পাকিস্থান ১০৩
পলাতকেরা ॥ আলেহো কার্পেন্তিয়ের / কিউবা ১১২
দেওয়াল ॥ জঁ-পল সার্ত্র্ / ফ্রানস ১২৫
কফন ॥ প্রেমচন্দ / ভারত ১৪৯
আমৃত্যু আজীবন ॥ হাসান আজিজুল হক / বাংলাদেশ ১৫৭
গর্দভচন্দ্রের কাহিনী ॥ অ্যালান মার্শাল / অস্ট্রেলিয়া ১৮১
বেঞ্চি ॥ রিচার্ড রাইভ / দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮৫
বসন্তের স্রোতে আজ এসেছে জোয়ার ॥ চেং ওয়ান-লঙ / চীন ১৯৩
একটি মেয়ে, একটি নদী ॥ মাইকেল অ্যান্টনি / ত্রিনিদাদ ২০৮
জন্মেছি এই দেশে ॥ আন দাক / ভিয়েতনাম ২১৪
নিষিদ্ধ ফল ॥ মিগজেনি / আলবেনিয়া ২২৬
জাইলোফোনের ঝংকার ॥ শিয়াংফেই / লাওস ২২৯

লেখকদের সম্পর্কে ২৩৮

আ ন্ত র্জা তি ক

প্রতিবাদের গল্পসংগ্রহ

বে র টো ল্ট ব্রে শ্‌ ট্‌

সিওতার সৈনিক

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ ফ্রানসের সিওতার ছোট্ট এক বন্দর-সহরে একটা জাহাজ জলে-ভাসানো উপলক্ষে মেলা বসেছে। মেলায় গিয়ে দেখি পার্কে এক ফরাসি সৈনিকের ব্রোঞ্জমূর্তিকে ঘিরে উৎসাহী মানুষের ভিড়। কাছে এগিয়ে যেতেই বুঝতে পারি ওটা কোনো মূর্তি নয়, ধূসর রঙের লম্বা কোট গায়ে একজন জ্যান্ত মানুষ—মাথায় তার টিনের টুপি, বন্দুকের ডগায় বেয়নেট এঁটে জুনের এই তপ্ত রোদে একটা বেদির ওপর নিশ্চল দাঁড়িয়ে। লোকটির মুখে ও হাতে ব্রোঞ্জ রঙের প্রলেপ। তার পেশি নিথর, এমনকি চোখের পাতাটি পর্যন্ত পলকের জন্য নড়ে ওঠে নি।

লোকটির পায়ের কাছে বেদির গায়ে একটি কাঠের ফলক আঁটা—তাতে লেখা:

মা নু ষে র মূ র্তি

আমি, চার্লস লুই ফ্রঁাসাদ, ...তম বাহিনীর প্রাক্তন সৈনিক। ভেদুঁতে আমাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার ফলে এখন আমার অনির্দিষ্টকাল একটি নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকার আশ্চর্য ক্ষমতা জন্মেছে। চিকিৎসকেরা আমাকে পরীক্ষা করেছেন এবং তাঁদের মতে এ হল ব্যাখ্যার অতীত এক ব্যাধি। দয়া ক'রে একটি পরিবারের এই বেকার কর্তাকে সামান্য সাহায্য করুন।

থালার দিকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে মাথা নেড়ে আমরা ভিড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আমরা ভাবতে থাকি, আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত এই সেই মানুষ—হাজার হাজার বছরের অপরাজেয় সৈনিক, যাকে নিয়ে রচিত হয়েছে ইতিহাস। 'আলেকজাণ্ডার, সীজার ও নেপোলিয়নের মহান কীর্তি সে সম্ভব ক'রে তুলেছিল—যে-কীর্তির কথা আজকাল আমরা স্কুলের পাঠ্যবইয়ে পড়ি। এ-ই সেই মানুষ। এখন তার চোখে পলক পড়ে না। সে সাইরাসের তীরন্দাজ, ক্যামবাইসের ধারালো চাকাওয়ালা রথের সারথি, তাকে মরুভূমির বালু অনন্ত সময়েও সমাধিস্থ করতে পারে নি। সে-ই সীজারের সৈন্যবাহিনী, চেঙ্গিস খাঁর অশ্বারোহী সৈন্য, চতুর্দশ লুই-এর সুইস প্রহরী, প্রথম নেপোলিয়নের দক্ষ গ্রেনেড যোদ্ধা। তার অধীত সেই আশ্চর্য বিদ্যা—যদিও তা এই মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মতো অসাধারণ কিছু নয়—যাতে ধ্বংসের সমস্ত উপকরণ তার ওপর প্রয়োগ করা হলেও সে তার অনুভূতির সঙ্গে বেইমানি করে না। যখন তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, (সে বলে) তখনো সে পাথরের মতো নিশ্চল, ভাবলেশহীন। প্রস্তর, ব্রোঞ্জ, লৌহ—সকল সম্ভাব্য যুগের ধারালো অস্ত্রে ছিন্নভিন্ন, আর্টাজেক্স´ও সেনাপতি লুডেনডর্ফের যুদ্ধরথের আক্রমণে নিহত, হ্যানিবলের হস্তীবাহিনী ও অ্যাটিলার অশ্বারোহীদের তলায় পিষ্ট, কয়েক শতাব্দীর ক্রম উন্নত বন্দুক থেকে বেরিয়ে আসা পায়রার ডিমের মতো বড় বা মৌমাছির ডিমের মতো ছোট উড়ন্ত ধাতু, দানবিক গুলতি হতে নির্গত প্রস্তরখণ্ড বা রাইফেলের গুলিতে ছিন্ন দেহ, সে দাঁড়িয়ে, অপরাজেয়, নতুন নতুন ভাষায় সদা পরিবর্তিত আদেশে চালিত। কিন্তু এসব কেন—এ-প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই। যে-ভূমি সে জয় করে সেই ভূমির দখল সে নেয় না, রাজমিস্ত্রিরা যেমন যে-বাড়ি বানায় সে-বাড়িতে বাস করে না। আসলে যে-ভূমির রক্ষাকার্যে সে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত, সেই ভূমিতেই তার কোনো অধিকার নেই। এমনকি তার হাতের অস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম তার নিজের নয়। অথচ বিমান আর নগর-প্রাচীর থেকে বর্ষিত জ্বলন্ত মৃত্যুবৃষ্টির নিচে সে দাঁড়িয়ে, তার পায়ের তলায় ভয়ংকর বিস্ফোরক আর মরণফাঁদ, তাকে ঘিরেই যত বিষাক্ত গ্যাস ও মারাত্মক ব্যাধি। রক্তমাংসের সে-ই বর্শা ও তীরের লক্ষ্য ও খাদ্য, ট্যাংকের তলায় নরম জমি, বিষাক্ত গ্যাসের ঘ্রাণ তাকেই নিতে হয়। সামনে তার শত্রু, পেছনে সেনাপতি।

এক অদৃশ্য হাত তার জন্য জ্যাকেট বানায়, লোহা পিটিয়ে অস্ত্র আর তার মাপমতো জুতো বানায়! আর সে এক অদৃশ্য পকেটে টাকা ভর্তি করে! দুনিয়ার সকল ভাষার অপরিমেয় কোলাহল তাকে উত্তেজিত করে! এমন কোনো ঈশ্বর

নেই যার সে আশীর্বাদধন্য নয়। তার ধৈর্য ও অপেক্ষা ভয়াবহ কুষ্ঠব্যাধির মতো। আর মানুষটির মনও দুর্ভেদ্য—এও এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

এ কোন ধরনের জীবন্ত সমাধি, যার পরিণামে সেই মানুষটির এই ভয়াবহ দানবিক ও চূড়ান্ত সংক্রামক ব্যাধি? আমরা ভাবতে থাকি।

আমরা নিজেদেরই প্রশ্ন করি, এ-ব্যাধি কি কোনোদিনই সারবে না?

অনুবাদ। আশিস সেন

আবু রায়েদ

বিনিদ্র রাত

অন্যমনস্কভাবে হাত তুলে সে ঘড়ি দেখল। রাত বারোটা এখন। সেকেণ্ডের কাঁটাটা তার চোখের সামনে ঘুরে চলল নিঃশব্দে, যেন নতুন দিনের আলো-ফোটার আগেই তাকে ঘুমিয়ে পড়তে বলল আরেকবার।

'আরো তিন ঘণ্টা!' অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল সে আপনমনেই। 'ইচ্ছে করলেই আরেকটু ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু যদি ঠিক সময়ে জেগে উঠতে না পারি! এই মুহূর্তটার জন্যেই তো আমি অপেক্ষা ক'রে আছি। এই দিনটার জন্যে যে কতদিন অপেক্ষা ক'রে আছি!' খালিদ একটু উত্তেজিত হল। অতীতের ঘটনা-গুলো মানসপটে ভেসে উঠল।

প্রতি বৃহস্পতিবার সকালবেলায় আমি মাকে বলতাম, আমাকে মাঠে যেতে দিতে। তিনি কখনো মত দিতেন, কখনো দিতেন না। কিন্তু আমি ছিলাম বেশ শক্তসমর্থ। বলিষ্ঠ দু'টো হাত দিয়ে কাস্তে বইতে পারব, ফসল কাটার সময়ে বাবাকে সাহায্য করতেও পারব। গাঁয়ের সবাই বলে, কারো বয়স ষোল বছর হলেই সে বড় হয়ে যায়। মা বলেন, আমার বয়স দশ। তিনি নিশ্চয়ই হিসেবে ভুল করেছেন।

'পরের বৃহস্পতিবার খবরদার তোমার বাবার সাথে মাঠে যেও না'—মা কেন এমনভাবে ফিস ফিস ক'রে আমাকে সাবধান ক'রে দিলেন, বুঝতে পারলাম না। বাবা চিন্তিত মুখে বিছানায় শুয়ে আছেন। সিগারেট টানছেন ক্রমাগত আর ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছেন। নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা ভাবছেন তিনি। মায়ের কথাগুলো আমার একদম পছন্দ হল না। মা কেন যে আমাকে এখনো ছোট্ট ভাবেন! হুঁ…দশ…! বয়সের হিসেব কি দিন গুণে হয়! আমি মাঠে যাবোই, ফসল কাটতে বাবাকে সাহায্য করব।

বাবা আমার দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল। তিনি বললেন,

'খোকন, যা বলছি মন দিয়ে শোনো। তুমি এই মাটিতে জন্মেছ, বড় হয়েছ। তোমার রক্ত মাংস হাড় সবই এই সুন্দর মাটির দান। আমিও জন্মেছি এই মাটিতে, আমার রক্ত মাংসও এই মাটির দান। আমাদের পূর্বপুরুষদের ঘাম রক্ত মাংস মিশে আছে এই মাটিতে। কিন্তু আজ···,' তিনি থেমে গেলেন।

'বাঃ, চমৎকার! তাহলে তুমি এই মাটিতে আমার রক্ত ঘাম আরো বেশি ক'রে মিশিয়ে দেবার জন্যে পরের বৃহস্পতিবার আমাকে নিশ্চয়ই তোমার সাথে মাঠে যেতে দেবে?'

'না, খোকন। এই বৃহস্পতিবারে নয়।'

'তুমি কি মনে করো, যারা আমাদের দেশের মাটি জোর ক'রে দখল করতে আসছে, সেই ইহুদিদের আমি ভয় করি? দু'মাস আগে কেনা তোমার ঐ রাইফেলটা দিয়ে তুমি যখন গুলি চালাবে, আমি তখন তোমার পাশেই থাকব। পাথর ছুঁড়ব ওদের দিকে। কিন্তু বাবা, তুমি ঐ-রাইফেলটা দিনের বেলা লুকিয়ে রেখে কেবল রাতেই বের করো কেন? এটাতো দেখতে বেশ সুন্দর, আর আমাদের দেশকে রক্ষা করতেও সাহায্য করছে!'

তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়ালে লুকোতে চাইলেন তাঁর মুখের ভাব। মা-র দিকে তাকাতেই দেখলাম, তাঁর চোখ ছাপিয়ে জল গড়াচ্ছে। তবে আমি কি বৃহস্পতিবার মাঠে যেতে পারব না! রাইফেলটা দিনের বেলায় লুকিয়ে রাখা হয় কেন? বাবা একটা যন্ত্রণাকর কিছু লুকোতে চাইছেন। মা কাঁদছেন।

আমি ভাবলাম বাবা মা-র যে-গয়না বিক্রি ক'রে রাইফেলটা কিনেছেন, মা বোধ হয় সে-গয়নার শোকেই কাঁদছেন। কিন্তু রাইফেলটা তো গয়নাগুলোর চেয়েও সুন্দর, সোনার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দর! সোনা থেকে তো মাটি তৈরি করা যায় না, বরং মাটি থেকেই সোনা পাওয়া যায়। তুলো, গম, কমলালেবু, খেজুর —সবই তো এই সুন্দর মাটির দান।

ডুমুর গাছটার নিচে আমি আর আমার পাঁচ ভাই খেলা করতাম। তাদের সাথে খেলা করতাম, আবার তাদের দেখাশোনাও করতাম। তারপর ইহুদিরা এল। তারা তাদের হিংস্র তলোয়ার উঁচিয়ে ধরল। হায়রে, আমার সেই খুশির আর ভালবাসার গাছ আজ কোথায়?

অন্যমনস্কভাবে খালিদ আবার ঘড়ি দেখল। রাত সোয়া বারোটা। 'আয়ে!

ঘড়ির কাঁটাগুলো নড়ছে না নাকি! খারাপ হয়ে যায় নি তো! এতক্ষণে মাত্র পনেরো মিনিট কাটল! হতভাগা ঘড়িটা নিশ্চয়ই স্লো যাচ্ছে। এটার বয়স এখন কুড়িরও বেশি।'

সেই ঘটনার দু'বছর আগে কাকা এই ঘড়িটা কিনেছিলেন। এটা রীতিমতো দামী আর খুব ভাল ঘড়ি ছিল। কাকা এটার জন্য খুব গর্ব করতেন। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে, কাকা আমাদের গ্রাম আর সবকিছু ছেড়ে চলে গেলেন। এই ঘড়িটা সে-স্মৃতি শুধু বার বার মনে পড়ায়।

'কাকা, ঘড়িটা আমায় দাও না?'

'দেখো খোকন, তুমি আমার খুব আদরের, আর এই ঘড়িটাও তাই। এটা আমার সব হারানো স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনে দেয়। আমার সমস্ত জিনিসের মধ্যে এটাই শুধুমাত্র রয়ে গেছে। ব্রিটিশ আর ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বছরগুলোতে এটাই ছিল আমার প্রতিটি সংগ্রামের সাথী। তুমি বরং অন্য কিছু চাও।'

খুব ধীরে ধীরে কেটে গেল দিনগুলো। এই ঘড়িটার মতোই প্রচণ্ড উদ্বেগময় তার গতি। এক-একটা দিন এক-একটা বছরের থেকেও দীর্ঘতর, এক-একটা বছর এক-একটা শতাব্দীর থেকে।

সেই বৃহস্পতিবার! সব ঘটনাই আমার খুব ভাল মনে আছে। আমরা সকলে ডুমুরতলায় বসেছিলাম। কাকা আমাকে বললেন, 'খোকন, মনে আছে আটবছর আগে এই ঘড়িটা তুমি চেয়েছিলে?'

'পঞ্চাশ বছর বয়সেও তো তোমার দারুণ স্মৃতিশক্তি, কাকা!'

'কোনো কোনো ঘটনা মানুষের মনে এত স্থায়ীভাবে ঠাঁই ক'রে নেয় যে কোনো কিছুতেই তা মুছে যায় না। তোমরা আমার নিজের ছেলের মতো। যুদ্ধে মারা যাবার আগে তোমার বাবাও আমাকে ছেলের মতোই দেখতেন।' কান্নায় তার গলার স্বর থেমে গেল। ঘড়িটা খুলে ফেললেন তিনি। চোখ থেকে গালের ওপর গড়িয়ে-আসা জলের ধারা মুছে ফেলে ঘড়িটা আমার হাতে পরিয়ে দিলেন।

আমাদের পাঁচভাইয়ের সাথে সেদিন কাকা অনেকক্ষণ গল্প করলেন। অনেক খেলা, ঠাট্টা তামাশা করলেন। তখন সবথেকে ছোট ভাইটির বয়স আট, আমার আঠারো। মাঝরাতের পর যখন আসর ভাঙল, কাকা আমাকে ফিস ফিস ক'রে

বললেন, 'এখন থেকে তুমিই এ-পরিবারের কর্তা। মনে রেখ, তোমার বাবা দেশের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। মনে রেখ, শত্রু ইহুদিরা তোমার দু'ভাইকে খুন করেছে। মনে রেখ, তুমি একজন উদ্বাস্তু, তোমার মাতৃভূমিকে ওরা জোর ক'রে কেড়ে নিয়েছে, ধর্ষণ করেছে। আমি একটা কাজে সপ্তাখানেকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। তোমার ভাইদের দেখাশোনা কোরো, তাদের দেশকে ভালবাসতে শিখিও।'

চাঁদ ডুবে গেল। গাছের পাতা ঝরে পড়ল। হু হু ক'রে বাতাস বয়ে গেল বিষণ্ণ পৃথিবী জুড়ে। তিনদিন পরে গাঁয়ের মানুষ আমাদের খবর দিতে এল – একজন বীরের মৃত্যুর খবর।

খালিদ ঘড়িটাকে স্পর্শ করল। সেটাকে আদর করল, যেন নিজের আদরের সন্তান। তারপর গভীর আরামে চোখ বুজল।

তার স্মৃতির দৃশ্যগুলো ভিড় করছে পরপর, মনের আয়নায় দুরন্ত বেগে ছুটছে ঘটনাগুলো। এক ধারাবাহিক খেলার মতো তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একদিন থেকে আর একদিনে, এক বছর থেকে আর একবছরে।

তাঁবুর ভেতরে এই প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডাতেও তার কপালে জমে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। মুখের অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হচ্ছে ঘন ঘন। 'সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থন না পেলে ইহুদিরা তাদের রাজত্ব গড়ে তুলতে পারত না, আগ্রাসী নীতির সাহায্যে তাকে টিকিয়ে রাখতে পারত না।' সে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারল তাঁবুর গায়ে। উত্তেজনায় উঠে বসল। কিন্তু একটু পরেই আবার শুয়ে পড়ল।

'আমাদের জনগণ সংগঠিত ছিল না বলেই শত্রুরা ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। জনগণ তাদের সীমিত শক্তি নিয়েই রুখে দাঁড়িয়েছিল ইহুদি-আক্রমণের বিরুদ্ধে। সৈন্যরাও এই প্রতিরোধে সামিল হয়েছিল। তারা ইহুদি আর ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত ছিল। অথচ মুষ্টিমেয় ক'জন লোক দেশটাকে বিক্রি ক'রে দিল – মাতৃভূমিকে আর জনগণকে।'

খালিদ পাশ ফিরল। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটস্বরে বলল, 'সেদিনের সঙ্গে আজকের পরিস্থিতির কী অদ্ভুত মিল! গতকাল – সাময়িক যুদ্ধবিরতি, আলোচনা, রোডস চুক্তি। আর তার পরিণতিতে কত মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে তাঁবুতে। আর আজ – রাষ্ট্রসংঘ, শান্তি ও আত্মসমর্পণের প্রস্তাব ও চক্রান্ত। রজার্স পরিকল্পনা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, আর আব... তাঁবুতে তাঁবুতে হাজার হাজার উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়!

কঠিন হয়ে উঠল খালিদের মুখ, চোখে তার দৃঢ় সংকল্পের ভাষা। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার হাসি ফুটল তার মুখে।

কিন্তু কাল আর আজ এক নয়। জনগণ আজ সংগঠিত। তারা লড়াই ক'রে অধিকার ছিনিয়ে নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। জনগণ জন্ম দিয়েছে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ নতুন নেতাদের। সুস্পষ্ট আজ বিপ্লবের পথ। তাই আজ আমরা গান গাইছি :

ভাইসব, দৃঢ় আস্থা রেখেছি আমরা
আমাদের অধিকারভ্রষ্ট আর শৃঙ্খলিত জনতার ওপর।
তাই হাতে তুলে নিয়েছি বন্দুক
যাতে আমাদের উত্তরপুরুষ
কাস্তে চালাতে পারে স্বাধীনভাবে।

'খালিদ, খালিদ! ওঠো। সময় হয়েছে। এবার জাগো, ভাই! তুমি ঘুমের মধ্যে আমাদের গান গাইছিলে বজ্রের মতো গম্ভীর আর ঝর্নার মতো মিষ্টি গলায়। উঠে দাঁড়াও। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।'

খালিদ চোখ খুলল, যেন সে আদৌ ঘুমায় নি। ঘড়িটার দিকে তাকালো। তার সারা দেহ যেন এক অনাস্বাদিত পুলকে শিহরিত হয়ে উঠছে।

'আজ বৃহস্পতিবার। প্রতি সপ্তাহে এই দিনটিতেই আমি বাবার সাথে মাঠে যেতাম, তাঁকে সাহায্য করতাম। আর এমনি এক বৃহস্পতিবারেই কাকাকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলাম।'

খালিদ উঠে দাঁড়ালো তাড়াতাড়ি। তার চোখদু'টো জ্বলজ্বল করছে সাহসে। তার দলের বন্ধুদের মতো সেও প্রস্তুত হয়ে নিল। কাঁধে তুলে নিল মেশিনগান। তারপর কদম ফেলে এগিয়ে চলল মাথা উঁচু ক'রে। তাদের কণ্ঠস্বর ঐকতান তুলল একই গানের সুরে :

তাই হাতে তুলে নিয়েছি বন্দুক
যাতে আমাদের উত্তরপুরুষ
কাস্তে চালাতে পারে স্বাধীনভাবে।

অনুবাদ। শেষাদ্রি চৌধুরী

লেভ তলস্তয়

সেবাস্তপোলের কাহিনী

সাপুন পাহাড়ের মাথার উপরকার আকাশ ভোরের রাঙা আলোয় সবেমাত্র রাঙিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। গাঢ়-নীল সমুদ্রবক্ষ ইতিমধ্যেই অন্ধকারের আবরণ দূরে সরাইয়া ফেলিয়াছে এবং সূর্যের প্রথম রশ্মি কখন আসিয়া তাহার উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে থাকিবে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। উপসাগরের বুক হইতে একটা তীক্ষ্ণ শীতল কাঁচা কুয়াশা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কোথাও কোন বরফ নাই, চারিপাশে সবকিছুই কালো; কিন্তু ভোরের তুষারের তীক্ষ্ণ তুহিনস্পর্শে ঠোঁট জ্বলিয়া যায় এবং পায়ের নীচেকার মাটি মচ্‌মচ্ করিয়া উঠে। একমাত্র দূর সমুদ্রের অবিশ্রান্ত মৃদুমর্মর এবং ক্বচিৎ কখনও বাতাসে গড়াইয়া-গড়াইয়া ভাসিয়া-আসা সেবাস্তপোলের তোপধ্বনিই প্রভাতের নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। দূর জাহাজের আটটি ঘণ্টার শব্দ ভাসিয়া আসে।

উত্তরদিকে রাত্রের নীরবতা ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে দিনের কর্মব্যস্ততা শুরু হইয়াছে। কোথাও একদল সৈন্য বুটের খট্ খট্ শব্দ করিতে করিতে ডিউটি শেষ-হওয়া রাত্রির প্রহরীদের স্থান লইতে চলিয়াছে। একজন ডাক্তার দ্রুত পায়ে চলিয়াছেন হাসপাতালের দিকে। একজন সিপাহী তাহার ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থল হইতে কোনমতে বাহির হইয়া আসিল এবং ব্রোঞ্জের মত মুখখানি বরফের মত ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিল। এতক্ষণে পূর্বদিক প্রভাতের গোলাপী আভায় ভরিয়া উঠিয়াছে। সিপাহীটি সেইদিকে মুখ ফিরাইয়া বিড় বিড় করিয়া প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিল এবং নিজের বুকের উপর দ্রুত ক্রুশচিহ্ন আঁকিল। প্রায় মাথা পর্যন্ত রক্তমাখা লাশে ভর্তি উটে-টানা একখানি লম্বা ভারী 'মাজারা' গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে কবরখানার দিকে চলিয়াছে লাশগুলি মাটি-চাপা দিবার জন্য। জাহাজ-ঘাটার কাছাকাছি গেলে কয়লা, সার, ভিজেমাটি ও মাংসের এক অদ্ভুত গন্ধ নাকে আসে। জ্বালানীকাঠ, মাংস, চটের বেড়ায় ঘেরা মাটির গাদা, লোহা প্রভৃতি হাজার রকমের জিনিস এই জাহাজঘাটায় স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে। এই জাহাজ-

ঘাটায় ভিড় করিয়াছে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সিপাহীরা ; কাহারও কাঁধে বন্দুক ও থলি, কাহারও বা নাই। ধূমপান করিতেছে, চীৎকার করিয়া বাপান্ত করিতেছে, ভারী ভারী মাল ঠেলিয়া ঠেলিয়া স্টীমারে তুলিয়া দিতেছে। স্টীমারখানি জাহাজঘাটাতেই ভিড়িয়া রহিয়াছে, উহার চোঙ হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে। অনবরত লোকভর্তি নৌকা আসিতেছে ও চলিয়া যাইতেছে। সিপাহী, মাল্লা, কারবারী, স্ত্রীলোক—সবরকমের লোকই আসা-যাওয়া করিতেছে এইসব নৌকায়।

দুই-তিনজন অবসরপ্রাপ্ত নাবিক চীৎকার করিয়া ডাকে, 'কোথায় যাবেন, কর্তা ? গ্রাফ্‌স্কাইয়ায় ? আসুন পার করে দিচ্ছি।' সাহায্য করিবার আগ্রহে নৌকার উপরে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায়।

যে-লোকটি সবচেয়ে কাছে তাহাকেই ঠিক করি। নৌকার কাছে কাদার মধ্যে একটি মরা ঘোড়া পড়িয়া আছে এবং উহার কিছুটা পচিয়া গিয়াছে। উহা ডিঙাইয়া পার হইয়া নৌকাটির হালের পাশে বসিলাম। ঠেলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। চারিপাশের সমুদ্র এখন প্রভাতের সূর্যালোকে ঝলমল করিতেছে। আমার মুখোমুখি বসিয়া উটের লোমের কোটপরা একজন বুড়ো মাল্লা এবং লম্বা মাথাওয়ালা এক ছোকরা। দুইজনে নিঃশব্দে সযত্ন মনোযোগে দাঁড় টানিয়া চলিয়াছে। সমস্ত উপসাগরের বিস্তীর্ণ বক্ষ জুড়িয়া এখানে ওখানে জাহাজ। জাহাজগুলির বিরাট বিরাট খোলের সারা গায়ে দাগটানা। কালো কালো বিন্দুর মত ছোট্ট ছোট্ট নৌকাগুলি রৌদ্রঝলকিত নীল সমুদ্রবক্ষের উপর দিয়া চলাচল করিতেছে। জাহাজের খোলগুলি ও বিন্দুবৎ এই নৌকাগুলিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দেখি। তাকাইয়া থাকি অপরপারে সহরের চমৎকার দালানগুলির দিকে। প্রভাতের সূর্যালোক পড়িয়া দালানগুলির গায়ে লাল্‌চে আভা দেখা যায়। চোখে পড়ে দূরে ফেনায়িত সাদা রেখা, চোখে পড়ে নিমজ্জিত জাহাজগুলির কালো কালো মাস্তুলগুলি সমুদ্রের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। চোখে পড়ে দূরে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ দিকচক্রবালে শত্রুর নৌবহর। চোখে পড়ে ফেনায়িত জলের ঘূর্নি আর হালের আঘাতে নোনা বুদ্বুদের নৃত্য। কানে আসে হাল পড়ার নির্দিষ্ট, নিয়মিত ঝপ্‌ঝপ্‌ শব্দ ; কানে আসে জলের উপর দিয়া ভাসিয়া-আসা নানা মানুষের নানা কণ্ঠস্বর ; আর কানে আসে কামান দাগার গম্ভীর আওয়াজ। মনে হয়, সেবাস্তপোলে এই আওয়াজের তীব্রতা ক্রমেই বাড়িতেছে।

সেবাস্তপোলে আছি মনে হইতেই সাহসে ও গর্বে বুক ভরিয়া উঠিবেই। শিরায় শিরায় রক্ত দ্রুততর বহিতে থাকিবে।

'কিস্তেনস্তিনের[১] পাশ দিয়ে বেয়ে যান কর্তা,' বুড়ো মাল্লা বলে। বলিয়াই ঘাড় ঘুরাইয়া সে তাকাইয়া দেখে জাহাজের হাল হইতে দক্ষিণ পাশ বরাবর বাহির হইবার যথাযোগ্য নির্দেশ আমি দিয়াছি কিনা।

পাশ দিয়া যাইবার সময় মাথা তুলিয়া জাহাজটিকে দেখিতে দেখিতে লম্বামাথা ছোকরা মাঝিটি বলিয়া উঠে, 'এখনও এর সমস্ত কামানগুলিই ঠিক আছে।'

বুড়ো মাঝিও মুখ তুলিয়া জাহাজখানিকে দেখে। তারপর বলে, 'থাকবে বৈকি! জাহাজ তো নতুন। কর্নিলভ এই জাহাজে থাকতেন।' অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না। তারপর এক সময় হঠাৎ ছেলেটি চীৎকার করিয়া উঠে, 'ঐ দেখ! ঐ ফেটে গেল!' একটি শেল ফাটার শব্দ হইবার পর দক্ষিণ উপসাগরের মাথার উপর অকস্মাৎ একটি ছোট সাদা ক্রমবিলীয়মান ধোঁয়ার মেঘ দেখা দিয়াছে। ছেলেটি একদৃষ্টে উহার দিকে তাকাইয়াই চীৎকার করিয়া উঠে।

নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে বুড়ো মাঝি হাত দু-খানিতে থুতু ফেলিতে ফেলিতে বলে, 'নতুন কামানসারি থেকে "উনিই" তো আজ তোপ দাগছেন। মিশকা, পেছন ফের। ঐ বড় বজরাখানা পেরিয়ে যাওয়া যাক।' উপসাগরের বিস্তৃত বুকের উপর দিয়া আরও জোরে নৌকাখানি চলিতে থাকে এবং সত্যই দেখিতে দেখিতে ভারী বজরাখানিকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হয়। বজরাখানা গাঁটে ভর্তি, তাহাতে আবার সিপাহীরা অপটু হাতে দাঁড় টানিতেছে, সবগুলি দাঁড় একসাথে পড়িতেছে না। গ্রাফস্কাইয়া ঘাটে বাঁধিয়া-থাকা নানাধরনের নৌকার মধ্য দিয়া বজরাখানা পথ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে।

ধূসর পোশাকপরা সিপাহীদের, কালো পোশাকপরা নাবিকদের এবং নানারঙের নানাধরনের পোশাকপরা মেয়েদের ভীড়ে ও কলরবে জাহাজঘাট সরগরম। মেয়েরা সাদা রোল্‌স্ বিক্রয় করিতেছে; রুশ চাষীরা ধোঁয়া-ওঠা সামুভারের পাশে দাঁড়াইয়া 'স্‌বিতেন গরম'[২] বলিয়া হাঁকিতেছে, এবং জাহাজঘাটের এইখানটাতেই মরিচাপড়া কামানের গোলা, শেল, গ্রেপসট (একত্রে বাঁধা লোহার বল), লোহার কামান চারিপাশে ছড়ান রহিয়াছে। একটু দূরে বড় খোলা জায়গায় বিরাট বিরাট কড়িকাঠ ও কামানটানা গাড়ী। সেখানে অনেক সিপাহী শুইয়া ঘুমাইতেছে। সেখানে রহিয়াছে ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ী, কামানের বিভিন্ন অংশ, সবুজরঙের গোলা-বারুদের গাড়ী, স্তূপীকৃত বন্দুক। অবিশ্রান্ত জনস্রোত চলিয়াছে।

১. কনস্তানতিন।

২ 'স্‌বিতেন' হইতেছে জল, মধু ও মশলা দিয়া তৈরী এক রকম পানীয়। অনুবাদক।

চলিয়াছে সৈন্য, নাবিক, অফিসার, স্ত্রী, শিশু, ব্যবসায়ীর দল। ঘাস, বস্তা অথবা পিপেবোঝাই গাড়ীগুলি ঘড় ঘড় করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কখনও কখনও একজন কসাক অথবা অফিসার ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, অথবা ঝরঝরে গাড়ীতে দোল খাইতে খাইতে যাইতেছেন কোন সেনাধ্যক্ষ। ডানদিকের রাস্তা ব্যারিকেডে অবরুদ্ধ, ছোট ছোট কামানের মুখগুলি ব্যারিকেডের গায়ের ছিদ্র দিয়া উঁকি মারিতেছে। পাশে বসিয়া একজন নাবিক পাইপ টানিতেছে। বাঁদিকে একটি সুরম্য অট্টালিকা, উহার চত্বরের উপর রোমান সংখ্যাগুলি খোদিত রহিয়াছে, বাহিরে রক্তমাখা ষ্ট্রেচার লইয়া সিপাহীরা অপেক্ষা করিতেছে। সামরিক শিবিরের অস্বস্তিকর লক্ষণসমূহ চারিদিকে পরিস্ফুট। প্রথমটা খুবই খারাপ লাগে, অস্বস্তিকর মনে হয়। সামরিক শিবির ও সহরজীবনের, সুন্দর সহর ও রণাঙ্গনের কদর্য নৈশসেনাশিবিরের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এই বীভৎস বিশৃঙ্খলার মধ্যে সৌন্দর্যের কণামাত্র কোথাও নাই। মনে হয় যেন প্রত্যেকেই ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্যহীনভাবে দ্রুত চলিয়াছে, কিন্তু কোথায় চলিয়াছে ঠিক নাই, কী করিতে হইবে তাহাও সে জানে না। কিন্তু চারিপাশের লোকগুলির মুখের দিকে আর একটু ভালভাবে তাকাইয়া দেখিলে, সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস চোখে পড়ে। এই যে ছোট মালবোঝাই গাড়ী-ঠেলা সিপাহীটি তিনটি ঘোড়াকে জল খাওয়াইবার জন্য লইয়া যাইতেছে, সে এমনই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগের সহিত সুরু ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিতেছে যে, সে যে এই বিচিত্র ভীড়ের মধ্যে তার মাথা উঁচু রাখিতে পারিবে সে-সম্পর্কে মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই ভীড়ের অস্তিত্ব সে যেন ভুলিয়াই গিয়াছে। লোকটির মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলে মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না যে, ঘোড়ার গা-ধোওয়া অথবা কামান টানা যে-কাজই লোকটিকে দেওয়া হউক না কেন এমন শান্ত নিরুদ্বেগে ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সে তাহা করিয়া যাইবে যেন সবকিছুই ঘটিতেছে তুলা অথবা সারানস্কে। নিখুঁত সাদা দস্তানা পরিয়া যে-অফিসারটি বেড়াইতেছে, তাহার মুখেও ঐ একই ভাব। যে-নাবিকটি ব্যারিকেডের পাশে বসিয়া পাইপ টানিতেছে, যে-সিপাহীরা প্রাক্তন পরিষদ্‌ভবনের চত্বরে ষ্ট্রেচার লইয়া অপেক্ষা করিতেছে, পরনের লাল ফ্রকটির কিনারে যাহাতে ময়লা না লাগে সেইজন্য এক পাথর হইতে অপর পাথরে মৃদু আলতোভাবে পা ফেলিয়া যে-তরুণীটি রাস্তা পার হইতেছে, সকলের মুখেই ঐ একই ধীর, শান্ত ও আত্মপ্রত্যয়ের ভাব।

প্রথমবার সেবাস্তপোলে গেলে হতাশ হইতে হয় বৈকি! নিশ্চয়ই হতাশ হইতে হয়। এমনকি একজনের চোখেমুখে উদ্বেগচাঞ্চল্য বা আতঙ্কবিহ্বলতা,

কিংবা এমনকি উদ্দীপনা বা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি অথবা কঠোর সংকল্পের ছায়া খুঁজিয়া পাইবার আশা বৃথাই—এরকম কিছু সেখানে দেখা যাইবে না। যখন দেখি চারিদিকে সাধারণ মানুষ চলিয়াছে নিজের দৈনন্দিন কাজে, অতি উৎসাহের জন্য নিজেকে তখন তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হয়। কাহিনী ও বর্ণনা পড়িয়া এবং উত্তরদিকের দৃশ্য দেখিয়া ও শব্দ শুনিয়া সেবাস্তপোলের প্রতিরোধকারীদের বীরত্ব সম্পর্কে মনের মধ্যে যে-ছবি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার বাস্তবতা সম্পর্কে সন্দেহ জাগিতে শুরু করে। কিন্তু এই সন্দেহ মনে বদ্ধমূল হইবার পূর্বেই যদি কিল্লার বুরুজগুলিতে গিয়া দাঁড়ান যায়—যেখানে দাঁড়াইয়া সেবাস্তপোলের রক্ষাকারীরা সেবাস্তপোল রক্ষা করিতেছে—সেখানে গিয়া তাহাদের দেখা যায়, কিংবা আরও ভাল হয় যদি রাস্তার ঠিক ওপারে প্রাক্তন পরিষদভবনের সেই অট্টালিকাটির মধ্যে প্রবেশ করা যায়—যেখানে ষ্ট্রেচার লইয়া সিপাহীরা প্রতীক্ষা করিতেছে—তাহা হইলে যে-দৃশ্য চোখে পড়িবে সে-দৃশ্য বীভৎস ও করুণ, চমৎকার ও কৌতুককর। কিন্তু সে-দৃশ্য বিস্ময়করও বটে, সে-দৃশ্যে মন ভরিয়া ওঠে।

পরিষদভবনের বৃহৎ কক্ষটিতে প্রবেশ করা যাক। দরজা খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ-পঞ্চাশজন রোগীর দৃশ্যে ও গন্ধে অভিভূত হইয়া দাঁড়াইতে হয়। কাহারও একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে, কাহারও বা একটি অঙ্গ কাটিয়া ফেলিতে হইবে, কেহ বা গুরুতররূপে জখম। অধিকাংশই মেঝেতে শায়িত, কেহ কেহ ছোট ছোট খাটের উপর শুইয়া। এই দৃশ্যে অভিভূত হইয়া দ্বারপ্রান্তে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না। মনের এই অশুভ অস্বস্তি কাটাইয়া উঠিতে হইবে, সোজা দৃঢ় পায়ে হাঁটিয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে; যাহারা কষ্ট পাইতেছে তাহাদের 'দেখিতে' আসিয়াছ বলিয়া লজ্জা পাইলে চলিবে না; লজ্জা পাইলে চলিবে না, সোজা তাহাদের নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলিতে হইবে। এই হতভাগ্যেরা দরদী মানুষের মুখ দেখিতে চায়, নিজেদের কষ্টের কথা জানাইতে চায়, করুণা ও সমবেদনার কথা শুনিতে চায়। দুইপাশের শয্যাসারির মধ্যপথ দিয়া অগ্রসর হইতে হইতে চোখে পড়ে এমন একখানি মুখ, যে-মুখের কঠোরতা ও যন্ত্রণা-কাতরতা অন্যান্য মুখের চেয়ে কম। সাহস করিয়া লোকটির নিকট গিয়া কথা বলা যায়।

একটি খাটে শুইয়া একজন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ সিপাহী এমন করুণাকোমল দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করিতেছে, মনে হয় যেন দুই চোখ দিয়া সে আমাকে তাহার কাছে যাইবার জন্য ডাকিতেছে। দ্বিধাভরে ও ভয়ে ভয়ে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি,

'কোথায় তুমি আহত হয়েছ ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি – কারণ, কি জানি কেন যেন যন্ত্রণাভোগের দৃশ্য মনে শুধু গভীর সহানুভূতিরই উদ্রেক করে না, সঙ্গে সঙ্গে ভয় হয় পাছে সে ব্যথা পায় ; লোকটির জন্য মনে গভীর শ্রদ্ধাও জাগিয়া ওঠে।

লোকটি জবাব দিল, 'পা জখম হয়েছে।' কিন্তু তাহার কম্বলের ভাঁজ দেখিয়া বুঝিতে দেরী হয় না যে তাহার একখানি পা উরু হইতে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। লোকটি বলে, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি এখন ভাল হয়ে গেছি। কখন হাসপাতাল থেকে খালাস দেবে তারই অপেক্ষায় আছি।'

'তুমি কি অনেক আগে আহত হয়েছিলে ?'

'প্রায় ছয় সপ্তাহ আগে, কর্তা।'

'আচ্ছা, জায়গাটায় এখন ব্যথা আছে ?'

'না, আর ব্যথা নেই। ঠিক হয়ে গেছে। শুধু যখন আবহাওয়া খারাপ থাকে তখন মনে হয় যেন হাঁটুর নীচের মাংসটা চিবোচ্ছে। তাছাড়া আর কিছুই নয়। সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'কী করে তুমি আহত হলে ?'

'কর্তা, যখন প্রথম গোলাবর্ষণ শুরু হয়, তখন আমি ছিলাম পঞ্চম কিল্লায়। কামানটা ঠিক করে নিয়ে সবেমাত্র পরবর্তী ছিদ্রটির দিকে যেতে গেছি, তখনই গোলাটি আমার পায়ে লাগে। মনে হল আমি যেন হঠাৎ একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখি আমার একটা পা নেই।'

'প্রথমটায় কোন ব্যথা অনুভব কর নি ?'

'না, করি নি। শুধু মনে হয়েছিল যেন খুব গরম কিছু দিয়ে আমার পায়ে চাবুক মারা হল।'

'তারপর ?'

'পরে যখন ওরা চামড়াটা টেনে জায়গাটা ঢেকে দেবার চেষ্টা করছিল তখন ছাড়া বেশী ব্যথা বোধ করি নি। শুধু ঐ সময়টাতেই খুব বেশী ব্যথা লেগেছিল। আসল কথা কী জানেন কর্তা, বেশী ভাবতে নেই। না ভাবলে কিছুই নয়। মানুষের সবকিছুই তো ভাবনা থেকেই।'

এই সময় একটি স্ত্রীলোক আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিল। তাহার পরনে ডোরাকাটা ধূসর পোশাক, মাথায় কালো রুমাল। তাহার নিকট হইতেই শোনা গেল নাবিকটির কথা, তাহার যন্ত্রণাভোগের কথা। গত চার সপ্তাহ ধরিয়া কী ভীষণ অবস্থার মধ্য দিয়া লোকটির কাটিয়াছে

শোনা গেল তাহার কাহিনী। এই স্ত্রীলোকটির মুখেই শোনা গেল, কেমন করিয়া আহত হইবার পর ষ্ট্রেচারবাহকদের থামাইয়া সে আমাদের কামানসারি হইতে তোপ দাগা দেখিয়াছিল। শোনা গেল গ্রাণ্ড ডিউক আসিয়া লোকটির সহিত কথা বলিয়াছিলেন এবং পঁচিশ রুবল পুরস্কার দিয়াছিলেন। যদি তাহার পক্ষে আর যুদ্ধ করা সম্ভব না হয়, তবে তরুণদের শিক্ষাদানের জন্য সে কিল্লার বুরুজে ফিরিয়া যাইতে চাহিয়াছে—একথাও স্ত্রীলোকটির মুখে শোনা গেল। কখনও আমার দিকে, কখনও নাবিকটির দিকে তাকাইয়া স্ত্রীলোকটি এক নিঃশ্বাসে সমস্ত কাহিনী বলিয়া গেল। বলিবার সময় নাবিকটির মুখের দিকে যখনই সে তাকাইতেছিল, তখনই আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু নাবিকটি মুখ ফিরাইয়া লইয়া যেন কিছুই শুনিতে পাইতেছে না ভান করিয়া বালিশ হইতে তুলা খুঁটিতেছিল।

নাবিকটি বলিল, 'এ আমার স্ত্রী, কর্তা।' কণ্ঠস্বরে তাহার একটু ক্ষমাপ্রার্থনার ভাব। যেন সে বলিতে চায়—'ওর কথায় কিছু মনে করবেন না। স্ত্রীলোকেরা এমন সব আবোল তাবোল বকেই থাকে।'

এতক্ষণে সেবাস্তপোলের প্রতিরোধকারীদের সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হইতেছে। কেন যেন এই লোকটির সম্মুখে নিজেকে অপরাধী মনে হইতেছে, মনে হইতেছে, প্রশংসা ও সহানুভূতি প্রকাশের যথেষ্ট ভাষা আমার আয়ত্তে নাই। ভাষা যতটুকু আয়ত্তে আছে অন্তত এক্ষেত্রে তাহাতে কাজ চলিবে না। তাই এই মানুষটির মূক আত্মঅচেতন মহত্ত্ব ও সহিষ্ণুতার সম্মুখে নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; নিজের প্রশংসা শুনিবার লজ্জায় এই মানুষটির কুণ্ঠা ও সংকোচের সম্মুখে নীরবে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকি।

'ঈশ্বর করুন, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।' লোকটির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আরেকটি রোগীর কাছে গিয়া দাঁড়াই। লোকটি মেঝেতে শুইয়া আছে এবং মনে হয় তীব্র যন্ত্রণায় সে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে।

লোকটির মাথার চুলগুলি চমৎকার। মুখখানি ফ্যাকাসে হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। লোকটি চিৎ হইয়া শুইয়া আছে, বাঁ হাতখানি যেভাবে রাখিয়াছে তাহা হইতেই বুঝা যায় যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। শ্বাস টানিতে তাহার কষ্ট হইতেছে এবং শুকনো হাঁ-করা মুখের মধ্য দিয়া এই শ্বাস টানিয়া লইবার ও ছাড়িয়া দিবার সময় শিসের মত শব্দ হইতেছে। ভারী নীল চোখদুটি উপরে উঠিয়াছে; কোঁচকান কম্বলের তলা হইতে ব্যাণ্ডেজকরা ডান হাতের কিছুটা দেখা যাইতেছে। কাটা হাতের পচা মাংসের দুর্গন্ধ ক্রমেই বেশী করিয়াই নাকে আসে এবং রোগীর

সর্বাঙ্গ দিয়া জ্বরের যে-অগ্নিস্রোত বহিতেছে, মনে হয় আমার শরীরেও বুঝি তাহা প্রবেশ করিল।

'লোকটির জ্ঞান নেই?' — স্ত্রীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করি। সে আমার পিছু পিছু আসিয়াছে; এমন স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে আমার দিকে যেন মনে হয় আমি তার কত প্রিয়!

স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, 'জ্ঞান আছে, এখনও কথা শুনতে পাচ্ছে।' তারপর ফিস ফিস করিয়া বলিল, 'অবস্থা খুবই খারাপ। চিনি না বটে, তবু বড় মায়া হয়। আজ একটু চা দিয়েছিলাম, কিন্তু খেতে পারল না।'

'কেমন বোধ করছ তুমি?' — লোকটিকে জিজ্ঞাসা করি।

আমার গলার স্বর শুনিয়া আহত ব্যক্তিটির চোখদুটি একবার ঘুরিল। কিন্তু দেখিবার ও বুঝিবার ক্ষমতা তখন তাহার আর নাই।

'আমার বুক জ্বলে গেল!'

একটু দূরে একটি বৃদ্ধ সিপাহী গায়ের শার্ট বদলাইতেছে। লোকটি কঙ্কালসার, মুখ ও শরীরের রং হলদে। একটি হাত নাই, কাঁধ হইতে কাটিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। লোকটি বেশ বসিতে পারে; সে সারিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহার নির্জীব ও নিষ্প্রভ চোখ, কঙ্কালসার দেহ এবং মুখের গভীর বলিরেখাগুলি দেখিলে মনে হয়, কষ্ট ও যন্ত্রণা এই হতভাগ্যের জীবনের সারটুকু শেষ করিয়া দিয়াছে।

অপরদিকে একটি খাটিয়ার উপর একটি স্ত্রীলোক শুইয়া আছে। তাহার যন্ত্রণাকাতর কোমল মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা, জ্বরের উত্তাপে ঠোঁট দুইখানি রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

গাইড জানাইল, 'ও আমাদেরই একজন নাবিকের স্ত্রী। ও যখন ওর স্বামীর জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল, তখন পঞ্চম কিল্লায় একটা শেল ফেটে ওর গায়ে লাগে।'

'পাখানা কেটে ফেলতে হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ঠিক হাঁটুর উপর থেকে।'

বাঁ-পাশের দরজা দিয়া একটি ঘরে ঢুকিলাম। দুর্বল স্নায়ু লইয়া কেহ যেন এই ঘরে না ঢোকে। এই ঘরে আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা হইতেছে এবং অস্ত্রোপচারের কার্য চলিতেছে। অস্ত্রচিকিৎসকদের দুই হাতের কনুই পর্যন্ত রক্ত লাগিয়াছে; বিবর্ণ ও কঠিন তাহাদের মুখ, ক্লোরোফর্মে অভিভূত একজন লোককে একটি খাটিয়ায় শোয়াইয়া কী যেন তাহারা করিতেছে। লোকটির চোখ দুইটি একদম খোলা, সে বিকারের ঘোরে অসংলগ্ন বকিয়া চলিয়াছে। কখনও কখনও

তাহার মুখ দিয়া সোজা সরল আদরের কথা বাহির হইতেছে। অস্ত্রচিকিৎসকেরা ব্যস্ত রহিয়াছেন অঙ্গচ্ছেদের বীভৎস অথচ কল্যাণকর কাজে। চোখের উপর দেখিতেছি, সাদা সুস্থ মাংসের মধ্যে ধারাল বাঁকা ছুরি বসিয়া যাইতেছে। হঠাৎ আহত ব্যক্তিটির মুখ দিয়া বাহির হয় এক ভীষণ আর্ত চীৎকার; সে-চীৎকার শুনিলে রক্ত হিম হইয়া আসে। এই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ দিয়া শপথের ঝড় বহিয়া যাইতে থাকে। দেখিলাম, সহকারী চিকিৎসক কাটা হাতখানিকে ঘরের এককোণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ঘরের অন্য একদিকে আর এক হতভাগ্য ষ্ট্রেচারের উপর শুইয়া আছে এবং সাথীটির উপর যে-অস্ত্রোপচার চলিতেছে তাহাই তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। সে ছটফট করিতেছে ও গোঙাইতেছে – যতটা নিজের অঙ্গে আসন্ন অস্ত্রোপচারের আতঙ্কে, ততটা শারীরিক যন্ত্রণায় নহে। ভয়াবহ হৃদয়বিদারী দৃশ্য! এই দৃশ্য দেখিলে যুদ্ধকে কেহ ভাবিবে না সঙ্গীত ও দামামার তালে তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে ব্যূহসজ্জিত চমৎকার সেনাবাহিনী, পত্ পত্ করিয়া নিশান উড়িতেছে, আর বল্গিতগতি অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন সেনাপতিবৃন্দ। এই মর্মান্তিক দৃশ্যের মধ্যেই যুদ্ধের আসল রূপটি ধরা পড়ে – রক্ত, যন্ত্রণা, মৃত্যু…!

এই যন্ত্রণাগার হইতে বাহিরে আসিতেই একটা নিষ্কৃতির ও আরামের ভাব বোধ হয় নিশ্চয়ই। বুক ভরিয়া টানি বাহিরের বিশুদ্ধ বাতাস, নিজে সুস্থ আছি ভাবিয়া উল্লসিত হইয়া উঠি। কিন্তু যাহারা যন্ত্রণাভোগ করিতেছে তাহাদের কথা ভাবিলে নিজের নগণ্যতা সম্পর্কেও সচেতন হইয়া উঠি। ধীরভাবে অসংকোচে কিল্লার দিকে অগ্রসর হই।

এত মৃত্যু ও এত যন্ত্রণার মধ্যে আমার মত নগণ্য কীটের যন্ত্রণা ও মৃত্যু কতটুকু? কিন্তু স্বচ্ছ সকাল, উজ্জ্বল সূর্য, সুন্দর সহর, উন্মুক্ত গির্জা এবং দলে দলে সেনাবাহিনীর লোকেদের সবদিকেই ঘুরিয়া বেড়ানোর দৃশ্য দেখিয়া আবার মনের স্বাভাবিক স্ফূর্তি ফিরিয়া আসে; ছোটখাট ব্যাপার এবং শুধু বর্তমানের ভাবনা লইয়াই মন ব্যাপৃত হইয়া পড়ে।

ফিরিবার সময় পথে দেখিলাম এক শোকমিছিল। লাল কফিনে একজন অফিসারের মৃতদেহ বহন করিয়া গির্জা হইতে বাহির হইয়া চলিয়াছে কবরখানার দিকে। পত্ পত্ করিয়া পতাকা উড়িতেছে, ব্যাণ্ড বাজিতেছে। হয়ত গির্জা হইতে গুলীবর্ষণের আওয়াজও শোনা যায়। কিন্তু আর আগের সে-ভাবনায় মন ফিরিয়া যায় না। শোকমিছিলকে মনে হয় এক চমৎকার সামরিক সমারোহ,

আওয়াজ কানে বাজে চমৎকার সমরসঙ্গীতের মত। যন্ত্রণা ও জীবন-মৃত্যুর চিন্তার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া তাহার সহিত এই সমারোহ বা আওয়াজ ও শব্দকে মিশাইয়া দেখিতে পারি না। যেমনটি পারিয়াছিলাম ঐ হাসপাতালে।

গির্জা ও ব্যারিকেড পার হইলেই পড়ে শহরের সবচেয়ে কর্মচঞ্চল অঞ্চল। রাস্তার দুইপাশে দোকানের সাইনবোর্ড, ভাঁটিখানা। চোখে পড়িতেছে কারবারীদের, মাথায় বনেৎ ও রুমাল-বাঁধা মেয়েদের, ব্যস্ত বস্ত্রব্যবসায়ীদের। সবকিছু হইতেই বাসিন্দাদের দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

নাবিকেরা ও অফিসারেরা কী বলে যদি শুনিতে হয়, তবে দক্ষিণদিকের ভাঁটিখানায় ঢুকিতে হইবে। সেখানে চলিয়াছে গতরাত্রে যাহা ঘটিয়াছে সেই গল্প—ফেনিয়া ছুঁড়ীর কথা, চব্বিশ তারিখের যুদ্ধের কাহিনী, কাটলেটের দাম কত বাড়িয়াছে এবং পরিবেশন কত খারাপ হইয়াছে সেই কথা, অমুক অমুক সঙ্গীটি কেমন করিয়া নিহত হইয়াছে সে-বর্ণনা।

একজন খর্বকায় নৌবাহিনীর অফিসার বলিয়া উঠিলেন, 'চুলোয় যাক এসব কথা! আমাদের ওখানটায় আজ যা-তা কাণ্ড ঘটেছে!' বক্তার চুলগুলি রেশমী, মুখে দাড়ি নাই, সবুজ গলাবন্ধের মধ্য দিয়া কথাগুলি গমগম শব্দে বাহির হইয়া আসিল।

'আপনার জায়গাটা কোথায়?'—আর একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। 'চতুর্থ কিল্লায়,' জবাব দিল তরুণ অফিসারটি। 'চতুর্থ কিল্লা' কথাটি কানে আসিতেই এই রেশমী চুলওয়ালা খর্বাকৃতি অফিসারটিকে একটু বেশী আগ্রহ লইয়াই, এমনকি কিছুটা ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা লইয়াই লক্ষ্য করি। তাহার যে অতিমাত্রায় বেপরোয়াভাব, অঙ্গভঙ্গী, উচ্চকণ্ঠ ও উচ্চহাস্যকে এতক্ষণ হামবড়াই ভাব বলিয়া মনে হইতেছিল, এখন মনে হয় তাহা সত্যি নয়। বিপদের মুখোমুখি দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে আজকালকার তরুণদের মধ্যে যে 'কুচপরোয়া-নেই' ভাব দেখা দিয়াছে, লোকটির কথাবার্তা চালচলনে তাহাই ফুটিয়া উঠিতেছে। তাহা সত্ত্বেও শেলে ও বুলেটে চতুর্থ কিল্লার অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাই শুনিবার জন্য কান পাতিয়া আছি। কিন্তু ওসব কিছুই সে বলে না! অবস্থা সঙ্গীন হইয়াছে কাদায়! হাঁটু পর্যন্ত কাদামাখা নিজের পায়ের বুট দুইখানিকে দেখাইয়া লোকটি বলিয়া চলে, 'আমার সবচেয়ে ভাল গোলন্দাজদের একজন আজ নিহত হল। সোজা কপালটা উড়ে গেছে।' অপর কেহ জিজ্ঞাসা

করে, 'কার কথা বলছেন? মিতিউখিন।' লোকটি বলে, 'না, না!' তারপর পরিচারককে বলে, 'আজ ভিয়াল কাটলেট মিলবে তো? কানায়েল!' তারপর আবার বলে, 'না, না, মিতিউখিন নয়, আব্রোসিমভ। চমৎকার লোক ছিল হে! ছ'বার ঝটিকা-আক্রমণে যোগ দিয়েছিল।'

টেবিলটার অপর এককোণে কয়েক প্লেট কাটলেট ও কড়াইশুঁটি এবং 'বোর্দো' মার্কা তেতো ক্রিমিয়ান মদের একটি বোতল সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে পদাতিক-বাহিনীর দুইজন অফিসার। একজন বয়সে নবীন, তাহার গ্রেটকোটে লাল কলার লাগানো এবং কাঁধের স্ট্র্যাপে দুইটি তারকা। দ্বিতীয় ব্যক্তি বয়সে প্রবীণ, তাহার কলার কালো এবং কাঁধে তারকা নাই। তরুণ অফিসারটি প্রবীণ অফিসারটিকে আলমা'র যুদ্ধের গল্প বলিতেছিল। প্রথমজনের ইতিমধ্যেই একটু গোলাপী নেশা হইয়াছে। গল্প বলিতে বলিতে সে মাঝে মাঝে থামিতেছে, তাহার কথা শ্রোতা বিশ্বাস করিতেছে কিনা সে-সম্পর্কে যে তাহার সন্দেহ জাগিতেছে তাহা তাহার চোখের সংকোচ-দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রধানতঃ সমস্ত ব্যাপারটায় তাহার যে-ভূমিকা ছিল তাহা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং যে-ঘটনাবলীর বর্ণনা সে দিতেছিল তাহা এত ভয়ংকর যে তাহার কথায় সত্যের অংশ খুব কমই আছে। কিন্তু এইসকল কাহিনী আর শুনিবার আগ্রহ নাই। রুশিয়ার সর্বত্র বেশ কিছুকাল ধরিয়া এইধরনের কাহিনী শোনা যাইবে। আগ্রহ হইবে কিল্লা-গুলিতে যাইতে, বিশেষতঃ চতুর্থ কিল্লায় যাইতে—যে-কিল্লাটির কথা এত শুনিয়াছি ও এতভাবে শুনিয়াছি! যখন কেহ বলে যে সে চতুর্থ কিল্লায় গিয়াছে, তখন তাহার চোখে মুখে অসাধারণ গর্ব ও আনন্দ ফুটিয়া উঠিবেই। যখন কেহ বলে, 'আমি চতুর্থ কিল্লায় যাচ্ছি', তখন তাহার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার ঈষৎ কম্পন অথবা একটা অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম উদাসীনতা ফুটিয়া উঠিবেই। যদি কেহ কাহাকেও গালাগালি দিতে চায় তবে বলে, 'তোকে চতুর্থ কিল্লায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।' ষ্ট্রেচারের কাছে কোন লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় - 'কোথা থেকে আসছ?' —তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জবাব আসিবে, 'চতুর্থ কিল্লা হইতে।' প্রকৃতপক্ষে, এই ভয়াবহ কিল্লাটি সম্পর্কে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অভিমত আছে। একটি মত এই যে, সেখানে একবার যে যায় সে আর ফেরে না। যাহারা কখনও সেখানে যায় নাই, এই মত তাহাদেরই। কিন্তু সেই রেশমী চুলওয়ালা জাহাজীটির মত যাহারা সেখানে থাকে, তাহারা চতুর্থ কিল্লার কথা বলিবার সময় শুধু বলে, জায়গাটি শুষ্ক না কর্দমাক্ত অথবা সুড়ঙ্গের মধ্যে গরম না ঠাণ্ডা, ইত্যাদি।

ভাঁটিখানার মধ্যে আধঘণ্টা কাটাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখি আবহাওয়া পালটাইয়া গিয়াছে। সমুদ্রের উপর যে-কুয়াশা জমিয়াছিল, তাহা ইতিমধ্যে ধূসর উদাস জলভরা মেঘে পরিণত হইয়াছে এবং সূর্যকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ঝির ঝির করিয়া ঠাণ্ডা বৃষ্টি ও তুষারকণা পড়িতেছে এবং বাড়ীর ছাদ, রাস্তার ফুটপাত ও সিপাহীদের গ্রেটকোট ভিজাইয়া দিতেছে।…

আর একটি ব্যারিকেড পার হইয়া একটি গেটের মধ্য দিয়া ডাইনে ঘুরিতেই একটি চওড়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এই ব্যারিকেডটি ছাড়াইলে রাস্তার দুইধারের একটি বাড়িতেও লোক নাই। কোন বাড়িতেই সাইনবোর্ড নাই। দরজাগুলি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, জানালাগুলি ভাঙ্গা। একটি বাড়ির এক কোণ গোলাতে উড়িয়া গিয়াছে, আর একটি বাড়ির ছাদ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়িগুলিকে দেখাইতেছে দীর্ঘদিন অভাব অনটন ও দুঃখকষ্টে পোড়-খাওয়া ঝানু বৃদ্ধের মত। তাহারা যেন গর্ব ও একটু অবজ্ঞার সহিত রাস্তার মানুষের দিকে তাকাইয়া আছে। চলিতে চলিতে কামানের গোলায় পা লাগিয়া পড়িয়া গেলাম। শেল পড়িয়া পাথুরে মাটিতে যে-গর্ত হইয়াছিল, পড়িয়া গেলাম সেই জলভর্তি গর্তের মধ্যে। চলিতে চলিতে পথে দেখিলাম সিপাহী, কসাক ও অফিসারদের দল। তাদের পিছু ফেলিয়া আগাইয়া গেলাম। কখনও কখনও একটি স্ত্রীলোক অথবা শিশু পথে পড়ে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির মাথায় বনেৎ নাই—সে নাবিকের স্ত্রী, গায়ে তার পুরান শীতের কোট, পায়ে সিপাহীদের বুট। রাস্তা দিয়া আরও কিছুদূর গিয়া সামান্য একটু ঢালুতে নামিলে চারিপাশে কোন বাড়ি দেখা যায় না। বাড়ির পরিবর্তে দেখা যায় ইঁট, তক্তা, কাদা, গাছের গুঁড়ি ও পাথরের স্তূপ পড়িয়া আছে। সম্মুখে একটি খাড়া পাহাড়ের উপর কাদায়-ভর্তি অন্ধকার একটি জায়গা। তাহার উপর খাদ। এই জায়গাটাই চতুর্থ কিল্লা। এখানে লোকজনের সংখ্যা খুবই কম, স্ত্রীলোক মোটেই নাই। সিপাহীরা দ্রুতপায়ে হাঁটিয়া যাইতেছে, রাস্তায় রক্ত ছড়ান, চারিজন সিপাহী একটি ষ্ট্রেচার বহন করিয়া চলিয়াছে—এদৃশ্য চোখে পড়িবেই। ষ্ট্রেচারের উপর দেখা যাইতেছে একখানি পাণ্ডুর মুখ এবং রক্তমাখা সিপাহী-কোট। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'আঘাত লেগেছে কোথায়?' বাহকেরা রুক্ষকণ্ঠে প্রশ্নকর্তার দিকে না তাকাইয়াই জবাব দিবে যে আঘাত পায়ে কিংবা হাতে —যদি আঘাত সামান্য হয়। কিন্তু লোকটি যদি মরিয়া গিয়া থাকে অথবা আঘাত গুরুতর হইয়া থাকে এবং যদি ষ্ট্রেচারের উপর কোন মাথা না দেখা যায়, তবে তাহারা কোন জবাবই দিবে না, নিঃশব্দে কঠিন মুখে ষ্ট্রেচার বহিয়া চলিয়া যাইবে।

পাহাড়ে উঠিবার সময় পাশ দিয়া কামানের গোলা অথবা শেল চলিয়া যাইবার তীব্র শব্দে মনে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি হয়। গোলাবর্ষণের যে-শব্দ সহর হইতে শুনিয়াছিলাম, হঠাৎ তাহার অর্থ বুঝিতে পারি। সহর হইতে শুনিয়া যাহা মনে হইয়াছিল, মোটেই তাহা নহে। হঠাৎ মনের পর্দায় ভাসিয়া উঠে কোন শান্ত সুন্দর স্মৃতি, যাহা চোখে পড়ে তাহা অপেক্ষা নিজের কথাই বেশী করিয়া ভাবিতে শুরু করি। চারিদিকের পরিবেশের প্রতি মনোযোগ কমিয়া আসিতে থাকে, মনে কেমন একটা দৃঢ়তার অভাবের অস্বাচ্ছন্দ্যকর অনুভূতি জাগিতে থাকে। বিপদ দেখিয়া হঠাৎ নিজের বুকের মধ্যে একটা বিশ্রী শব্দ শুনিতে পাই। বিশেষতঃ যখন দেখি দুইটি হাত দোলাইতে দোলাইতে কোন সিপাহী তরল কাদার মধ্য দিয়া পাহাড় হইতে নামিবার পথে হাসিতে হাসিতে আমার পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। তখন বুকের মধ্যকার এই শব্দটিকে জোর করিয়া থামাইয়া দিই, নিজের অজান্তেই বুক ফুলাইয়া পথ চলি এবং মাথা উঁচু করিয়া কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে পাহাড়ে উঠিতে থাকি। একটু উঠিতেই কিন্তু আবার দুই পাশ দিয়া 'স্তুজার' বুলেটগুলি বাতাস কাটিয়া ছুটিয়া যাইতে থাকে। একবার মনে হয়, রাস্তার সহিত সমান্তরালভাবে যে-পরিখা চলিয়া গিয়াছে তাহার পাশ দিয়া অগ্রসর হওয়াই ভাল নয় কি ? কিন্তু সে-পরিখার মধ্যে হাঁটু পর্যন্ত হলুদবর্ণের দুর্গন্ধময় জলা, কাদা, অতএব সোজা পাহাড়ে উঠিয়াছে যে-রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়া যাওয়াই ভাল, বিশেষতঃ যখন সকলেই ঐ রাস্তা দিয়াই যাইতেছে। প্রায় দুইশত পা অগ্রসর হইতেই শেলের গর্তে-ভর্তি একটি কর্দমাক্ত স্থান। তাহার চারিপার্শ্বে মাটি-ভর্তি চটের বেড়া, মাটির জাঙ্গাল, বারুদঘর, মঞ্চ ও সুড়ঙ্গ। উহাদের ছাদের উপর বড় বড় লোহার কামান এবং সুন্দরভাবে সাজানো কামানের গোলার স্তূপ। সবকিছুকেই যেন অকারণে একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। কামানের সারির পাশ দিয়া একদল নাবিক অলসভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। জায়গাটির মাঝখানে একটি কামান চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থায় কাদার মধ্যে অর্ধনিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। একজন বন্দুকধারী পদাতিক কাদা ভাঙ্গিয়া কামানসারির দিকে চলিয়াছে। কাদা হইতে অতিকষ্টে সে পা টানিয়া তুলিয়া তুলিয়া হাঁটিতেছে। শেলের খোলা, না-ফাটা শেল, কামানের গোলা, সেনাশিবিরের আবর্জনা—এই সবকিছুই সমগ্র স্থানটি জুড়িয়া আঁটালি কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাইতেছে। মনে হয় খুব কাছে কোথাও কামানের গোলা ফাটিল। মনে হয় চারিপাশ দিয়া বিভিন্ন প্রকারের শব্দ করিতে করিতে বুলেট ছুটিতেছে—কোনটি মৌমাছির গুঞ্জনের মত গুন্‌গুন্ করিতে করিতে, কোনটি

আরও জোরে শিসের মত শব্দ করিতে করিতে, কোনটি বা তারের বাদ্যযন্ত্রের টুং করা আওয়াজের মত শব্দ করিতে করিতে। হঠাৎ কানে আসে কামানের গোলা ফাটার ভীষণ শব্দ। বুক কাঁপিয়া ওঠে, কিছুক্ষণের জন্য সকলেই নিশ্চল হইয়া যায়।

মনে মনে বলি, 'তাহলে এই সেই চতুর্থ কিল্লা! সত্যিই কী ভীষণ স্থান!' মনে জাগে চাপা ভয়ের তীব্র অনুভূতি এবং তারই সঙ্গে একটু গর্ববোধ। কিন্তু হতাশ হইতে হয়। চতুর্থ কিল্লায় এখনও পৌছিতে পারি নাই। যেখানে পৌছিয়াছি তাহার নাম ইয়াজনোভ্স্কি ছোট কিল্লা। চতুর্থ কিল্লার তুলনায় নিরাপদ এবং মোটেই ভয়াবহ নহে। চতুর্থ কিল্লায় যাইতে হইলে দক্ষিণের দিকে ফিরিয়া নীচু হইয়া সেই সরু পরিখা বরাবর চলিতে হইবে; যে-পরিখাটির মধ্য দিয়া এইমাত্র পদাতিক সৈন্যটি চলিয়া গেল। এই পরিখার মধ্যে সাক্ষাৎ মেলে আরও অনেক ষ্ট্রেচারের, একজন নাবিকের এবং কোদাল হাতে অনেক সিপাহীর। এই পরিখাটির মধ্যে রহিয়াছে মাইন-ফিউজগুলি, এবং এই পরিখার কাদায়-ভর্তি সুড়ঙ্গগুলির মধ্য দিয়া দুইটি মানুষ কোনমতে হামাগুড়ি দিয়া অগ্রসর হইতে পারে। সেখানে দেখি কৃষ্ণসাগর ব্যাটালিয়নের স্কাউটেরা জুতা পাল্টাইতেছে, খাওয়া-দাওয়া করিতেছে, পাইপ টানিতেছে, যে-যার মত জীবনযাপন করিতেছে এবং সর্বত্র সেই একই দুর্গন্ধময় কাদা, শিবিরের আবর্জনা এবং বিভিন্ন আকার ও আয়তনের লোহার টুকরা। আরও তিনশত পা অগ্রসর হইলে আর একটি ব্যাটারী। একটি ছোট শেলের-গর্তে ভর্তি প্রাকারবেষ্টিত চতুষ্কোণ জায়গায়, মাটিভর্তি চটের বেড়া, মাটির গড়, পাটাতনের উপর বসান কামানে তিলধারণের স্থান নাই। এক জায়গায় বুকসমান উঁচু আলিসার তলায় বসিয়া চার-পাঁচজন নাবিক তাস খেলিতেছে। নৌবাহিনীর একজন অফিসার বুঝিতে পারিয়াছে আমি একজন কৌতূহলী নবাগত। খুশী হইয়া সে আমাকে আমার আগ্রহোদ্দীপক সবকিছুই দেখাইয়া বেড়ায়। অফিসারটি কখনও কামানের উপর বসিয়া হলুদ রঙের সিগারেট পাকায়, কখনও দুর্গপ্রাকারের এক ফোকর হইতে অপর ফোকরে গিয়া দাঁড়ায়। তাহার গতিবিধি এত শান্ত ও ধীর এবং তাহার কথাবার্তা এত কৃত্রিমতাবর্জিত যে আমার দুই পাশ দিয়া বাতাস কাটিয়া ক্রমেই বেশী সংখ্যায় বুলেট ছুটিয়া যাইবার শব্দ শোনা সত্ত্বেও আমি নিজেকে ধীর ও শান্ত রাখিতে পারি। ধীর ও শান্তভাবেই তাহাকে প্রশ্ন করি এবং জবাবে সে যাহা বলে নিবিষ্টতম মনোযোগের সঙ্গে শুনি। আমার একটি প্রশ্নের জবাবে অফিসারটি গত পাঁচ তারিখে যে গোলাবর্ষণ হইয়াছিল তাহার বর্ণনা দেয়। সে বলিয়া চলে, কেমন করিয়া শেষ পর্যন্ত মাত্র একটি কামান চালু ছিল এবং

তাহার সিপাহীদের মধ্যে মাত্র আটজন রক্ষা পাইয়াছিল এবং ইহা সত্ত্বেও কেমন করিয়া পরদিন সকালে সমস্ত কামানগুলি লইয়াই সে শত্রুর উপর অগ্নিবর্ষণ শুরু করিয়াছিল। কেমন করিয়া পাঁচ তারিখে একটি শেল আসিয়া নাবিকদের ভূগর্ভস্থ আশ্রয়স্থলের মধ্যে পড়ে এবং এগারজন খতম হইয়া যায়, সে-কাহিনীও অফিসারটি বর্ণনা করে। একটি ফোকর দিয়া সে আমাকে শত্রু-পরিখা দেখাইয়া দেয়। এই পরিখা দুই-তিনশ ফুটের বেশী দূর হইবে না। একটি ব্যাপারে কিন্তু আমার ভয় করে: শত্রুকে দেখিবার জন্য ফোকর দিয়া মাথা বাহির করিলে চারিপাশের বাতাস কাটিয়া যেভাবে বুলেট ছুটিতে থাকে তাহাতে কিছুই দেখা যায় না, যদিবা কিছু দেখা যায় তো দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয় যে, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে একটি সাদা পাথুরে দেওয়াল আর সেই দেওয়াল হইতে ছোট ছোট সাদা সাদা ধোঁয়ার ফুৎকার বাহির হইয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। এই দেওয়ালই শত্রু। সিপাহীরা ও নাবিকেরা এই শত্রুকে 'সে' বলিয়া অভিহিত করে।

হয়তো বাহাদুরি লইবার জন্য অথবা শুধু মজা করিবার জন্য নৌবাহিনীর অফিসারটি আমার দেখার জন্যই একটু গোলা চালাইয়া দেখাইতে চায়। হুকুম হাঁকে, 'গোলন্দাজ ও মাল্লারা তোপে যাও!' অমনি চৌদ্দজন নাবিক ফূর্তির সঙ্গে আসিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায়। কেহ মুখের পাইপটি পকেটে পুরিয়া রাখে, কেহবা বিস্কুটের বাকী অংশটুকু মুখের মধ্যে পুরিয়া ফেলে। তারপর তলায় পেরেক-বার-করা বুটের শব্দ করিতে করিতে সকলে মিলিয়া মঞ্চের উপর উঠে এবং কামানে বারুদ ভরিতে আরম্ভ করে। এই মানুষগুলির মুখের দিকে যদি ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখা যায়, যদি তাহাদের চালচলনভঙ্গী মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাইবে তাহাদের তামাটে চওড়া মুখগুলির প্রতিটি কুঞ্চনরেখায়, প্রতিটি পেশীতে, তাহাদের কাঁধের প্রস্থে, বিরাট বিরাট বুটের মধ্যে ঢাকা তাহাদের পায়ের ঋজুতায়, তাহাদের প্রতিটি ধীর শান্ত লক্ষ্যনিবদ্ধ গতিবিধির মধ্যে রুশদের শক্তির প্রধান দুইটি বৈশিষ্ট্য—সরলতা ও সংকল্পে দৃঢ়তা—ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই প্রধান বৈশিষ্ট্য ছাড়াও যুদ্ধের বিপদ, ক্রোধ ও কষ্ট তাহাদের মনে যে-আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করিয়াছে, যে-মহৎ ভাব ও অনুভূতির তরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহাদের মুখের উপর তাহার ছায়াও পড়িয়াছে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দে শুধু কানের মধ্য দিয়া নহে, সমগ্র শরীরের মধ্য দিয়াই একটা কম্পন প্রবাহিত হইয়া যায় এবং মাথা হইতে পা পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে। তারপরই কানে ভাসিয়া আসে ক্রমে-দূরে-চলিয়া-যাওয়া একটি ধাবমান শেলের তীব্র

আর্তনাদ। সঙ্গে সঙ্গে বারুদের ঘন ধোঁয়ায় আমার সর্বাঙ্গ, কামানের মঞ্চটি এবং নাবিকদের কালো কালো দেহগুলি আবৃত হইয়া যায়। কানে আসে, এই তোপটি সম্পর্কে নাবিকেরা নানাপ্রকার মতপ্রকাশ করিতেছে। তাহাদের সকলের মধ্যেই একটা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করি। তাহাদের চোখেমুখে এমন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করি যাহা দেখিব বলিয়া হয়তো প্রত্যাশা করি নাই – শত্রুর প্রতি যে-ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আকাঙ্ক্ষায় আজ প্রতিটি মানুষের মন ভরিয়া উঠিয়াছে, এই নাবিকদের চোখে মুখে তাহারই ছবি দেখিতে পাই। তাহারা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠে, 'ঠিক ফোকরের ভেতর দিয়ে মারা হয়েছে। বোধ হয় দুজন সাবাড় হল। ঐ তো তাদের নিয়ে যাচ্ছে!' একজন বলিয়া উঠে, 'এবার ক্ষেপে যাবে, আর এক মিনিটের মধ্যেই একটা পাল্টা মারবে।' সত্যই কয়েক মুহূর্ত পরেই বিদ্যুতের মত এক ঝলক আলো ও একরাশ ধোঁয়া দেখা গেল। আলিসার তলায় দণ্ডায়মান প্রহরী চীৎকার করিয়া হাঁকিল, 'কা-মা-ন!' আমার পাশ দিয়া চলিয়া গেল একটি গোলা, ধপাস করিয়া পড়িল মাটিতে, কাদা ও পাথরের ফোয়ারা উঠিল আকাশে। ব্যাটারী-কম্যাণ্ডার ইহাতে বিরক্ত হইয়া আরেকবার কামান দাগিবার হুকুম দিলেন এবং তৃতীয় একটি কামানে বারুদ ভরিতে বলিলেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য শত্রু পাল্টা আঘাত হানিতে লাগিল। মনে অদ্ভুত অদ্ভুত নানা ভাবের উদয় হওয়ায় আমার শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। কৌতূহলী হইয়া দেখি ও শুনি নানা অদ্ভুত জিনিস। প্রহরী আবার হাঁকিয়া উঠে, 'কামান!' আবার শোনা যায় ধাবমান গোলার তীব্র শব্দ। শোনা গেল সে-গোলা দড়াম করিয়া মাটিতে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কাদার রাশি ছিটকাইয়া আকাশে উঠিয়াছে। এবার প্রহরী হাঁকে, 'ছোট কামান!' শুনিতে পাই একটা একটানা শব্দ। মৌমাছি-গুঞ্জনের মত এই শব্দ শুনিতে ভালই লাগে, মোটেই ভয়ংকর কিছু বলিয়া মনে হয় না। দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে এই গুঞ্জনধ্বনি ক্রমেই কাছে আসিতে থাকে। দেখা যায় একটি কালো গোলা। তারপর সে-গোলা ধপ করিয়া মাটিতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চারিদিক কাঁপিতে থাকে। তীব্র শন শন শব্দে চারিদিকে ছুটিতে থাকে শেলের কুঁচি, পাথরগুলি বেগে উৎক্ষিপ্ত হয় আকাশে, আমার সর্বাঙ্গ কাদায় ভরিয়া যায়। কিন্তু সর্বক্ষণই মনে ভয় এবং আনন্দ-মেশান একটি ভাব জাগিয়া থাকে। সেই মুহূর্তে মনে হয়, শেলটি ঠিক আমার দিকেই আসিতেছে। নিশ্চিত মনে হয় মৃত্যু অনিবার্য, কিন্তু আমার গর্বই আমাকে ভাঙিয়া পড়িতে দেয় না। আমার বুকের মধ্যে কী যেন চিরিয়া ফেলিতেছে, বাহির হইতে তাহা

কেহ জানিতেও পারে না। কিন্তু শেলটি যখন আমার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল, আমাকে স্পর্শ করিল না, তখন এক মুহূর্তের জন্য হইলেও এক অনির্বচনীয় আনন্দে ও স্বস্তিতে আমার মন ভরিয়া উঠে। এই বিপদের, এই জীবন-মৃত্যুর খেলার এক অদ্ভুত নেশা আমাকে পাইয়া বসে। আমি চাই গোলা বা শেল আমার আরও কাছে আসিয়া পড়ুক। কিন্তু প্রহরীটি আবার তাহার কর্কশ উঁচু গলায় হাঁকিয়া উঠে, 'ছোট কামান!' আবার শোনা যায় সেই তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দ, আবার সেই প্রচণ্ড আওয়াজ, তারপরই বিস্ফোরণ। কিন্তু এবার এই শব্দের সঙ্গে মিলিত হইয়া আসে মানুষের গোঙানি। লোকটির কাছে ষ্ট্রেচার পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তাহার পাশে গিয়া দাঁড়াই। রক্ত ও কাদার মধ্যে শায়িত লোকটির চেহারা অদ্ভুত, প্রায় অমানুষিক মনে হয়। তাহার বুকের একটা অংশ উড়িয়া গিয়াছে। প্রথম কয়েক মুহূর্ত তাহার কাদামাখা মুখে শুধু ভয়ের চিহ্ন জাগিয়া থাকে, আর ফুটিয়া উঠে যন্ত্রণা। যদিও মনে হয় সত্যকার যন্ত্রণা এখনও আরম্ভ হয় নাই এবং লোকটি যন্ত্রণার ভান করিতেছে মাত্র, অর্থাৎ এই অবস্থায় প্রায়ই লোককে যাহা করিতে দেখা যায় সে তাহাই করিতেছে। কিন্তু ষ্ট্রেচার কাছে আনা হইলে লোকটি যখন নিজে গিয়া ষ্ট্রেচারের উপর উঠিল এবং যে-পাশ জখম হয় নাই সেই পাশে ভর করিয়া শুইল, তখন তাহার এই ভঙ্গীটির মধ্যে যেন এক মহান অব্যক্ত অনুভূতি আত্মপ্রকাশ করিল। তাহার চোখ দুইটি জলিয়া উঠিল। দাঁতে দাঁত লাগিয়া গেল, বেশ কষ্ট করিয়াই সে মাথা উঁচু করিল, এবং যখন তাহাকে ষ্ট্রেচারে তোলা হইল তখন সে ষ্ট্রেচারবাহকদের থামাইয়া সাথীদের দিকে ফিরিয়া কম্পিত দুর্বলকণ্ঠে বলিল, 'বন্ধুগণ, আমাকে ক্ষমা কর!' মনে হয়, সে আরও কিছু বলিতে চাহিল। যেন কোন কোমল মনোভাব প্রকাশ করিতে চাহিল কিন্তু সে শুধু ঐ একই কথা আবার বলিল, 'বন্ধুগণ, আমাকে ক্ষমা কর!' একজন নাবিকসঙ্গী তাহার নিকট গিয়া নিজের টুপিটি তাহার মাথায় পরাইয়া দিল। টুপিটি যাহাতে সে পরাইতে পারে সেজন্য লোকটি মাথা তোলে। নাবিকটি ধীর, শান্তভাবে হাত দুইখানি দোলাইতে দোলাইতে আবার তাহার কামানের কাছে ফিরিয়া যায়।

আমার মুখে আতঙ্কের ছায়া দেখিয়া নৌবাহিনীর অফিসারটি বলে, 'এমনি করেই রোজ আমরা সাত-আটজন লোক হারাই।' হাই তুলিয়া সে আবার একটি হলুদ রঙের সিগারেট পাকাইতে থাকে।

এইভাবে সেবাস্তপোল-প্রতিরোধীদের যুদ্ধরত রূপটি দেখিলাম। ফিরিয়া আসিবার পথে ভাঙ্গা নাট্যশালা পর্যন্ত সমস্ত রাস্তায় মাথার উপর দিয়া কামানের

গোলা ও বুলেট চলিয়া যাইতে লাগিল। কেন জানি না উহা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। এক প্রশান্ত মহান ভাবে পরিপূর্ণ মন লইয়া দৃঢ়পদক্ষেপে চলিয়া আসিলাম। আসল কথা হইতেছে, এক আনন্দময় দৃঢ়প্রত্যয়ে আমার মন তখন ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেবাস্তপোল যে শত্রুকবলিত হইতে পারে না শুধু সেই দৃঢ় বিশ্বাসই নহে, কোনস্থানেই যে রুশ জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গা যায় না, সেই দৃঢ় বিশ্বাসও বটে। সেবাস্তপোল দখল করা এবং রুশদের মনোবল ভাঙ্গা যে অসম্ভব তাহা তো আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম অসংখ্য আবর্তমঞ্চ, আলিসা, আঁকাবাঁকা পরিখা, মাইন ও অকারণে স্তূপীকৃত কামানের সারির মধ্যে নহে, সেবাস্তপোল-প্রতিরক্ষাকারীদের চোখে, কথায়, ভাবভঙ্গীতে এবং মনোবল বলিতে যাহা বুঝায় তাহারই মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলাম। তাহারা যাহা করিতেছে এবং এত সহজে ও অনায়াসেই করিতেছে যে, তাহারা যে ইহার একশতগুণ বেশী করিতে পারে, তাহারা যে সব-কিছুই করিতে পারে, সে-সম্পর্কে মনে কোন সন্দেহই থাকে না। স্পষ্ট বুঝিতে পারি, যে-অনুভূতি তাহাদের প্রেরণা জোগাইতেছে সে-অনুভূতি, ক্ষুদ্রতা, উচ্চাভিলাষ অথবা আমার মত বিস্মৃতির অনুভূতি নহে। এই অনুভূতি অনেক বেশী গভীর। এ সেই অনুভূতি যাহার প্রেরণাবলে মানুষ শেল-বুলেটের শিলাবৃষ্টির মধ্যে, শতকরা নিরানব্বই ভাগ মৃত্যুসম্ভাবনার মধ্যে, ক্লান্তিহীন পরিশ্রম, সতর্কতা ও আবর্জনার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। ক্রুশচিহ্ন অথবা খেতাবের লোভে অথবা শাস্তির ভয়ে এই ভয়াবহ অবস্থা মানুষ সহ্য করিতে পারে না। সহ্য করিতে হইলে চাই অন্য কোন উচ্চতর কারণ। সেবাস্তপোল অবরোধের প্রথম দিকে না ছিল কোন দুর্গপ্রাকার, না ছিল কোন সৈন্য, না ছিল সেবাস্তপোল রক্ষার বিন্দুমাত্র বাস্তব সম্ভাবনা। কিন্তু তখনও বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে সেবাস্তপোল শত্রুর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না। অবরোধের সেই প্রথম দিকে প্রাচীন গ্রীসের বীরদের অনুরূপ বীর কর্নিলভ একদিন তাঁহার সেনাপতিদের পরিদর্শন করিতে করিতে বলিয়াছিলেন, 'মনে রেখ, আমরা মরব, তবু সেবাস্তপোল ছাড়ব না!' রুশরা বাগাড়ম্বর জানে না। তাহারা সেদিন কর্নিলভের সে-কথার জবাবে বলিয়াছিল, 'হ্যাঁ, আমরা মরব। হুররে!' সেবাস্তপোল অবরোধের প্রথম দিককার সে-সকল কাহিনীকে আজ আর চমৎকার ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকাহিনী বলিয়া মনে হয় না, বাস্তব সত্য বলিয়াই বুঝিতে পারি। স্পষ্ট বুঝিতে পারি এবং কল্পনায় দেখিতে পাই সেইসব মানুষগুলিকে যাহাদের রূপ আজই আমি চোখে দেখিয়াছি,

সেইসব বীর যাহারা সেই দুঃসহ কঠোর দিনে হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়া দূরে থাকুক, মনোবলকে ক্রমেই অটুট হইতে অটুটতর করিয়া তুলিতে পারিয়াছিল, এবং শুধু একটি সহরের জন্যই নহে, মাতৃভূমির জন্যই হাসিমুখে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। রুশ জনসাধারণই এই সেবাস্তপোল মহাকাব্যের নায়ক। এই মহাকাব্যের গভীর ছাপ রুশিয়ার বুকে বহু বহু কাল ধরিয়া জাগিয়া রহিবে।

পৃথিবীতে গোধূলি নামিয়া আসিতেছে। ধূসর মেঘে আকাশ আবৃত। অস্তগামী সূর্য সেই আবরণের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধোঁয়াটে মেঘের গায়ে, তরঙ্গে তরঙ্গে দোল-খাওয়া অসংখ্য জাহাজ ও নৌকায় সমাকীর্ণ নীল সমুদ্রের বুকে, সহরের সাদা দালানগুলির উপর এবং রাস্তায় রাস্তায় চলমান মানুষগুলির সর্বাঙ্গে হঠাৎ তাহার রক্তরশ্মি ছড়াইয়া দিল। কোথায় যেন বুলেভার্ডের উপর ফৌজী ব্যাণ্ডে দ্বৈত নৃত্যসংগীতের সুর বাজিতেছে এবং কিল্লাগুলির তোপধ্বনির শব্দের সহিত মিশিয়া ঐ সুর জলের উপর দিয়া ভাসিয়া আসিতেছে।

অনুবাদ ॥ সরোজকুমার দত্ত

এ লি ন পে লি ন

আন্দ্রেস্কো

'ব্যস্, আর কি ! একেবারে দিনমানেই পৌঁছে যাব। বড় চড়াইটা তো প্রায় পেরিয়ে এলাম। আর সামনে মাত্র একটা পুচকে পাহাড় ছাড়া পাশে এক চিলতে একটা জঙ্গল···এই যা। তারপরই সোজা গাঁয়ে। বুঝেছেন, স্যার।' ইয়া এক ঘা চাবুক কষিয়ে ছোকরা গাড়োয়ানটা হাঁকলো, 'নে···নে···চ···চ···চবে শালা বাবু-সাহেবের বাচ্চা···চ···চ···ফুর্তি···উ-র্‌-র্‌-র্‌···রাঃ···রাঃ···রাঃ···।'

বরফ লটকানো জলকাদা বসা গাঁ-মুখো মেঠো পথটা বৃষ্টিতে ভিজে একাকার। নড়বড়ে ছ্যাকড়া গাড়িটা এরই মধ্যে দিয়ে বেশ একটানা ছুটে চলেছে।

ছোকরা গাড়োয়ানটা ওরই মধ্যে পাটাতনটায় পরিপাটি করে বেশ আয়েশী মেজাজে বসে, মাথার ওপরের হুড্‌টা আলতোভাবে ঘুরিয়ে মন চাহি মেজাজে 'তা···না···না···না' সুর ভাজতে শুরু করল।

'তোমার নামটা কি হে ছোকরা ?' পেছনের আসনে ঘাপটি মেরে বসে থাকা ইয়া পেল্লায় ফারকোটের ভেতর থেকে মোটা থলথলে ভদ্রলোকটি তার নাকের ডগাটা একটু বার করে বললেন।

ছোকরার গান তখনো সমানে চলছে দেখে ভদ্রলোক আরও উচ্চৈঃস্বরে হাঁকলেন, 'এ্যাই ছোকরা···! বলি শুনতে পাচ্ছ না নাকি ?'

'আজ্ঞে···বলুন।'

'তোমার নাম···তোমার নামটা কী ?'

'এ্যা···হ্যাঁ। আজ্ঞে আন্দ্রেস্কো। আন্দ্রেস্কো, স্যার।'

'আ···আন্দ্রেস্কো···এতক্ষণে হুঁশ হল। পাজি নচ্ছার বদমাশ কোথাকার ! এই যে তোমরা, মানে এই চাষীরা আরকি—এই ফন্দি-ফিকিরগুলো বেশ ভালই জানো। কখন, কোথায়, কাকে কীভাবে কব্জা করতে পারবে, কাকে কোন তালে টুপিটি পরাতে পারবে এসব শয়তানি বুদ্ধি তোমাদের মগজে বেশ চটপট খেলে। আমি তোমাদের তো আদালতে দেখি। ওঃ ! জজের সামনে যেন একেবারে ভিজে

বেড়ালটি হয়ে বসে থাক। আর কত মিথ্যে ভড়ং, কত ওজর-আপত্তি, কত ধানাইপানাই করে বোঝাবার চেষ্টা যে তোমাদের মত সন্তপুরুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। আসলে তোমরা নেকড়ের চেয়েও ধূর্ত।'

'আজ্ঞে! না, স্যার। আমরা নিতান্তই ছাপোষা ভাল মানুষ, লোকে ওরকম রটায় বলে আমাদের ধূর্ত মনে হয়। আসলে আমরা তেমন নই। আমরা নিতান্তই সরল এবং ভাগ্যের দোষে গরীব। কোনমতে দিন গুজরান করি।'

'আঃ! গরীব! বিলকুল গরীব। সবসময়ে তোমাদের মুখে ওই এক কথা। আমরা একেবারে গরীব! খেতে পাই না! পরতে পাই না! কেবল ওই নেই-নেই রব! অথচ দিনরাত মদ গিলছ শুয়োরের মত। তোমাদের ধরে চাবকান দরকার।'

'না স্যার। ওগুলো স্রেফ্ মিথ্যে কথা। একবারও কি ভেবে দেখেছেন কেন আমরা মদ খাই। আমাদের সমস্যা আমাদের খেতে বাধ্য করে। সমস্যা ভুলতেই আমরা মদ খাই। এমন নয় যে সমস্যা নেই বলে আমরা নিশ্চিন্তে মদ খাই। স্যার, আপনার মত বিজ্ঞ লোকের উচিত আমাদের সম্বন্ধে যথার্থ খোঁজখবর নেওয়া।'

'ও বাবা! তুমি তো হে কালকের ছোকরা, এখনও গোঁফ পর্যন্ত গজায়নি, কিন্তু কথায় তো দেখছি ওস্তাদ। লেখ-টেখ নাহে কিছু তোমাদের চাষীদের সম্বন্ধে। ওরা একেবারেই হেজে গেছে।'

'আপনিই স্যার ভাল বুঝবেন। ওসব বলতে হয়, লিখতে হয় আপনারাই বলুন, লিখুন! আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। লেখা-টেখা আমাদের কাজ নয়।…নেঃ… নেঃ, চ…চ…বাবুসাহেবের বাচ্চারা। হু-র-র-র রাঃ…রাঃ…রাঃ…।'

চিৎকার করে আন্দ্রেস্কো লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মারল। এবং হঠাৎই এমন ভাবে চুপ করে গেল যে মনে হল যেন গভীর কিছু ভাবনায় মগ্ন হয়ে পড়েছে সে।

তাড়া খেয়ে বুড়ো হাড় জিরজিরে ঘোড়াদুটো বেশ জোরেই আঁকুলি তুলে ছোটা শুরু করল এবং এদিক ওদিক দেখতে লাগল এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব নিয়ে যেন মনে হল তারাও যথেষ্ট চিন্তামগ্ন। গাড়ির ভেতর বসা সেই ধুমসো ভদ্রলোক তার মোটা এবং বড় ফারকোটের কলারটা বেশ ভালভাবে কষে কান দুটো ঢেকে জবুথবুর মত বসে এধারে ওধারে জোলো ঝাপসা পাহাড়, আকাশ আর ধূসর মাঠের দিকে তাকিয়ে হালকাভাবে কিছু যেন ভাবতে বসে গেলেন। আর এই খাঁ খাঁ নিস্তব্ধ ধূসর পিছল পথের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঝিমনো বড় গাছটার শুকনো

নড়বড়ে মগডালের পাতার ছপ্পড়ে বসে থাকা অন্যমনস্ক দাঁড়কাকটাকে আজ, আহাঃ, বড়ই বিষণ্ন, বড়ই করুণ আর একা ঠেকছে! শীতল এবং চাপচাপ মৃদু হাওয়া, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের হাল্কা সঞ্চরণ, আর ফাঁকে ফাঁকে দৃশ্যমান ওই নীল আকাশ বড় অস্পষ্ট, কালচে আর গভীর বিষাদময়। সমস্ত পৃথিবীটাই যেন হয়ে গেছে কর্দমাক্ত, ভ্যাপসা। দূরে, বহু দূরে ঝিমিয়ে-পড়া ঝাপসা জনপদ, বনজঙ্গল, ভরপুর নদী, কর্দমাক্ত পথ, আরো বহু দূরে ছাই ছাই, আবছা আবছা, ছায়া ছায়া পর্বতমালা, দুরন্ত চড়াই-উৎরাই আর তার ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘ শায়িত মাঠ। সবই যেন আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে। ছোটবড় সবকিছু অন্ধকারে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। তামাম দুনিয়াটাই যেন গুমোট নিস্পন্দ, অস্বচ্ছ জলাধারে চাপা, যেন কোন মৃতের তাকিয়ে থাকা বোবা অথচ ভয়াবহ চোখের মত রহস্যময় এবং অসাড়।

খানিকটা ডুবে-যাওয়া খানিকটা বেরিয়ে-থাকা জল-কাদা-মাটি মাখা এবড়ো খেবড়ো রাস্তাটার ওপর দিয়ে ছ্যাকড়া গাড়িটা কোনো মতে টলমল করতে করতে, হোঁচট খেতে খেতে চলেছে। আর ওটার পেছনে নিচের দিকটায় একটা নড়বড়ে আধখানা খুলে যাওয়া তক্তা বিশ্রী একঘেয়ে ট্যাকস্ ট্যাকস্ আওয়াজ তুলছে। শব্দটা এই পরিবেশে একটানা বাজতে থাকার দরুন রীতিমত স্নায়ুপীড়ার সৃষ্টি করছে—অন্তত গাড়ির ভেতরে বসে থাকা গোমস্তা সাহেবটির। আর থাকতে পারলেন না ভদ্রলোক। ভারী কোটটার উঁচু কলারটা মুখ থেকে খানিকটা নামিয়ে বেশ অসহিষ্ণুভাবেই বলে উঠলেন, 'অসহ্য! ওঃ, কী ভয়ানক বিশ্রী শব্দ! কি হে—কী ব্যাপার?'

'ও স্যার, কিছু না। গাড়িটার পাটাতনের নিচে একটা ইস্ক্রু ঢিলে আছে, তাই আরকি।'

'ওঃ! কি হতচ্ছাড়া বিশ্রী আওয়াজ!'

'হুঁঃ হুঁঃ, একেবারে খাসা দিগ্‌গজ্ পণ্ডিতের মতো! তাই না স্যার?'

'এ্যা? পণ্ডিতের মতো কিরকম?'

'বুঝলেন না স্যার, পণ্ডিতেরা যেমন আকৃছার বড় বড় বুকনি দেয়—যার অর্থ সে নিজেই বোঝে কি বোঝে না, অন্যরা তো কোন ছার! বড় বড় পণ্ডিত মানেই তো স্যার ওই রকম বড় বড় ফাঁকা আওয়াজ।'

'তুমি একটি আস্ত ধড়িবাজ, পাকা ধুরন্ধর। আমি হলফ করে বলতে পারি আইবুড়ি ছুঁড়িদের সঙ্গে তুমি বোল চাল মেরে খাসা জমাতে পারবে—যদি তোমার

বিয়ে না হয়ে থাকে। অবশ্য তোমাদের ওসব ল্যাঠা সাধারণত উঠতি বয়সেই চুকে যায়। বেশ সুন্দর কচি কচি চেহারার বউগুলো, দেখতেও বেশ।'

'তা আপনারা যা মনে করেন বলতে পারেন। তবে স্যার, আপনাদের ঐ মেমসাহেবের কাছে আমাদের এসব কিছু না। সে যাক্। একটা কথা স্যার, আপনি কী করেন স্যার? আমাদের এখানেই বা কেন এসেছেন?'

'আমি একজন সরকারী পেয়াদা।'

'তাহলে স্যার আপনি নিশ্চয়ই কারো জমি বা সম্পত্তি ক্রোক করতে যাচ্ছেন।'

'ঠিক ধরেছ। তোমাদেরই একজন চাষা বহুকাল থেকে আমাকে তুর্কী নাচ দেখিয়ে যাচ্ছে। আজ ব্যাটার কিছুতেই নিস্তার নেই। কিসে কী হয় বুঝিয়ে দেব। অনেকবার আমি ওকে ধরার চেষ্টা করেছি, প্রতিবার ধুলো দিয়েছে চোখে, অল্পের জন্য ফসকে গেছে। আজ তাকে বুঝিয়ে দেব কত ধানে কত চাল। আমি যাচ্ছি তার সমস্ত গম দখল করে নিতে যাতে সে চিরকাল মনে রাখতে পারে আমাকে এবং এই দৃষ্টান্ত তোমাদের সব চাষাদের যাতে মনে থাকে চিরকাল তার বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি। তোমরা ভেবেছ কী! কেবল ভদ্রলোকদের ঠকাবে! ব্যবসায়ী, সহরের মানুষ—প্রত্যেককে তোমরা নানারকমে ঠকাও! তাদের পচা ডিম, বাজে মাখন খাওয়াচ্ছ। একটু সবুর কর তোমরা—ধুরন্দর চাষার দল! তোমাদের এই চিটিংবাজি আর চলবে না। তোমরা এরপর খুবই শক্ত হাতে পড়বে। উঠতে বসতে চাবুক খাবে। তখন বুঝবে চিটিংবাজির ফল কী? তোমরা দিন-কে-দিন পাঁড় মাতাল হয়ে উঠছ। তোমরা সবরকমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। এদিকে সরকারকে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছ। ট্যাক্স দাওনা ঠিকমত। তোমরাই দেশটাকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে দেবে। আমি যদি ক্ষমতা পেতাম, একবার অন্তত, তাহলে দেখে নিতে পারতাম তোমাদের।'

একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে ভদ্রলোক হাঁপাতে লাগলেন বেশ। তারপর ওই মোটা ফারকোটের মধ্যে এমনভাবে ডুব মারলেন যে মনে হল যেন একটা মুরগি তার ডিমে তা দিতে বসেছে।

'আজ্ঞে বাবু, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। যেমন দেখুন না—ভগবান আমাদের এই জগৎটা সৃষ্টি করেছেন, বুঝেছেন মেয়েমানুষের দাড়িগোঁফের দরকার নেই, কাজেই মেয়েমানুষ দাড়িগোঁফ লাভের সৌভাগ্যে বঞ্চিত। আবার গাধাদের প্রসঙ্গে তিনি বুঝেছেন তাদের লম্বা লম্বা কানের প্রয়োজন। কাজেই গাধারা লম্বা

কান নিয়ে গর্ব করার সুযোগ পেয়েছে।' বেশ উপভোগ্য ভঙ্গিতে সোজাসুজি কথাগুলো বলল আন্দ্রেস্কো।

'বেশি বক বক কোরো না। আরো জোরে গাড়ি চালাও। ওদিকে অন্ধকার হয়ে এল। তুমি এই সামান্য কুড়ি কিলোমিটার পথের জন্য অনেক বেশি ভাড়া নিচ্ছ। তুমি একটা শয়তান বিশেষ। চালাও জোরে, আর জোরে। শুনতে পাচ্ছ? গতি দেখে মনে হচ্ছে তোমার ওই হাড়গিলে ঘোড়াগুলো ঝিমিয়েই পড়েছে।'

সপাং সপাং চাবুকের আওয়াজ তুলে আন্দ্রেস্কো ঘোড়াদুটোর উদ্দেশ্যে আওয়াজ ছাড়লো, '···চল্···চল্···চল্·· বাবুসাহেবরা। হুর্‌-র্‌ রাঃ···রাঃ···রাঃ।'

'তুমি এদের বাবুসাহেব বলছ! বাঃ তা বেশ, ভাল ভাল। তার থেকে দাদা বল, আরো ভাল শোনাবে,' বেশ ঠাট্টার সুরে গোমস্তা সাহেব বললেন।

'আজ্ঞে স্যার, তাতে ওদের অসম্মান করা হবে। আমি যদি ওদের বাবুসাহেব, ভদ্দরলোক—এসব না বলি তবে ওঁরা অসন্তুষ্ট হবেন। কারণ ওঁরা সাহেবদের চেয়ে কোনো অংশে কম যান না। একেবারে পাক্কা সাহেবদের মতোই এঁদের অভ্যাস। ঘড়ি ধরে এঁরা শয্যাত্যাগ করেন। শয্যাগ্রহণ করেন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। খাওয়া-দাওয়া, দলাই-মলাই—মায় কাজের জন্য বেরনো—যাকে আমরা বলি অফিসে যাওয়া—সব ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। এমনকি কখনো কখনো তাঁরা তাঁদের আস্তাবলে কাগজ পর্যন্ত পড়েন। তবে কেন এঁদের সাহেব বলব না স্যার?'

'সত্যি করে বল তো কোন দোকানের মালে তুমি নেশা কর। যত্ত সব! বেশি বোকো না তো। তাড়াতাড়ি চালাও। এমনিতেই বেশ দেরি হয়ে গেছে। তোমার চোখদুটো একেবারে ধুরন্দরের মতো।'

'ভড়কে যাবেন না স্যার, এখানে বাঘ-টাঘের বালাই একেবারেই নেই।' আন্দ্রেস্কো এক লহমায় চারদিকটা বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে এমনভাবে কথা পাড়লে যে ভদ্রলোক আকস্মিক উৎকণ্ঠায় চারদিকে একবার চোখটা ঘুরিয়ে নিনে।

'ওসব বাঘ-টাঘে আমার কোনোকালেই ভয় নেই। তবে এই দারুণ ঠাণ্ডাই আমাকে কাবু করে দেবে হে।'

'কিছু মনে করবেন না স্যার। ওই মোটা চটগুলোকে আষ্টেপিষ্টে গায়ে জড়িয়ে নিন না। বেশ গরম কিন্তু ওগুলো। আমার ঘোড়াগুলো পর্যন্ত কোনো শীতে কষ্ট পায় নি ওগুলো গায়ে দিয়ে।'

'ওঃ, কী বিদঘুটে আবহাওয়া রে বাবা!' বেশ বিরক্ত হয়ে তিনি বলে

উঠলেন। তারপর হাঁক পাড়লেন, 'জোরে চালাও না হারামজাদা, শুয়োর!' তারপর বেশ গর্বিতভাবে তাঁর ফারকোটের মধ্যে ডুবে থেকে চুপ মেরে গেলেন।

'হুঃ, তুমি বেশ ভাল লোকের পাল্লায়ই পড়েছ। দেখা যাক।' —আন্দ্রেস্কো নিজের মনে বলে উঠল। তারপরই একটু ঘুরে ভাল করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'তাহলে, আপনি কারো সম্পত্তি ক্রোক্ করতে যাচ্ছেন—না স্যার? তা স্যার, কার প্রতি এমন কৃপা দৃষ্টি করছেন?'

গোমস্তা ভদ্রলোকটি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে উত্তর দিলেন, 'তোমাদের ওদিকেই থাকে। নামটা বোধ হয় স্তানোয়কা। ঘাড়ে-গর্দানে বেশ জাঁদরেল গোছের।'

'ও। আমি তাকে চিনি। আপনি তার গম আটক করতে যাচ্ছেন, তাই না? কিন্তু স্যার লোকটা ভয়ানক অভাবী। এ-যাত্রা তাকে ছেড়ে দিন স্যার।'

'হুম্। অভাবী, গরীব মানুষ! ছেড়ে দিন স্যার! ভীষণ শয়তান লোকটা! এসব ব্যাপারে আমার কোনো দয়ামায়া নেই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোমস্তা সাহেব চুপ করে গেলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত চরাচর তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। সামনে একটা মাত্র পাহাড়। বেশ ছোট ঘোড়া-দুটো বেপরোয়া ছুটছে পাহাড়টাকে অতিক্রম করার জন্য। পাহাড়টা পেরলেই মনে হয় গন্তব্যস্থল গ্রামটি এসে পড়বে। আন্দ্রেস্কো এসব কিছু লক্ষ করছে না। সে একটি মতলব বার করতে মগ্ন হয়ে গেছে চিন্তায়। এজন্য সে ঘোড়ার গতি বাড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত চিরকেলে আওয়াজ দিতেও ভুলে গেছে। চাবুক ঘোরাতে ভুলে গেছে। এমনকি গুন গুন স্বরে গান করার কথাও তার মনে নেই।

গাড়িটা যতক্ষণে ছোট পাহাড়টা ডিঙিয়ে শেষে একখানি সমতল মাঠটাকে পেছনে ফেলে ধীরে ধীরে একেবারে নিচে নেমে এল, ততক্ষণে রাত্রি তার যথার্থ চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। গ্রামটাও দেখা যাচ্ছিল না। সরাসরি হাড়গুলোকে পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় এইরকম একটা তীব্র শীতল হাওয়া সৃষ্টির সময়কার পৃথিবীর সঞ্চিত সমস্ত আর্দ্রতা থেকে উদ্ভূত হয়ে টাইফুনের থেকে তীব্র বেগে বয়ে গেল সমস্ত জগৎটা জুড়ে। বিশেষ করে গাড়িটাকেই যেন তা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ধরল!

জমাট কুয়াশাচ্ছন্ন ঝাপসা নীলচে আকাশটা এখন বেশ খোলতাই আর ঝক-ঝকে হয়ে আসছে। ধোঁয়াশা রঙের মেঘগুলো আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। বাধা-মুক্ত ভাবে আকাশ জুড়ে এখন শুধুই তারারা বিদ্যমান।

গাড়িটা আগের মতোই ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে এগিয়ে চলেছে অন্ধকার হাতড়ে।

হাওয়ার ছোবলটা আরো তীব্র হয়ে উঠলে, আরোহী সাহেবটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'এই হারামজাদা, তাড়াতাড়ি চালা না! এই ঠাণ্ডায় জমে মরে যাব যে।'

আন্দ্রেস্কো একটু অন্যরকম আওয়াজে ঘোড়াদুটোকে তাড়া লাগালো। খুব মোলায়েমভাবে চাবুকটা একবার ওদের গায়ে বুলিয়ে নিয়ে এল এবং যথারীতি ঘোড়াদুটোও কোনোরকম গা না করে নিজেদের মনমতো-গতিতে গাড়িটা টেনে চলল—যেন তারা কিছুই শোনে নি। ওদিকে আন্দ্রেস্কোর মনে তখনো স্তানোয়কার চিন্তা কাজ করে যাচ্ছে। আগামীকালই তার গম দখল হয়ে যাবে। এবং যে-লোকটির দ্বারা একাজ হবে তাকে নিজেই সে নিয়ে যাচ্ছে তাদের গ্রামে।

'স্তানোয়কাকে যে-করেই হোক বাঁচাতে হবে। যে-করেই হোক...।' আবৃত্তি করল আন্দ্রেস্কো মনে মনে। 'আজ রাতেই তাকে খবর দিতে হবে। যাতে সে তার গমগুলো রাতের মধ্যেই কোথাও সরিয়ে ফেলতে পারে। ব্যতিক্রম হলে সারাবছর তার উপোসে কাটাতে হবে হয়ত। অথবা পেটের কষি টাইট করে খরচ চালাতে হবে, এ ভাবা যায় না। নাঃ! আমি তাকে যে-করেই হোক সাহায্য করব!'

এখন শুধুই অন্ধকার। আর এই অন্ধকারে কাদামাটি ছাড়া পৃথিবীটাকে আর আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না। শুধু থকথকে কাদা। এই কাদার আড়ালেই এক জায়গায় রাস্তাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পরেই আন্দ্রেস্কো তার নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়িটাকে আচমকা থামিয়ে দিল কষে লাগাম টেনে ধরে। 'ওঃ। একটু দাঁড়ান তো! আমি বোধ হয় রাস্তাটা গুলিয়ে ফেলেছি। তারপর সেই ছোকরা গাড়োয়ানটি অন্ধকারে কপাল কুঁচকে রাস্তা দেখতে শুরু করল।

ঠিক তক্ষুণিই ভদ্রলোকটির এতক্ষণকার কৌতুকী মেজাজটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়ে উদ্বেগ-মেশানো আওয়াজ বেরিয়ে এল তার গলা দিয়ে, 'সাবধানে চালাও হে ছোকরা। না হলে আমি ছেড়ে দেব না।'

আন্দ্রেস্কো আবার ঘোড়ার লাগামটা ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে বলল, 'শক্ত করে ধরে থাকুন বাবুসাহেব।'

সামনের দিকে একটু দূরে গ্রামের আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। ভেসে আসা কুকুরের ডাক প্রমাণ দিচ্ছে গ্রামটা খুব বেশি দূরে নয়। গাড়িটার ডানদিকে কয়েক গজ দূরে বিরাট একটা ইস্পাতের শীটের মতো মসৃণ অথচ মুক্ত স্বচ্ছ জল দেখা যাচ্ছে। গাড়িটা সোজা গিয়ে পড়ল তার মধ্যে বিরাট একটা সরীসৃপের মতো।

'কী হল, কী হল?'

'কিছু না স্যার, এটা একটা জলা জায়গা। রাস্তাটা এর ওপর দিয়ে গেছে।

কিছু ভয় পাবেন না। একটু বেশি ঢালু এই যা! আর এখানে-ওখানে কয়েকটা গর্ত আছে মাত্র। কতবার আমি এর ওপর দিয়ে যাতায়াত করেছি—কখনো গাড়ি নিয়ে, কখনো হেঁটে। হেই···চল্···চল্···ত্বর্-র্-র্ রাঃ। রাঃ। রাঃ। একটু শক্ত করে ধরে বসে থাকুন স্যার।'

ঘোড়াদুটো ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ করে সেই তীব্র ঠাণ্ডা জল ভেঙে এগিয়ে যেতে লাগল। মৃত্যু-নিস্পন্দ যে-জলে এতক্ষণ আকাশ প্রতিফলিত হচ্ছিল সেই জলে হঠাৎই প্রাণ ফিরে এল যেন। ওই হিমশীতল নীল-কালো জলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল সমস্ত আকাশটা।

'গাড়ি থামা তুই, জানোয়ার কোথাকার!' চিৎকার করে সেই গোমস্তা ভদ্রলোক তার ফারকোটের ভেতর থেকে যেন তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ভয়ে তাঁর গলার স্বর বদলে গেছে পর্যন্ত। 'তুই আমাকে ডুবিয়ে মারবি। বেটা ইতর! দেখতে পাচ্ছিস্ না যে গাড়ি এরি মধ্যে জলে তলিয়ে গেছে প্রায়। থাম্। থাম বলছি।'

রাগে গরগর করতে করতে ভদ্রলোক আরও সব অশ্রাব্য খিস্তি-খেউড় আরম্ভ করলেন। অন্দ্রেস্কো থামালো ঘোড়াদুটোকে। গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক ভাগাড়ের মাঝখানে। পাঁকে কাদায় একেবারে বসে গেছে চাকাগুলো। গাড়ির খোলের ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে জল বয়ে যাচ্ছে। হাতদূর না-দেখতে পাওয়া এই অন্ধকারে সেই ভাগাড়ের এমাথা ওমাথা কিছুই আন্দাজ করা যায় না। গোটা পৃথিবীটা জুড়েই যেন এর অবস্থান।

আবার আন্দ্রেস্কোর সেই গগনবিদারী আওয়াজ। কিন্তু তার সেই ঘোড়া-তাড়ানো উৎকট আওয়াজও এহেন অন্ধকার নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তলিয়ে গেল। কাছেপিঠেই ছিল শুধু কয়েকটা বুনো হাঁস যারা তাদের পাখার আওয়াজ তুলে চলে গেল অন্যত্র।

'আমাকেও ওই বুনো হাঁসের মতো মিলিয়ে যেতে হবে। এছাড়া···' মনে মনে কথাটা উচ্চারণ করে নিল আন্দ্রেস্কো।

'বেটা শুয়োর! জীবনে যদি কখনো এখান থেকে বেরতে পারি তবে তোর জীবনের সর্বনাশ আমি করব। ওঃ! আমি এখানে ডুবেই মারা যাব। বেটা গবেট, বেটা আকাট মূর্খ!'

'না, না গোমস্তামশায়, অত ঘাবড়াবেন না। এইরকম অন্ধকারে যে-কেউ পথ ভুল করতে পারে। একটু স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপারটা নিন না।' এইসব কথা

বসছে, অন্যদিকে আন্দ্রেস্কো তখন ঘোড়ার বন্ধন-দড়ি নিয়ে ব্যস্ত রেখেছিল নিজেকে। সে একবার সেই দড়িটাকে খুলে ফেলল, আবার তাকে যুক্ত করে দিল। আর সেই সঙ্গে সমানে চলছিল ঘোড়াগুলোর উদ্দেশ্যে অজস্র খিস্তি-খেউড়। এবং একটু পরেই সে নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সপাং সপাং চাবুক ঘুরিয়ে বসিয়ে দিল কয়েক ঘা। তারপর বলতে লাগল, 'চল্ শালা, এগো, জল্দি এগো…।'

ঘোড়াদুটো এইবার শেষবারের মতো জান কবুল করে চেষ্টা করল পাঁকে-বসে-যাওয়া গাড়িটাকে টেনে তুলতে। তৎক্ষণাৎ একটা ঘোড়া, যে-কারণেই হোক, হঠাৎই গাড়ির দড়ি আলগা পেয়ে টেনে দৌড় মারল সেই জলকাদা ভেদ করে। অন্যটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একাকী।

'হায় ঈশ্বর! কী যে ঘটতে চলেছে!' ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভদ্রলোক গাড়ির উপর উঠে দাঁড়িয়ে বেশ জোরে জোরে কথাগুলো উচ্চারণ করলেন।

আর ঠিক তক্ষুণিই আন্দ্রেস্কো অন্য ঘোড়াটার পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ে আগের ঘোড়াটাকে অনুসরণ করল।

এবার ভদ্রলোক ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করে উঠলেন, 'ডরকো…ডরকো…ডরকো…! আরে তুই কোথায় যাচ্ছিস? কী করছিস তুই? দাঁড়া…দাঁড়া…বেটা শুয়োরের বাচ্চা…গেঁয়ো ভূত…ধুরন্ধর চাষা…আমি তোকে দেখে নেব!'

প্রত্যুত্তরে পৈশাচিক উল্লাসধ্বনিই শুধু ভেসে এল সেই অন্ধকার থেকে।

'আরে এই শুয়োরের বাচ্চা, তুই আমাকে এখানে ফেলে যাচ্ছিস? ওরে বুনো পশুরা আমাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলবে যে! ওরে বাবা, তুই ফিরে আয়। অমন করিস না, আমি ক্ষমা চাইছি।' যতটা সম্ভব করুণস্বরে ভদ্র-লোক কথাগুলো বললেন, বোঝা যাচ্ছিল তাঁর চোখে ইতিমধ্যে জলও দেখা দিয়েছে।

'ভয় পাবেন না। ভয় পাবেন না।'…সেই ঘন অন্ধকার থেকে আন্দ্রেস্কোর গলা পাওয়া গেল। 'ওইরকম জলকাদায় বুনো পশুরা যাবে না। আপনি নিশ্চিন্তে ওই চটগুলো মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন স্যার? একটুও ঠাণ্ডা লাগবে না। আমি কাল সকাল হবার আগেই চলে আসব। দেখবেন গাড়িতে কিছু খড়ও আছে, ওগুলো বিছিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। ভয় নেই, আমি ওর জন্য কোনো দাম ধরব না।'

তখনই সেই গোমস্তা ভদ্রলোক, অপার্থিব কিছু আওয়াজ শুনে থাকবেন হয়ত, প্রচণ্ড আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ও কী?! কী ওখানে? এই ভাগাড়ের

মাঝখানে !' এই ঠাণ্ডা কালো জল দেখে মনে হচ্ছে এ যেন অন্তহীন হয়ে কোথাও এগিয়ে গেছে দূরদূরান্তে।

'ফিরে এস আন্দ্রেস্কো, আমি তোমায় অনেক টাকা পয়সা দেব। যত টাকা তুমি চাইবে, দেব। তোমার কি দয়া বলে কিছু নেই ? তুমি কি স্থূলবুদ্ধির মানুষ ! একটানা কথাগুলো বলে গেলেন তিনি, কোনো উত্তর শোনা গেল না।

অগত্যা তিনি বেপরোয়া হয়ে বোধবুদ্ধির মাথা খেয়ে সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে গর্জন করে উঠলেন, 'এই শুয়োরের বাচ্চারা, গরু-ভেড়ারা, এদিকে আয়। আমাকে রক্ষা কর্ সবাই।…বাঁচাও…। বাঁচাও…।'

তারপর জবুথবু হয়ে বসে নিজের ফারকোটের মধ্যে সেধিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো কান্না জুড়ে দিলেন। কিন্তু অন্ধকার এর কোন জবাব ফিরিয়ে দিল না।

অনুবাদ ॥ পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়

বি. ট্রাভেন

চেলসোর বিয়ে

চামুলারা মেক্সিকোর আদিবাসীদের ৎসোৎসিল[১] গোষ্ঠীর একটি প্রশাখা। চামুলাদের চেলসো ফ্লোরেস তার দেশগাঁ ইশ্‌তাকোলকৎ-এ মনের মতো একটি মেয়ের খোঁজ পেয়েছিল। তা মেয়েটাকে সোজাসুজি ভাগিয়ে নিয়ে গেলেই হতো। কিন্তু মেয়ের বাপের মানসম্মানের কথা ভেবে চেলসো সেটা করে নি। বাপও তার জাতের অনেক দিনের আচার-বিচারের কথা মনে রেখে মেয়েটাকে অমনি অমনি বিলিয়ে দিতে অরাজি। তার জাতের লোকজনের চোখে অমন বিয়ে বিয়েই নয়—এমন কি দেওয়ানি আদালতের জজ, যাদের এমনিতেই কেউ মানে না তাদের একজন এসে দিয়ে গেলেও নয়। সত্যি বলতে কি, আদালতের বিয়ে ওদিকে কখনো ঘটেই নি।

মেয়েটা ছিল দেখতে ভাল। গায়ে-গতরে জোয়ান আর শক্ত সমর্থ। তার বাপ ধরেই নিয়েছিল বিয়ে হলে মরদের হয়ে সে নিদেনপক্ষে পনেরটা কাচ্চাবাচ্চা বিয়োতে পারবে। কাজে কাজেই এ তো জানা কথা যে এমন মেয়ের বিয়ে দিতে সে ভালরকম দর হেঁকে বসবে।

চেলসো বলেছিল মেয়ের পণ বাবদে তার বাপের হয়ে সে তিনবছর খেটে দেবে। কিন্তু বুড়োর চাহিদা হল এমনসব জিনিসের, যা ধরাছোঁয়া যায়। সে চেয়ে বসল ছ'টা বড়সড় সুস্থ ভেড়া, পনেরো গজ সাদা সুতির কাপড়, দুই কুইণ্টল বাছাইকরা ভুট্টাদানা, বারো আঁটি কাঁচা তামাক, আর দু'গ্যালন দিশি মদ।

ইশ্‌তাকোলকৎ-এ বসে এসব যোগাড় করা অসম্ভব, কারণ মজুর-খাটার ব্যাপারটাই সেখানে অজানা। কাজেই তার গাঁ থেকে নাকবরাবর দেড়শ মাইল দূরে সোকোনুসকোর আশেপাশে কোনো কফিবাগিচায় ফুরনে খাটতে যাওয়া ছাড়া চেলসোর আর কোনো উপায় রইল না।

দু'বছর ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাতরাতে কাতরাতে আর জমাতে জমাতে চেলসোর হাতে এল অনেক কষ্টের আর পরিশ্রমের বেশ কিছু রুপোর

'পেসো'[২]। চোখে দেখতে খাঁটি, সত্যি রুপোর এই পেসোগুলোকে পড়ে-পাওয়া পয়সা কেউ বলতে পারবে না।

মেহগনির জঙ্গলে খাটতে যাওয়ার কথা বাদ দিলে কফিবাগিচার কাজের চাইতে বেয়াড়া কাজ আর কিছুই নেই। সূর্য ওঠা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত খাটুনি, ছুটির দিন বলে কিছু নেই, এমনকি ফাঁকা রোববারও নেই বললেই চলে। ফসল পাকলে ঝুড়ি হিসেবে মজুরি, আর ভাই হে, একশ ঝুড়িতে পৌঁছতে হলে সত্যি সত্যি পাছা নাড়িয়ে কাজ করতে হবে তোমাকে। পাছা নাড়ানো আর কাকে বলে! খবরদারির ভার যার ওপর, সেই 'কাপাতাজ' অথবা 'কাবোর'[৩] যদি তোমার ঝুড়িতে বেশি কাঁচা শুঁটি খুঁজে পাবার মর্জি হয়, তাহলে আর সেই ঝুড়িতে চকের মার্কা পড়বে না। তোমার পাওনা হিসাব না করেই সে ভর্তি ঝুড়ি ঢেলে দেবে গাদার ওপর, তার মানে ঐ পুরো ঝুড়িটাই তোমার বেগার খাটা হল। তা বলে বাগিচার মালিক বা ম্যানেজার যে ঐ শুঁটিগুলো সব ফেলে দেবে, তা মোটেই নয়। কেনই বা দেবে? তাকে তার ব্যবসাটা দেখতে হবে তো! পাঁচবছরের নিচে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের লাগানো হবে কাঁচা শুঁটিগুলো বেছে ফেলার কাজে।

যা হোক, চেলসোর জীবনের দুটো বছর তো কেটে গেল, আর বাড়ি ফেরার পথে সে দেখল বিয়ের জন্য যত পয়সা দরকার তা সে কামিয়ে নিয়েছে।

এখন, চেলসোর নিজের যে-দেশ, সেই দেশে বাড়ি ফেরার সব চাইতে সোজা পথটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক পথ।

নিকুইভিল আর সালভাদরের রাস্তা ধরে যেতে তাকে অনেকগুলো গ্রাম পার হতে হল। প্রতিটি গ্রাম পার হবার সময় তার জন্য সেখানকার আল্‌কালদে অর্থাৎ মোড়লের হাতে দশ সেন্তাভো করে মাশুল গুণতে হয় তাকে। যেখানেই সাঁকো পার হতে হবে, সেখানেই কর্তাব্যক্তি বলে পরিচিত কেউ না কেউ এসে সাঁকো পার হবার ভাড়ার নাম করে কুড়ি সেন্তাভো তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়। কাজে কাজেই, সারাক্ষণই সে এমন রাস্তা খুঁজতে খুঁজতে যাচ্ছিল, যাতে গ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে না হয়।

রাস্তায় যেখানেই সে থামছিল, বেআইনী মদের লোভ দেখানো হচ্ছিল তাকে। এই জিনিসটি নিয়মমাফিক বিক্রি মদের চাইতে বেশি দামী আর নিষিদ্ধ বলেই সব চাইতে নিকৃষ্ট ধরনের। সব জায়গাতেই কেউ না কেউ ছেলেটাকে নেশা করানোর চেষ্টায় ছিল, যাতে মাতলামোর দায়ে তাকে হাজতে পুরে দেওয়া যায়।

তার মানে, পরদিন সকালে উঠে আবার যখন সে রাস্তায় নামবে তখন তার কাছে আর একটি সেন্তাভোও থাকবে না। কারণ দারোগা তোমাকে তো আর মাগনায় হাজতে থাকতে দিতে পারে না। আর তারপর সে তোমার পয়সা নিয়ে নিয়েছে বলে যদি নালিশ করো, তাহলে কর্তাদের একজনকে অপমান করার দায়ে তোমাকে তিনটি মাস গ্রামে বা রাস্তায় বেগার খাটার কাজে লাগিয়ে দেওয়া হবে।

চেলসো অবশ্য কফিবাগিচায় থাকতেই তার সঙ্গী মজুরদের কাছ থেকে এসব জেনে গিয়েছিল। নিছক বন্ধুত্বের খাতিরে কেউ মদ খাওয়াতে চাইলেও সে একটি ফোঁটা ছোঁয় নি। এই পুরনো কথাটা কে না জানে যে একবার স্বাদ পেয়ে গেলে আর মদ খাওয়া থামানো যায় না।

রাস্তায় যা কিছু চেলসোর লেগেছে, ন্যায্য দামের তিন-চার গুণে তার কাছে বিক্রি করা হয়েছে। কারণ, সে যে কফিবাগিচার এক ঘরমুখো মজুর—এক মালদার ছোকরা যার গাঁটভর্তি কাঁচা টাকা।

কিন্তু এদিক থেকেও দেখা গেল চেলসো গেঁতো এবং চালাক। সে পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক পরে চলছিল আর সে যে কফিবাগিচা ফেরত এ-কথাটা জন-প্রাণীকেও জানায় নি। দোকানদারদের কৌতূহল আর স্থানীয় কর্তাদের জিজ্ঞাসা-বাদের উত্তরে সে শুধু বলেছিল জোভেলের-বাসিন্দা তার মালিকের হয়ে সে হুইক্স্টলা গিয়েছিল চারটে খচ্চর নিয়ে।

জোভেল হল শেষ সহর যা তার গাঁয়ে যাবার রাস্তায় পড়ে, সেখান থেকে আর মোটে বার মাইল পথ।

জোভেলে পৌঁছে চেলসোর মনে হল এতদিনে সে সত্যি দেশে পা দিল। ভুট্টাদানা, পশম, ফল, লাকড়ি, কাঁচা চামড়া কিংবা শুকনো লংকা বিক্রি বা বিনিময় করার জন্য সপ্তাহে একবার বা নিদেনপক্ষে মাসে দুবার বাপ-মার সঙ্গে জোভেলে আসা তার বাঁধা ছিল। পৌরভবনের উঠোনে একটা পাটিতে তার সওদা বিছিয়ে যে-আদিবাসী মেয়েটি বসেছিল তার কাছ থেকে পাঁচ সেন্তাভো দিয়ে কলা কিনল সে। তারপর রাস্তা পার হয়ে চত্বরের ফাঁকা মাটিতেই উবু হয়ে বসল, যদিও বাজারের চারপাশে অনেকগুলো বেঞ্চিই ছড়ানো ছিল।

বেঞ্চিগুলো আসলে কেবলমাত্র সহরের 'লাদিনো'[৪] অর্থাৎ ভদ্দরলোকদের জন্যে। 'ভদ্দর' মানে অবশ্য এই নয় যে তারা সবাই রোজ সকালে উঠে হাত মুখ ধোয়া আর দাড়ি কামানোকে নিত্যকর্ম বলে ধরে। এসব খুচরো ব্যাপার বরাবরের জন্য তুলে রেখেও কেউ কখনো 'ভদ্দর' হবার অধিকার হারায় নি।

চেলসোর মতো নেহাতই একটা উটকো আদিবাসীর যদিবা কোনো একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে পড়ার আস্পর্ধা হ'তো, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে তাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিত। কিন্তু বাজারের পাথর-বাঁধানো, সমান চত্বর থেকে উটকো কুকুরটাকেও পুলিশ তাড়ানো দরকার মনে করে না। কাজেই কোনো আদিবাসী যদি একটু জিরোতে চায়, তাহলে বাঁধানো রাস্তার ধারে তাদের উবু হয়ে বসতে কোনো বাধা নেই।

বেঞ্চিগুলোর একটাতে দু'জন লাদিনো বসেছিল। তাদের 'কাবালিয়েরো'[৫] বলে ডাকতে হয়। সেখানে বসে বসে তারা সিগারেট ফুঁকছিল আর সরকারকে গালমন্দ করছিল।

ওদের একজন মন্তব্য করল, 'এই সহরটা এমন মানুষে ভর্তি, যাদের পিঠ ঢাকবার একটা শার্টও থাকা উচিত নয়, অথচ তাদের হাবভাব দেখলে মনে হয় আস্ত সহরটাই যেন তাদের। আর ঐ যে চামুলা ছোঁড়াটা উবু হয়ে গবগবিয়ে কলা খাচ্ছে, ও হল আরেক কিসিমের চিড়িয়া। ওকে দেখলে মনে হবে, একটা সেন্তাভো দিলেই বুঝি খেয়ে বাঁচে। অথচ কে বলবে ওর কোমরের কাপড়ে জড়ানো রয়েছে প্রায় আশিটা রুপোর পেসো।'

অন্যজন শুধোল, 'তা ওর হাঁড়ির খবর তোমাকে কে দিল?'

'আরে ও যে আমারই জোত থেকে আসছে, আমারই কফিবাগিচায় তো এ দু'বছর কাজ করল। ওর নাম চেলসো, ইশ্‌তাকোলকৎ গাঁয়ের ফ্রান্সিসকো ফ্লোরেসের ছেলে।'

'সত্যি নাকি? তাই বলো!'

'আবার কি! যা হোক, ঐ কেঁচোটাকে নিয়ে তো আর আমার মাথাব্যথা নেই। আমি জানতে চাই আরিয়াগা যাবার মোটর-রাস্তাটা করতে গিয়ে ঐ কাপ্তু গভর্নরটা কত হাজার হাজার পেসো নিজের পকেটে পুরছে আর ঐ রাস্তাটা নিরাপদে গাড়ি নিয়ে যাবার মতো হওয়ার আগে আরো কত হাজার ও কামিয়ে নেবে। কিন্তু কথা হল...'

অন্য ভদ্দরলোকটির কিন্তু সেই হাজার হাজার পেসোতে কোনো উৎসাহ ছিল না, যদিও গভর্নর সেগুলো কামাচ্ছে এমন একটা রাস্তার জন্য যেটা কখনোই তৈরি হবে না, আর যদি বা হয় এমন খারাপভাবে তৈরি হবে যে প্রতি বর্ষার পরে সেটা আবার পুরো মেরামত করতে হবে, যাতে সে 'কো-অপারেটিভো' নামে বিশেষ মাশুল বসিয়ে আবার হাজার হাজার পেসো আয় করার সুযোগ পায়। গভর্নরের

পদে বসলে এই ভদ্দরলোকটিও ঠিক একই কাজ করত। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু সে গভর্নর নয়, তাকেও তো পয়সা কামানোর অন্য কোনো ফিকির করতে হবে। সরকারের যখন বাপান্ত করা হচ্ছিল, সে আর তাতে কান দিল না। তার বদলে চত্বরের অন্যদিক থেকে চিৎকার ক'রে চেলসোকে ডাকল, 'এই চামুলা, এদিকে আয়!'

চেলসো ঘাড় ফিরিয়ে যখন দেখল এক ভদ্দরলোক তাকে ডাকছে, তখন লাফিয়ে উঠে সেদিকে দৌড়ল। সবে সে নিশ্চিন্তমনে খেতে শুরু করেছিল, কলাগুলো চত্বরের ধারেই পড়ে রইল।

বাবুটির সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানোর জন্য মাথা থেকে তালপাতার টুপিটা খুলে নিয়ে সে বলল, 'কী হুকুম করছেন, হুজুর?'

ভদ্দরলোক তাকে শুধোল, 'আমাকে চিনিস তো?'

'চিনি বইকি হুজুর! আপনি তো ডন সিক্সটো।'

'ঠিক। তোর বাবার কাছে আমি সেদিন দুটো জোয়ান ষাঁড় বিক্রি করেছি। তার পুরো দাম এখনো সে দেয় নি। আর কর্নেলিও সাঞ্চেজকেও তুই জানিস — তাকে সাক্ষী রেখে তোর বাবা দিব্যি গেলেছে যে কফিবাগিচা থেকে টাকা নিয়ে তুই যেদিন ফিরবি সেদিনই আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবে। পাওনা আছে ঠিক ছিয়াত্তর পেসো পঞ্চাশ সেন্তাভো। তোর বাবাকে আবার সহরে দৌড় করাবি কেন, টাকাটা তুই মিটিয়ে দিয়ে যা।' এই বলে ডন সিক্সটো তার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল, 'পাওনার ব্যাপারটা আমি ঠিক ঠিক বলেছি তো, ডন এমিলিয়ানো?'

'একেবারে ঠিক, তাছাড়া সাক্ষীও আছে', বলল ডন এমিলিয়ানো।

এক মুহূর্তের জন্য চেলসোর মনে হল পাওনার কথাটা সত্যি কিনা আর কোনো সাক্ষী সেখানে ছিল কিনা সেটা ডন এমিলিয়ানোর জানার কথা নয়, কেন না কফিবাগিচা ছাড়ার অল্পদিন আগেও এমিলিয়ানোকে সে সেখানে তার নিজের জমিতে দেখে এসেছে। কিন্তু একই সময়ে এটাও তার মাথায় খেলে গেল যে ভদ্দরলোকদের কথার কাছে একটা আদিবাসীর কথার কোনো দামই নেই। হুজুরেরা যদি বলেন যে পৃথিবীটা সূর্যের চারদিকে পাক খাচ্ছে, আদিবাসীকে তাহলে তাই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে, যদিও সে পষ্ট চোখে দেখছে যে সূর্যটাই পৃথিবীকে ঘিরে পাক খায়। এমনি যে কোনো ব্যাপারে একজন ভদ্দলোকের কথাটাই যে কোনাকিছুর প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। আর এখানে তো দু'জন ভদ্রলোক মিলে এমন একটা কথায় পরস্পরকে সায় দিয়ে যাচ্ছে, যে-বিষয়ে দু'বছর বাড়ি না-থাকার ফলে চেলসোর কিছু জানাই সম্ভব নয়।

যাহোক সন্থ সন্থ যা শুনল তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার অবকাশ আর তাকে দেওয়া হল না।

ডন সিক্সটো তাড়া দিয়ে উঠে ঠাণ্ডা আর নির্দয় গলায় বলল, 'ভালয় ভালয় টাকাটা ফেলে দে, ছোঁড়া! তা নইলে এক্ষুণি পুলিশ ডাকছি, তারপর সাক্ষীসাবুদের সামনে পাওনা মেরে দেওয়ার মজাটা কাকে বলে হাজতে বসে ভাল ক'রে টের পাবি!'

অনেক আত্মীয়স্বজনের বেলাতেই চেলসো দেখেছে, একজন আদিবাসীর পক্ষে হাজতে থাকাটা কিরকম খরচের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। টাকা তার যাবেই তাতে ভুল নেই, কারণ লুকিয়ে তো আর রাখতে পারবে না। মাঝখান থেকে হয়তো—ওই যে কী বলে—দেনা গোপন করার দায়ে বড় রাস্তায় তিনমাস বেগার খাটার জন্য চালান ক'রে দেবে। জজ বা দারোগা হলে সঠিক বয়ানটা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারত, আর একজন আদিবাসী কিছু করুক চাই না-করুক কোনো-না-কোনোভাবে তার অন্যায় হয়েছেই, এমনকি গুরুতর বেআইনী কাজ তো সে ক'রে ফেলে থাকতে পারে।

চেলসো তার লাল পশমের কোমরবন্ধ খুলে ফেলল। তার গুটিয়ে-রাখা সাদা সুতির প্যাণ্ট খসে পড়ে যাওয়াতে ডন সিক্সটোর সামনে সে দাঁড়িয়ে রইল একেবারে উদোম ন্যাংটো। কিন্তু তখন সেদিকে তার কোনো খেয়াল ছিল না, কারণ একটা দুঃখ আর তেতোভাব তার মুখ, নাড়িভুঁড়ি, আর তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছাপিয়ে উঠছিল। সে সন্তর্পণে, ধীরেসুস্থে তার কোমরবন্ধের ভাঁজ খুলতে লাগল, যেন এই দেরিটা করলে তার কষ্টে-জমানো টাকাটা সে বাঁচাতে পারবে, যে-টাকার গায়ে লেগে আছে তার বিয়ে আর পনেরোটা কাচ্চাবাচ্চার বাপ হবার স্বপ্ন। অবশ্যই ডন সিক্সটোর চোখ এড়িয়ে একটা সেন্তাভোও লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা তার ছিল না।

খুব ধীরে আস্তে করেও শেষপর্যন্ত কোমরবন্ধের ভাঁজ সবটাই খোলা হয়ে গেল। হাঁটুর ওপর হাতদুটোর ভর রেখে সে উবু হয়ে বসল, যাতে টাকাগুলো মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে। তারপর কোমরবন্ধ থেকে পেসোগুলো নিয়ে একটি একটি ক'রে ডন সিক্সটোর হাতে তুলে দিতে লাগল। প্রত্যেকটি দেবার সময় তার মনে পড়ছিল সেটার জন্য কীভাবে তাকে গায়ের রক্ত জল করতে হয়েছে।

চেলসো গুনছিল না, কিন্তু ডন সিক্সটোর হাতে প্রতিটি পেসো আসার সঙ্গে সঙ্গে সে জোরে জোরে হিসাব করছিল।

যেই তার হাতে দশটা ক'রে পেসো জমছিল, অমনি ডন সিক্সটো সেগুলোকে

নিজের প্যাণ্টের পকেটে চালান ক'রে দিচ্ছিল। প্রথমে ডান পকেটে, তারপর বাঁ পকেটে, তারপর ডানদিকের পেছনের পকেট, তারপর বাঁদিকের পেছনের পকেট, তারপর আবার ডানদিকের সামনের পকেট।

ডন এমিলিয়ানো নিজের মনে গুনতে গুনতে নজর রাখছিল। টাকা গোনার আগ্রহে গভর্নরের জোচ্চুরি, ঘুষের ব্যবসা আর না-বানানো মোটররাস্তা নিয়ে রাগ দেখাতেও যেন সে ভুলে গেছে।

অবশেষে ডন সিক্সটোর পকেটে এল সত্তরটি পেসো। সে আবার হাত পাতল চেলসোর কাছে আর আরো সাতটা আদায় ক'রে নিয়ে বলল, 'হয়েছে ছোকরা! এবার তাহলে চার "রেয়ালে" ফেরৎ দেব তোকে। আমি সৎপথে চলায় বিশ্বাস করি। একটা গরীব আদিবাসীর কাছ থেকে পাওনাগণ্ডার বেশি এক পয়সাও আমি নিতে চাই না। একটা রসিদও তোকে লিখে দিচ্ছি। নাহলে তুই হয়তো ভাববি আমি তোর কাছ থেকে দু'বার ক'রে পয়সা নেবার ফিকির করছি। সৎ আর ভদ্রভাবে চলাই হল আমাদের ধর্মের প্রথম কথা।'

চেলসো এবার উঠে দাঁড়ালো। ঠিক এই সময়ে এক পুলিশ এসে উদয় হল সেখানে, আর চেলসোকে মনে করিয়ে দিল যে সে যদি প্যাণ্টটাকে তুলে ঠিকমতো বেঁধে না পরে তাহলে খোলা জায়গায় অশালীন আচরণের দায়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে। এইবারে চেলসো যেন ঝাঁকুনি খেয়ে বাস্তবে ফিরে এল, এতক্ষণ সে হাত-পা নাড়ছিল একটা ঘোরের মধ্যে।

হাতে পয়সা পেয়ে ডন সিক্সটোর মেজাজটা এখন বেশ শরিফ। সে পুলিশকে সমঝে দিল যে সব ঠিকই আছে, আদিবাসী ছোঁড়াটাকে নিয়ে কোনো ঝামেলা করার দরকার নেই। ততক্ষণে অবশ্য চেলসো পুলিশের হুকুম তামিল ক'রে ফেলেছে।

মুখভর্তি হাসি নিয়ে ডন সিক্সটো তার কোটের পকেট থেকে ভাঁজকরা একটা ছেঁড়া নোটবই টেনে বের ক'রে যত্ন ক'রে একটা পাতা ছিঁড়ল। তারপর এই মর্মে কয়েক লাইন লিখে দিল যে ফ্রান্সিসকো ফ্লোরেসের কাছে দুটো ষাঁড়ের বাকি দাম বাবদ যে ছিয়াত্তর পেসো পঞ্চাশ সেন্তাভো সে পেত, তার পুরোটাই তাকে চুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বেশ বড় বড় হাতের লেখায় সে নিজের নামটাও সই ক'রে দিল, যাতে কোনো জোচ্চোর জাল করতে না পারে।

তারপর কাগজের টুকরোটা একটা পেনের সঙ্গে সে বাড়িয়ে দিল বন্ধুর দিকে। তারপর বলল, 'ডন এমিলিয়ানো, তুমি ভাই দয়া ক'রে সাক্ষী থাকো না!'

'নিশ্চয়ই! এর আর কথা কী?'

ডন এমিলিয়ানো ডন সিপ্রটোর চাইতেও সুন্দর ক'রে তার নামটা সই ক'রে দিল।

ডন সিপ্রটো চেলসোকে বলল, 'আমার সঙ্গে আয়, মাশুলের ব্যাপারটা আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। তাহলেই আইনমাফিক রসিদটা নিয়ে তোর বাপকে দিতে পারবি।'

রাষ্ট্রীয় ট্রেজারির স্থানীয় শাখার একজন কেরানিকে দিয়ে কাগজটাতে স্ট্যাম্প লাগিয়ে যতক্ষণ সে মাশুল বাতিল করাচ্ছিল, চেলসোকে ততটা সময় সে বসিয়ে রাখল বাইরে। তারপর তাকে সঙ্গে ক'রে বাজারের চত্বরে ফিরে এল। ডন এমিলিয়ানো তখনো বেঞ্চিতে বসে বসে সিগারেট ফুঁকছে আর যে-সরকারের ভাগীদার সে দুর্ভাগ্যবশত হতে পারে নি তার খুঁতগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা করছে। ডন সিপ্রটো তার পাশে বসে কাগজটা চেলসোকে দিল।

সে বলল, 'রসিদটা পেয়ে গেলি তো? ডন এমিলিয়ানো সাক্ষী রইল যে ষাঁড়ের দামটা তুই আমাকে মিটিয়ে দিয়েছিস। ঐ স্ট্যাম্পটা দেওয়াতে কাগজটা আইনের চোখে সিদ্ধও হয়ে গেল। ষাঁড়গুলো কী জাতের তাও ওখানে লেখা আছে। ভাবিস না তোর টাকাটা আমি মেরে দিলাম। একটা আদিবাসীর সঙ্গে এত ভালমানুষি অনেকেই করত না। আমার মত স্ট্যাম্পটা কেউ তোকে মাগ্‌না দিত না, দয়ার শরীর না হলে যে-কেউ ঐ স্ট্যাম্পের দামটাও তোর কাছ থেকে আদায় করত। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেনরে ছোঁড়া! দৌড় লাগা এবারে। তোর বাপকে রসিদটা দিয়ে বলিস সব শোধবোধ হয়ে গেছে। বাড়ি যাবার পথে শেষ দোকানটা থেকে আবার মদ কিনে খেতে বসে যাস না! আর হ্যাঁ, তোর বাপকে বলিস, যদি গরু, খচ্চর বা দেশের সবচেয়ে ভাল শস্যবীজ কিনতে চায়, এ-তল্লাটের মধ্যে সব চাইতে সস্তা দরে আমার কাছে পাবে।'

পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে চেলসোর দিকে মাথা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিল, 'এবার কেটে পড়। অনেক জরুরি কাজ বাকি রয়েছে।'

চেলসো যাবার জন্য পেছন ফিরল। রাস্তার ধারে কলার কাঁদিটা যেখানে ফেলে দিয়েছিল সেখান থেকে সেটাকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখে ঠিক তক্ষুনি একটা কুত্তা কলাগুলোর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পেছনের পা-টা তুলেছে। ওগুলো যে খাবার জিনিস সেটা তার জানার কথাও নয়। টাবাসকোর[৬] কুত্তা হলে অবশ্য অনেক আগেই দেখে শুনে তার শেখা হয়ে যেত যে এমনকি কুত্তার পক্ষেও কলা খুব ভাল খাদ্য, বিশেষ ক'রে আর কিছুই যখন পাওয়া যাচ্ছে না!

চেলসো বরবাদ হয়ে-যাওয়া কলাগুলোর দিকে একবার তাকালো, তারপর পায়ের ডগা দিয়ে সেগুলোকে ঠেলে দিল ড্রেনের মধ্যে।

অনুবাদ ॥ মালিনী ভট্টাচার্য

[গল্পটি মূলে বি. ট্রাভেন লিখিত ইংরাজি উপন্যাস March to Caobaland-এর প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবাদ। মেক্সিকোর দরিদ্র আদিবাসীদের ছেলে চেলসো দুই ঠগের পাল্লায় পড়ে কষ্টের রোজগার করা তার বিয়ের পণের টাকা হারিয়েও হাল ছাড়ল না। আবার পয়সা কামানোর জন্য মেহগ্নির জঙ্গলে কাঠ কাটার কাজের খোঁজে চলল সে। এমনি হাড়ভাঙা কাজ সেটা যে মজুরদের বেশির ভাগই সেখান থেকে আর দেশে ফিরে আসতে পারে না। চেলসো এক দীর্ঘযাত্রায় শোষণ ও অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী সত্তার অধিকারী হয়ে ওঠে। উপন্যাসটির মূল গল্পাংশ এইটুকুই। লেখক সমাজের ছকটিকে তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। মেক্সিকোর মানুষ কীভাবে বাঁচে তার খুঁটিনাটিও তাঁর নখদর্পণে, অথচ খুঁটিনাটির আড়ালে সামগ্রিক বিশ্লেষণাত্মক ছবিটি কখনো হারিয়ে যায় না।]

১. মেক্সিকোর আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অনেক আঞ্চলিক ভাষার চলন আছে। 'Tsotsil' বা 'Tjotjil' এরকম একটি ছোট ভাষাভিত্তিক গোষ্ঠী, তারা মেক্সিকোর Chiapas প্রদেশের বাসিন্দা। আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অনেক আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে স্পেনীয় ভাষাও প্রচলিত।

মেক্সিকোর আদিবাসীদের মধ্যে স্পেনের শ্বেতাঙ্গদের রক্ত ও পরে ক্রীতদাস হয়ে-আসা নিগ্রোদের রক্তের মিশ্রণ এত বেশি যে তাদের জাতিবিচার করা হয় বর্ণগত বা দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নয়, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে। অল্পস্বল্প সাংস্কৃতিক মিশ্রণও অবশ্য স্বভাবতই হয়েছে, যেমন পরিধেয়র ও নামের ব্যাপারে। কিন্তু সেটা বাদ দিলে 'আদিবাসী' বা 'ইণ্ডিয়ান' বলা হবে তাদেরই যারা ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার দিক থেকে আদিবাসী রয়ে গেছে। এই গোষ্ঠীগুলির জীবন গ্রামভিত্তিক ; আর সহরে বা আধাসহরে 'Ladino'-দের তাঁবেদারিতে তারা থাকে। লাদিনো হল তারাই যাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের রক্ত

বেশি পরিমাণে আছে। তাদের ভাষা স্পেনীয়, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তারা শ্বেতাঙ্গদের মুখাপেক্ষী। অঞ্চলবিশেষে আদিবাসী ও লাদিনোদের সম্পর্কের কিছু কিছু হেরফের হয়। Chiapas-এ তাদের সম্পর্কটা উঁচু জাত ও নিচু জাতের সম্পর্কের মতো। অন্যত্র আবার জাতিভেদের তুলনায় শ্রেণীভেদের ব্যাপারটাই স্পষ্ট।

২. মেক্সিকোতে প্রচলিত মুদ্রা। একশ সেন্তাভো = এক পেসো।

৩. কাবো (Cabo) : প্রধান সর্দার, শীর্ষস্থানীয়।

৪. লাদিনো (Ladino) : প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য।

৫. কাবালিয়েরো (Caballero) : সম্মানসূচক অভিধা, খানদানি বংশের লোককে বোঝাতে ব্যবহার হয়।

৬. মেক্সিকোর একটি প্রদেশ। ক্রান্তীয় জলবায়ু। অতিবৃষ্টি, জঙ্গল ও জলাভূমির দেশ। অন্যান্য ফলের মধ্যে কলা একটি প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এই প্রদেশের নামেই এক জাতের কলার নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

এ ড কে ল মে ফা হে লি

স্যুটকেস

সাম্প্রতিক দিনগুলিতে সে একটা মরিয়া সুযোগ নিতে চলেছে, টিমি ভাবল। সুযোগটা আপনা-আপনি এসে পড়লে সে তা নষ্ট করবে না। বস্তুত সে কি এই বিষয়ে দৈব হাতছানি দেখছে না?

দগ্ধ বিকেলে সে পেভমেণ্টের ওপর বসে। ঠিক নববর্ষের আগের দিন। এই অস্বস্তিকর গরমে টিমি এক ঘণ্টারও বেশি এইভাবে বসে। একটা পোকা তার নাসারন্ধ্রে ঢুকে পড়ার জন্যে বেশ কয়েকবার হাঁচি দিতে হল। চোখে জল এসে পড়ায় রাস্তার যানবাহন যেন সামনে নাচতে শুরু করেছে মনে হল।

পোকাটার সঙ্গে তার নাটকীয় বিরামের অবসানে পরিস্থিতির ভয়ংকর বাস্তবতা আবার তাকে হিমেল ও যন্ত্রণাদায়ক বেদনায় টেনে আনল। আজকের দিনটা বুনো হাঁসের পিছনে ধাওয়া করার মতো কাটল। চাকরির প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে তিন জায়গায় ঢুঁ মেরেছিল। সব জায়গায় ব্যর্থ হয়েছে। একটা অফিস জানালো, তারা ইতিমধ্যেই একজন ছোকরা পেয়ে গেছে। দ্বিতীয় জায়গায় বাচ্চা টাইপিস্ট জানালো যে সে যথেষ্ট বয়স্ক। মালিক বছর আঠারোর মতো ছোট্ট কিশোর এক-জনকে চায়। বক্তব্য শেষ ক'রে মহিলা সিগারেটের ধোঁয়ায় তার সাদা মুখটাকে আচ্ছাদিত ক'রে পুনরায় টাইপে ডুবে গেল।

তৃতীয় জায়গায় খর্বকায় গোবরগণেশ-মার্কা শ্বেতাঙ্গটি তার দাম ধার্য করল, 'সপ্তাহে দু পাউণ্ড দশ।' টিমি বলবার চেষ্টা করেছিল, 'তিন পাউণ্ড দশ।' তার উত্তরে মালিকের চূড়ান্ত উত্তর হল, 'ওতে রাজি হও, না হয় পথ দেখো।' বিষয়টা ওখানেই ইতি ক'রে সে নাক ডাকাতে লাগল। গোবরগণেশ মোটা মানুষটির সাদা চিবুক এবং ক্ষুদে মিটমিটে চোখের দৃষ্টি স্মরণ ক'রে টিমি কৌতুক অনুভব করল।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল বোলতাটির দিকে, যা একটা পোকাকে নির্যাতন করছে। বোলতাটি চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে জড়সড় অসহায় পোকাটার ওপর নেমে এসেছে। মনে হল ডানা খাড়া ক'রে পোকাটার শরীরে হুল বিঁধিয়ে দিল। পোকাটা

প্রাণপণে শরীরটা মোচড়াতে লাগল, মাটি থেকে উড়ে পালাবার চেষ্টা করল। তারপর হঠাৎই শরীরটা ছড়িয়ে পড়ল, তারপর স্থানু। ডানাওলা পতঙ্গও তার শিকারকে কবজা করেছে। বেচারা পোকাটার জন্যে টিমির মনে সহানুভূতির উদ্রেক হল। তার মনে হল, এ একটা অসম লড়াই, অন্যায় যুদ্ধ। এ-জিনিসই কি চিরকাল ঘটে যাবে? সুসজ্জিত, গতিশীল প্রাণী অসহায়কে এইভাবেই মরণকামড় দেবে? এবার বোলতাটি পোকাটিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, অবশ্যই তার বাসার দিকে।

টিমির মনে হল তার এমনকিছু নেই যে বাড়িতে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাটাও তাকে প্রবোধ দিল যে তার বউ তাকে বোঝে। ধীরস্থির বুদ্ধিমতী স্ত্রী। প্রতিদিনের মতো সে বলবে, 'সকালে সূর্য উঠবে, টিমি। সূর্য সকলের জন্যেই ওঠে। সুদিন আসবে।' কিংবা বলবে, 'আমি আগুন জ্বালিয়ে রাখি। সাধুরা বলেছেন, যেখানে রান্নার কোনো পাত্র নেই, সেখানেও আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে।'

এখন সে অসুস্থ। বাচ্চা হবে; তৃতীয় সন্তান। দু'মাস যাবত বাড়িতে কিছু নিয়ে যেতে পারে নি। জমা টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু করতে হবে। অবশ্য এমনকিছু করতে চায় না যাতে শ্রীঘরে যেতে হয়। সেসব নয়। বউ-ছেলেদের অনশনের মধ্যে রেখে জেলে যাওয়া উচিত হবে না। সে জোরের সঙ্গেই মনে মনে ঠিক করল সেটা।

একজন শ্বেতাঙ্গ টলতে টলতে পার হয়ে গেল। নিশ্চিতই মাতাল। টিমিকে ছাড়িয়ে সে থামল, ফিরে তাকালো। তারপর টিমির দিকে এগিয়ে এল। ব্র্যাণ্ডির বোতলটা তার দিকে তুলে ধরে কোনোমতেই খাড়া হয়ে থাকতে পারছিল না।

'ওহে জন, নাও, পান কর। শুভ নববর্ষ!'

টিমি মাথা নাড়ল।

'এসো হে, ফুর্তি করা যাক। পুলিশ কাছেপিঠে নেই যে তোমাকে ধরবে।' লোকটি হেঁচকি তুলে বলে চলল। টিমি আবার মাথা নাড়ল। লোকটিকে ঠেলে সরিয়ে দিল।

'এটা একটা বেজন্মা, শুভ নববর্ষের আনন্দ চায় না। গোল্লায় যা।' শ্বেতাঙ্গটি ঘুরে দাঁড়িয়ে বোতলটা ঘোরাতে ঘোরাতে চলে গেল।

টিমি তিক্ত হয়ে ভাবল, এটা যদি টাকা হতো!

এখন বাড়ি ফেরার সময়। সে সোফিয়া টাউনের বাস ধরল। বাসের মধ্যে হুল্লোড়। নববর্ষের মানসিকতা, বেপরোয়া প্রাচুর্য। সুখী, শুভ নববর্ষ! থেকে থেকে

একজন চিৎকার করছে। তার উল্টো সারিতে একজন গীটার বাজাচ্ছে। একটি সুন্দরী তরুণী বাজনার তালে নাচছে। গীটারবাদক নিজের বাজনার তালে মাতাল হয়ে উঠেছে। সে যন্ত্রটাকে আদর করছে, চাপড়াচ্ছে। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো তারের গায়ে যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। সে সামনের তন্বীটিকে লক্ষ করল। নিচের ঠোঁট ঝোলানো, শরীর দোলাচ্ছে—একবার এদিক, একবার ওদিক, প্রলুব্ধ করবার চেষ্টায়। যেন পুষ্ট চারা গাছ হাওয়ায় দুলছে। হাল্কা হাতকাটা জামায় আগ্রাসী ওর স্তনযুগল। ঠিক সেসময় গীটারবাদক গীটারের কাছে কান নিয়ে এল, যেন জাদু সংগীতের রেশটা ভাল ক'রে শুনতে পারে, কিংবা নিগূঢ় আনন্দ চুপিসাড়ে যন্ত্রকে জানাবার জন্যে।

দু'জন মহিলা টিমির পাশে বসবার জন্যে এগিয়ে এল। একজন ফ্যাকাসে ও রুগ্ন। অপরজন তার ও টিমির পায়ের দিকে একটা স্যুটকেস রাখল। এই দু'জন মহিলা বাজনার থেকে তার মনোযোগ সরিয়ে দিল। তাদের মধ্যে যেন অনেক অকথিত কিছু রয়েছে।

পরের স্টপেজে তারা নামবার জন্যে উঠে পড়ল। টিমির দৃষ্টি ওই স্যুটকেসের ওপর। তারা দরজার দিকে এগোচ্ছে। বাস আবার চলতেই টিমির পিছনের লোকটি বলে উঠল, 'ওই মহিলারা তাঁদের স্যুটকেস ফেলে গেছেন।'

টিমি তাড়াতাড়ি বাধা দিল, 'না, এটা আমার।'

'না। এটা নিয়ে ওদের আমি উঠতে দেখেছি।'

এটা একটা সুযোগ…টিমি ভাবল।

'আমি বলছি এটা আমার।'

'তুমি আমাকে বোঝাতে পারবে না।'

এখন কোনো বাদানুবাদ নয়, অন্যথা…

'তুমি কি আমাকে স্যুটকেস নিয়ে উঠতে দেখো নি?'

আমি অবশ্যই মেজাজ দেখাব না, অন্যথা…

'ওহে, সত্য কথা বল, এতে কোনো ক্ষতি নেই!'

'আমি আর বেশি কী বলতে পারি?'

সবাই আমার দিকে তাকাচ্ছে। হা ঈশ্বর, আমি এখন কী করতে পারি? পিছন থেকে কে একজন চিৎকার করল, 'আজ ওর সৌভাগ্যের দিন। বেশ, ওরই হোক।'

'ওর যদি না হয়, তাহলে কী ক'রে এটা সৌভাগ্যের দিন হয়?'

একজন মহিলা হা হা ক'রে হেসে উঠে বললেন, 'তুমি আমারটা নেবে, আমি তোমারটা, সে আর কারোর নিক। তাহলে আমাদের সকলেরই সৌভাগ্যের দিন হবে, অ্যাঁ?' মনে হল, হাসিতে দুলতে দুলতে মহিলা আত্মহারা হলেন।

অন্য প্রান্ত থেকে বুড়ো গলা ভেসে এল, 'আঃ! ওকে ছেড়ে দাও। কেবল একজনই মহিলাদের স্যুটকেস নিয়ে উঠতে দেখেছে এবং একজন লোকই বলছে এটা তার। একজনের বিরুদ্ধে একজন। স্যুটকেসটা ওকেই রাখতে দাও। আর ঐ লোকটিকেও ওর বিশ্বাসটিকে রাখতে দাও, যে স্যুটকেসটি ওই মহিলাদেরই।'

আবার হাসির হররা। শুভ নববর্ষে এই যুক্তিটি মজা আর গানের মধ্যে তরল হয়ে গেল।

টিমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সে জিতেছে। বাস স্টপেজে থামলে সে নামল। পিছনে, বাস থেকে একজন চিৎকার ক'রে বলল, 'স্যুটকেসটা তবু বলবে কে এর মালিক, ঈশ্বর তার সাক্ষী!'

লোকেরা নিজের চরকায় তেল দেয় না কেন! সব লোক কি তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে?

বাস থেকে নেমেই সে কৌতূহল, উদ্বেগ এবং আশায় দুলতে লাগল। তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেখতে হবে স্যুটকেসে কী রয়েছে! এটা একটা সুযোগ, মরিয়া সুযোগ। সে তা গ্রহণ করেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই চিন্তাতেই সে বিভোর হয়ে রইল।

টিমি লক্ষ্য করে নি যে তাকে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। সকলকে সার্চ করছে দু'জন শ্বেতাঙ্গ কনস্টেবল। হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে তার লক্ষ পড়ল উজ্জ্বল সাইনবোর্ডে। ত্বরিতে সে সেঁধিয়ে গেল উন্মুক্ত চত্বরের মধ্যে। এলাকাটা একজন চীনার। দৈব তার সঙ্গে, সে ছুটে গেল লোহার দরজার আড়ালে। হৃৎস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম।

পনের মিনিট ধরে সে অপেক্ষা ক'রে রইল। রাস্তার সবকিছু সে দেখতে পাচ্ছে। গুড স্ট্রিটের কোলাহল—যা নিত্যনৈমিত্তিক, আজ তা তুঙ্গে উঠেছে—বর্বর, নৃশংস, ভয়ংকর! হঠাৎ তার মধ্যে একটা বিচিত্র ও ভীতিজনক অনুভূতি জাগল। মনে হল ওই হট্টগোলের মূলে সে, ওই ক্রুদ্ধ চিৎকার তাকে ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে, সেই এই উন্মত্ত কোলাহল জাগিয়ে তুলেছে। মরিয়া মুহূর্তে সে স্যুটকেসটা ফেলে দিতে প্রলুব্ধ হল, এটা তার পক্ষে সহজ হবে। হ্যাঁ, স্যুটকেসটা ফেলে দিলেই তার হাতছুটো, তার অধিক তার বিবেক, ভারমুক্ত হবে। সত্যি বলতে গেলে, এটা তার নয়!

'তার নয়', এই চিন্তা আবার তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এটা তার নয় জেনেই সে সবকিছু করেছে। বাসের ঘটনাটা জ্বলন্ত সত্য যে স্যুটকেসটা তার নয়। সে ঘরে-ফেরার তাড়া অনুভব করল যেহেতু এটা তার নয়। সে এখানে উবু হয়ে বসেছে সমাজবিরোধীর মতো, যেহেতু স্যুটকেসটি তার নয়। তাহলে এটা এখানেই ফেলে দেওয়া যাক না কেন! এটা অধিকার করা এবং নিজের কাছে রাখার এই চেষ্টা-গুলো···? নিশ্চয়ই এর ভেতরে মূল্যবান কিছু আছে। এত ভারি! নিশ্চয়ই থাকা সম্ভব। অন্যথা হতে পারে না। নতুবা দৈব এতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর প্রসন্ন হবে কেন? পূর্বপুরুষদের আত্মা তার প্রতি সদয়, যার ঘরে রুগ্ন স্ত্রী আর ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়ে। অতঃপর বন্য, আদিম সংকল্প তার মধ্যে জেগে উঠল, একটা অন্ধ সংকল্প। কাজটা যখন শুরু হয়েছে তখন সময়মতো বিপদ এড়ানো যাবে কী না-যাবে কিংবা এটা তুচ্ছ বা মূল্যবান জিনিস পাবার জন্যেই হোক, সে কোনোমতেই স্যুটকেসটি ছাড়তে পারবে না!

পিক্-আপ ভ্যান এসে আটক স্ত্রী-পুরুষদের তুলে নিল। পুলিশের গাড়ি চলতে লাগল। টিমি বেরিয়ে এল ফুটপাথে, পিছনে তাকানোর সাহস নেই, স্নায়ু অবসিত হতে পারে এবং ভুল করতে পারে। সে জানে এ-সবকিছুর জন্যে সে প্রস্তুত নয়। উল্টো ফুটপাথ থেকে পিটসো এগিয়ে আসছে। ঈশ্বর, পিটসো এই সময়ে কেন? কুখ্যাত বাক্যবাগীশ পিটসো, যাকে দেখলেই আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যায়।

দু'জনে মুখোমুখি হল।

'অভিনন্দন! তোমার খুব তাড়া আছে মনে হচ্ছে, টিমি?' যথারীতি হৈ হৈ ক'রে আমুদে মেজাজে বলল পিটসো। 'তুমি কি আসছ, না যাচ্ছ?'

'আসছি।' টিমি কোনো উৎসাহ দেখালো না।

'ওহে, কবে থেকে তুমি নিজেকে এ. জে. বি. ভাবছ?'

'কে বলেছে, আমি এ. জে. বি.?'

'ওইযে ওখানে বন্ধু'—স্যুটকেসের ওপর আদ্যাক্ষরগুলো দেখালো পিটসো, তারপর হাসিচোখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

'হ্যাঁ, ওটা আমার মাসতুত ভায়ের।' টিমি চাইল তার মুখমণ্ডলে একটা বোকাটে হাসির শূন্যতা ফুটিয়ে তুলতে। পরে তার মনে হল নিজেকে অক্ষম আর অসহায়। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে পিটসো আর তার হাসির ভঙ্গি একাত্ম হয়ে গেছে। একাত্ম হয়ে গেছে পিটসো আর তার মুখমণ্ডল। এত অস্বাচ্ছন্দ্য আর কখনো বোধ করে নি আগে।

'অত্যন্ত দুঃখিত পিটসো, আমার স্ত্রী অসুস্থ, আমার তাড়া রয়েছে।' সে এগিয়ে গেল। পিছনে পিটসো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল, তার বিস্তৃত মুখে শূন্য হাসি।

শেভ্রলে গাড়িটা পেভমেণ্টের ধারে থামল, তারপর অলসগতিতে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে এগোতে লাগল।

'ওহে!'

টিমি বাঁদিকে তাকালো। তার বুকের ভিতরে কে যেন আঘাত করল, গলার মধ্যে কী একটা ঠেলে উঠছে।

'দাঁড়াও, ওহে,' ড্রাইভার তার দিকে হাত নাড়ল।

তাহলে ওরাই, দুজন শ্বেতাঙ্গ কনস্টেবল, পিছনের সীটে সাদা পোশাকে একজন আফ্রিকান। তক্ষুণি সে বুঝল দৌড়ে পালানো বোকামি হবে। স্যুটকেসটি তারই কাছে। সে থামল। ড্রাইভার তার কাছে এগিয়ে এসে হাত থেকে স্যুটকেসটি ছিনিয়ে নিল। তার কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলল গাড়ির দিকে। পিছনের দরজাটা খুলে দিল। তারপর গাড়ি ছুটল থানার উদ্দেশ্যে।

পাশের কালো লোকটিকে চিনতে পেরেই তার হাঁটুদুটো অবশ হয়ে এল। বাসের সেই লোকটি, যে প্রথম তর্ক করেছিল যে স্যুটকেসটি ওর নয়। হা ঈশ্বর, প্রখর ন্যায়ধর্মের কারণেই কি লোকটি দৈবপ্রেরিত সাক্ষী? এই নববর্ষের প্রাক্কে? কিংবা ও কি একজন গোয়েন্দা? না, তাহলে সে বাসেই তাকে গ্রেপ্তার করতে পারত। লোকটি তার দিকে তাকাচ্ছে না। ধর্মচেতা লোকের মতো সে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। টিমি আহত হল। বিরক্তিও বোধ করল। উদ্‌ভ্রান্ত। এটা একটা চ্যালেঞ্জ। সে তা গ্রহণ করবে। পরিস্থিতি মোড় নিতে পারে। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে হবে।

থানায় দুজন কনস্টেবল স্যুটকেসটা একটা ছোট কুঠুরিতে রাখল। কয়েক মিনিট পরে তারা বেরিয়ে এল। একটা বিচিত্র অনুভূতি—টিমি ভাবল।

স্যুটকেসটা তার সামনে রেখে কনস্টেবলদের একজন বেশ নরমস্বরেই টিমিকে জিজ্ঞাসা করল, 'কার স্যুটকেস এটা?'

'আমার।'

'এর ভেতরে কি তোমার জিনিস আছে?'

'আমার স্ত্রীর জিনিস।'

'কী কী জিনিস?'

'আমার মনে হয় ওর জামাকাপড়।'

'তোমার "মনে হয়" কেন?'

'দেখুন, সে তাড়াহুড়ো ক'রে গুছিয়ে দিয়েছে। আমাকে ওর খুড়ীমার কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিল। আমি দেখি নি কী রেখেছে ওর মধ্যে।'

'হুম! তুমি তোমার বউয়ের পোশাক-আশাক চেনো তো?'

'কিছু কিছু।' তার সঙ্গে এমন খোলামেলা ব্যবহার করছে কেন? শ্বেতাঙ্গের চোখে অমন শীতল কৌতূহল কেন?

কনস্টেবলটি স্যুটকেস খুলল। জিনিসগুলো একটা একটা ক'রে খুলে ধরল। একটা জীর্ণ পোশাক।

'এটা তোমার বউয়ের?'

'হ্যাঁ।'

'এগুলো? এগুলো?'

টিমি হ্যাঁ বলল। কেন ওরা ছেঁড়া পোশাকগুলো পুরেছে? কনস্টেবল সবগুলো টিমির সামনে তুলে ধরল। টিমির চিন্তাগুলো উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াচ্ছে, মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। তার ভাগ্যও কি ছলনা করছে? তার মনে হল কিছু একটা ভুল হয়েছে। সে কি প্রতারিত হয়েছে? সমস্ত জীর্ণ জামাকাপড়গুলো বের ক'রে কনস্টেবলটি আগ্রাসী দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই দ্রব্যটিও কি তোমার বউয়ের?'

টিমি ঘাড় নিচু ক'রে দেখল।

নৃশংস দৃশ্য! একটি মৃত শিশু, যে মাত্র বারো ঘণ্টা আগে জন্মগ্রহণ করেছিল। উলঙ্গ, ফ্যাকাসে-সাদা, কোঁকড়া চুল—মৃত্যুর প্রতীক। টিমির শ্বাস বন্ধ হয়ে এল। সে অসুস্থ বোধ করল, তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ওরা ধরাধরি ক'রে ওর বিবৃতি নেবার জন্যে কাউণ্টারে টেনে নিয়ে গেল। সে সব স্বীকার করল। সুযোগকে নিয়ে সে জুয়ো খেলেছে, যে-সুযোগ নেবার জন্য তাকে দাম দিতে হল আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ড।

অনুবাদ ॥ মিহির আচার্য

লুই আরাগঁ

সহযোগী

দোকানের দরজা বন্ধ হল। ম্যাসিয়্য (Monsieur) গ্রেগোয়ার পিক জানলা দিয়ে দেখলেন, যে-খরিদ্দার একটু আগে দোকান থেকে বেরলো, সে দূরে চলে যাচ্ছে। লোকটি ছোটখাটো, বাদামী রঙ, চোখে চশমা, একটু কুঁজো হয়ে চলে।

'ও নিশ্চয় ফরাসি নয়,' মঃ পিক মন্তব্য করলেন। তাঁর কপালে ফুটে উঠল সামান্য ভ্রূকুটি। খাবার টেবিলে যে-ভ্রূকুটি দেখলে মাদাম পিক ভয় পান।

মাদাম পিক গভীর দুঃখের স্বরে বললেন, 'তোমার কি তাই মনে হয়? ও কি তবে ইহুদি?'

মঃ পিক কাঁধ ঝাঁকালেন। ইহুদি হোক বা না-হোক, লোকটা নিশ্চয় ইংরেজি রেডিওর খবর শোনে[১]। ও যে-রেডিওটা মেরামতের জন্য দিয়েছিল সেটা অন্যান্য রেডিওর সঙ্গে সেখানেই পড়ে আছে। একটা ছোট লিঙ্কন রেডিও, যেটা ভালমতো কাজ করছে না। কী গোলমাল হয়েছে, দেখতে হবে। অবশ্য যখন সময় পাওয়া যাবে। রাশি রাশি কাজ জমে যাচ্ছে। প্রত্যেকেই চাইছে, তার জিনিসটা আগে মেরামত হোক। মেরামত করতে যা দরকার, সেই নতুন ব্যাটারিও এই যুদ্ধের বাজারে মিলছে না।

'আমি তোমার মতো নই,' মাদাম পিক বললেন। 'তুমি যেমন জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চাও আমি তা চাই না। কিন্তু একজন ইহুদিও আমাদের এখানে ঢুকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। হাজার হোক, ওদের জন্যই তো যুদ্ধ বাধল···আমার খোকা মারা গেল···ওকে মেরে ফেলল!'

মঃ পিক একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন, 'তুমি এ-কথা অনেকবার বলেছ। তুমি ভাল করেই জান, পিয়েরকে কেউ মারে নি। ভেবেচিন্তে কথা বলা উচিত। যারা ইহুদি নয় তারাও সবসময় খুব ভাল লোক হয় না।'

বার্থ পিক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কে জানে শেষ পর্যন্ত কী হবে! আগে এত কাজ জুটত না। খরিদ্দারদের মন জুগিয়ে চলতে হতো। কিন্তু জিনিসপত্র সহজে

পাওয়া যেত। কার সঙ্গে কারবার করা হচ্ছে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হতো না। অবশ্য গ্রেগোয়ার বলে যে সেইজন্যই আজ আমাদের এই অবস্থা। গ্রেগোয়ার জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতার পক্ষে। পাড়ার বাকি সকলে সহযোগিতার বিপক্ষে। তারা সহযোগীদের বিষয়ে মোটেই ভাল কথা বলে না। মাদাম পিক এসব শুনে একটু ভয় পান। তিনি নিজে সরকারকে সমর্থন করেন। কিন্তু সহযোগিতাকে নয়। তাঁর স্বামী যতই যুক্তি দেখান না কেন! মাদাম পিক মানুষ ভাল, কিন্তু ইহুদিদের ভয় পান। তাদের বিষয়ে কী না বলা হয়! মুদিখানার মালিক মাদাম দেলাভিনেৎ বলেন, এসব মিথ্যা কথা। যা রটে তার কিছু ঘটেই। গ্রেগোয়ার সবসময় বলে যে ও ইহুদিবিদ্বেষী নয়। তবু ইহুদিদের নিন্দা করতে তো ছাড়ে না। হয়ত এটাই ওর নিরপেক্ষতার প্রমাণ।

দোকানে গানের সুর ভেসে এল। সুজি সলিদার সত্যিই ভাল গাইতে পারে, মঃ পিক তারিফ করলেন। তিনি গানের সমঝদার। হয়ত সেইজন্যই রেডিও সারাবার কাজ জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি মঃ প্রিম্সটনের টেলে-ফুকেন রেডিওটা চালিয়ে দিয়েছেন। সত্যিই জার্মান রেডিওগুলো চমৎকার। কেউ কেউ আবার সব জার্মান জিনিসকে খারাপ বলে।

'আমি সত্যি কথা বলতে ভয় পাই না,' মঃ পিক বললেন। বার্থ ভাবলেন, ওর স্বামী সুজির গানের প্রশংসা করছেন। নভেম্বরের এগারো তারিখের পর তাঁর আর গ্রেগোয়ারের মুখে জার্মানদের গুণগান শুনতে ভাল লাগত না। গ্রেগোয়ার তাঁর আপত্তি উড়িয়ে দিতেন। 'একটা যুক্তি তো থাকবে! যতদিন ওরা কেবল দখল করা এলাকায় ছিল ততদিন ওদের সব ভাল ছিল। অন্যরা ওদের ঝামেলা পোহাক না! এখন জার্মানরা তোমার নিজের ঘাড়ে পড়েছে বলে বজ্জাত বনে গেছে। এর মানে হয়?'

সত্যিই নভেম্বরের এগারো তারিখের পর পাড়ার অনেকে মত বদলেছিল। গ্রেগোয়ার পিক অবশ্য ঘন ঘন মত পাল্টাবার মানুষ নন। বিদেশীরা দেশ দখল করলে কিছু অসুবিধা হবেই। অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

'তবু কাছাকাছি থেকে দেখে সব অন্যরকম মনে হয়,' মাদাম পিক মন্তব্য করেন।

এ-ধরনের যুক্তি শুনে তাঁর স্বামীর হাসি পায়। তাহলে চিন্তাভাবনার দাম নেই। নিজের কিছু ঘটলেই মত বদলাতে হবে। যেমন কিছু-কিছু লোক বলে। তাঁর ছেলের কথা ভেবে জার্মানদের বিপক্ষে যাওয়া উচিত ছিল। প্রথম কথা,

পিয়ের জার্মানদের হাতে মারা যায় নি। দলে দলে পালিয়ে আসার সময় একটা নিরর্থক দুর্ঘটনা···ব্যাটারি সারাতে গিয়ে। অবশ্য কেউ কেউ বলে জার্মান আক্রমণ না হলে এ-সব কিছুই ঘটত না। ছেলেমানুষি কথা! আর পিয়ের জার্মানদের হাতে মারা পড়লেও একই ব্যাপার হতো। তাঁর নিজের ছেলে বলেই কি মত পাল্টাতে হবে! জার্মানরা তাঁর ছেলেকে মারলেও মঃ পিক সহযোগিতার পথ নিতেন। না হলে যে পরের বার আর একজনের ছেলে মারা যাবে। নিজের ক্ষতি হয়েছে বলেই মতামত ছেড়ে দেব? এ যেন রোদ গায়ে লাগছে বলে দিনদুপুরে বলা যে রাত হয়েছে! প্রতিশোধ, পাল্টা প্রতিশোধের ব্যাপারই বা কতদিন চলবে? একজন আমার ছেলেকে মারল, আমি তার ছেলেকে মারলাম, সে আবার···এর শেষ কোথায়? ঠিক আছে, আমি ধরেই নিলাম, জার্মানরা পিয়েরকে মেরেছে। বার্থ এতে খুশি হবে, কারণটা ভগবানই জানেন। আমি না হয় ভুল হলেও কথাটা মেনে নিলাম। তার জন্য আমার জীবনদর্শন বদলাবে না।

গ্রেগোয়ার তাঁর জীবনদর্শনের কথা বলতে শুরু করলে বার্থ চুপ ক'রে যান। তিনি জানেন তাঁর স্বামী পিয়েরকে কত ভালবাসতেন। এটাই কি তাঁর সততার সবচেয়ে বড় প্রমাণ নয়? বার্থ এ কথা দিনরাত বিশ্বসুদ্ধ লোককে বলে বেড়ান —মঃ রবেয়ার, মাদাম দেলাভিনেৎ, দোকানের মেয়েরা—সকলকে।

'মাছি মারা···মাছি মারা···'

'আঃ! বাচ্চাটা···জাকো, তুই জানিস যে হাত দিতে নেই।' জাকো রেডিওর বোতাম টিপেছে। সুজি সলিদরের গানের বদলে শোনা যাচ্ছে মাছির কথা। মঃ পিক 'লিলি মার্লেনে'[৩] ফিরে গিয়ে ছোট, কোঁকড়া মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। ছেলেটার ওপর তাঁর দুর্বলতা একটু বেশি। পিয়েরের তো আর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই। বাচ্চাটার অপদার্থ মা তাকে ফেলে গেছে। জাকো দেখতে অনেকটা ছোট্ট দেবদূতদের মতো।

'সোনামণি, তোর ঠাকুমার কাছে যা। তোর দাদুর এখন কাজ আছে।' বার্থ বাচ্চাকে নিয়ে গেলেন। যেতে যেতে জাকো আর একটু হলেই বাতিগুলো ফেলে দিচ্ছিল, যে-বাতি সকালবেলাই ভিসরের লোক দিয়ে গেছে। একটা সবে মেরামত-করা রেডিও নিয়ে টানাটানি করছিল। সাড়ে তিন বছরে ছেলেটা ভারি মিষ্টি হয়েছে। ও জন্মেছিল যুদ্ধের গোড়ার দিকে। 'রেডিও প্যারিস' আর শোনা যাচ্ছে না। সুজি সলিদর—ওঁর পূর্বপুরুষ ছিল এক জলদস্যু, যে ইংরাজদের সঙ্গে লড়েছিল। রেডিও সারানোর কাজটা ভাল। মঃ পিক এ পথে এসেছেন বলে খুশি।

যদিও আপাতত দু-একটা অস্থবিধা আছে। মেরামত করায় ঘরটা দোকান থেকে আলাদা। মঃ পিক এখানে একা কাজ করতে ভালবাসেন, যেমন মুচি চারদিকে জুতো নিয়ে বসে। খরিদ্দাররা এখানে বিরক্ত করে না। প্রত্যেক বছর বসন্তে তিনি দরজা জানালা খুলে রাখেন, যাতে ঘরে রোদ আসে। গানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কাজ ক'রে বেশ আনন্দ। আঃ, বাঁ-হাতটায় কী ফুটে গেল! কী যে হল আবার? চোখেও কম দেখি!

দিনটা শুক্রবার। মাদাম পিক প্রায় ভুলে গিয়েছিলেন। মিষ্টির দোকানে যেতে হবে। বাচ্চার মিষ্টি চাই। তিনি দোকানে ফিরে এলেন।

'মিষ্টির দোকানে যাওয়ার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। বাচ্চাকে নিয়ে যাব, না তোমার কাছে রেখে যাব?'

মঃ পিক কথাটা শুনতে পান নি। তিনি রেডিও বন্ধ করলেন।

'কী? ওঃ আচ্ছা। বাচ্চাকে রেখে যাও, আমার অস্থবিধা হবে না।'

ছেলেটার বাবাকে জার্মানরা মারলে প্রতিবেশীদের স্থবিধা হতো বইকি! তাঁর বিরুদ্ধে একটা যুক্তি পাওয়া যেত। মঃ পিক ওদের মতো চিন্তা করেন না। এক সময় তিনি লিজনে[৪] যোগ দিয়েছিলেন। এখন অবশ্য আর ওদিকে মাড়ান না। লিজন তাঁকে হতাশ করেছে। বড় বড় কথার কোনো মানে হয়! সরকার থাকবে, সরকার দেশ শাসন করবে। সরকারে একজন প্রধান নেতা থাকবে। ব্যস হয়ে গেল। হ্যাঁ, ওদের স্থবিধা হতো বটে। পড়শিদের কপাল খারাপ। পিয়ের কীভাবে মরেছিল, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওর ক্যাপ্টেন চিঠি লিখেছিল। ওর এক বন্ধু—খাবারের সেলসম্যান, সে এখানেও এসেছিল। ছেলেটার বেশি বুদ্ধি নেই। যত আজেবাজে কথা বিশ্বাস করে। যাকগে, সেটা তার ব্যাপার। মোট কথা, দুর্ঘটনায় পিয়েরের মৃত্যু সে নিজের চোখে দেখেছে। আর এটাতে এমন কী তফাৎ হচ্ছে! ঐ যে লোকটা আগে বিস্কুটের কারবারে কাজ করত, এখন সরকারি চাকরি করে, সেও তো সহযোগী। বার্থ তার কথা টেনে এনে গ্রেগোয়ারের সঙ্গে তর্ক করে। বার্থের বুদ্ধি আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত কথায় মঃ পিকের গায়ে আঁচড় লাগে না। আসল কথা—প্রশ্ন বুঝতে পারা…আসল প্রশ্ন…। খেলার খবর শোনার দরকার নেই। বোতাম ঘোরাতে হাল্কা বাজনার স্থর শুনতে পাওয়া গেল। রেডিও রোম বোধ হয়, ইটালিতে ভাল অর্কেস্ট্রা আছে।

ঐ লোকটা…যাকে 'বড় ঘোড়া' বলা হতো…কী যেন নাম…ও তো পুরো-

পুরি সহযোগিতার পক্ষে। যুদ্ধের আগে ওর অন্যরকম মতামত ছিল। প্রতি-যোগিতার পরীক্ষায় পাশ করে নি। এমনিতে ও কখনোই সরকারি চাকরি পেত না। যুদ্ধবিরতির পর ওর দাবিদাওয়ার ব্যাপারে ওর মতামতের জন্য বেশ নাম ছিল। বদলাবার ফলে…নিশ্চয়ই ওর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত কারণের গুরুত্ব আছে। অন্যরা সেকথা বলে, সহযোগিতার বিরোধিতা করতে। গ্রেগোয়ার তেমন নন। তাঁর বিচার নিরপেক্ষ। ঐ লোকটার ব্যাপার থেকে কী প্রমাণ হয়? ব্যক্তিগত কারণ…ব্যক্তিগত কারণ… জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতায় আমার কী ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকতে পারে? প্রজাতন্ত্রের সময় তো আমার অবস্থা খারাপ ছিল না। সরকার যতই অপদার্থ হোক, আমি তো বেশ ভালই ছিলাম। ঐ লোকটা যুদ্ধের আগে শান্তিবাদী ছিল। তাহলে তো ওর পরিবর্তন আসলে পরিবর্তন নয়। প্রত্যেক ব্যাপারে তো একটা যুক্তি থাকবে! আগে ও হৈ চৈ ক'রে শান্তি আনত, এখন শান্তি বজায় রাখবে সহযোগিতা ক'রে। ওর মতো আর কিছু লোক থাকলে ভাল হতো। ব্যক্তিগত কারণ সত্ত্বেও সবাই মঃ কাতেলাঁর মতো হতে পারে না। ভদ্রলোক যুক্তির ধার ধারেন না। যতদিন সেনাবাহিনী ছিল, তিনি ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহের বিরুদ্ধে। অথচ সেনাবাহিনী এখন আর নেই বলে তাঁর মন ভেঙে গেছে।

বিরক্তিকর! সবসময় রেডিওর দিকে নজর রাখতে হয়। গান শেষ হতে না হতেই শুরু হয় বকবকানি।

আমি ঠিক ধরেছিলাম। এ রেডিওটা সারানো যাবে না। ভিসরের লোকটা ঠিকই বলেছিল বটে! খরিদ্দার যা খুশি করুক। অন্য দোকানে যাক। কোথাও কাজ হবে না, যদি না এমন একজনকে পায়, যার সঙ্গে কালোবাজারের লেনদেন আছে। আমি কালোবাজারি হতে যাব কোন দুঃখে। সেই তো একদিন ধরা পড়ে জেলে যেতে হবে। এমনিতেই যথেষ্ট ভাল রোজগার করছি। আর এত কাণ্ড করতে যাব কাদের জন্য? যারা দিনে দশবার লণ্ডনের রেডিও শোনেন? আমাকে কি গাধা মনে কর!

অবশ্য মঃ পিক একজন সৎ লোক। এমন কি পড়শিরা—ঐ যে লণ্ডিুর গোঁড়া গলপন্থীরা[৫] সেকথা অস্বীকার করে না। এটাই মঃ রবেয়ার, কাপড়ের দোকানের মেয়েরা আর বিশ্বসুদ্ধ লোক বুঝতে পারে না। একজন সৎ লোক কীভাবে সহযোগী হতে পারে? কেন, এতে অবাক হবার কী আছে? লোকে এমনিই ভাবে বটে! যে তোমার মতো চিন্তা করতে পারে না, তার মতো শয়তান আর নেই। সে বাপ-মাকে খুন করেছে…ইত্যাদি।

'ইত্যাদি…' জোরে কথা বলতে গিয়ে মঃ পিকের হাত থেকে একটা ছোট নাট মাটিতে পড়ে গেল। সেটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

মঃ পিক মনে করেন, একজন ইংরাজদের সমর্থকও পারিবারিক জীবনে সৎ হতে পারে। ফ্রাঁ মের্সঁদের[৬] মধ্যে যে ভাল লোক আছে, একথাও তিনি স্বীকার করতে রাজি আছেন। অবশ্য সবকিছুরই সীমা আছে। কম্যুনিস্টরা… তাদের কথা কে বলছে? শয়তানেরা শয়তান ছাড়া কিছু নয়!

'রেডিও আন্দোরা…'

তাহলে ওটা রোম ছিল না। যাই হোক, ইটালিতে ভাল অর্কেস্ট্রা আছে।

আজকাল বুদ্ধি থাকলে গলপন্থী হওয়া অসম্ভব। আমি এমন কথা কিছুতেই বলব না। বোকা না হলে…ছোট…হ্যাঁ, ঠিক আছে। বোকা…দেশত্যাগীদের রেডিওর বক্তৃতা লিখে রাখার মতো। তার জন্য দরকার সেসব শোনা। একজন মেনে নিতেই পারে যে তার শত্রুরা চোর বা ঘুষখোর নয়…অন্তত সকলে নয়। কিন্তু বলা যে শত্রুর একটুও বুদ্ধি নেই…বুদ্ধি…বিদ্যুৎ…হ্যাঁ বিদ্যুৎ যাচ্ছে… তাহলে…ভেবেছিলাম জাকো…বার্থ ওকে নিয়ে গেছে, না রেখে গেছে?

মঃ পিক তাড়াতাড়ি উঠলেন। তাঁর নাতি কোথায় গেল? শব্দ শোনা যাচ্ছে না। দোকানের পিছনে…রান্নাঘরে…মঃ পিকের বুক কেঁপে উঠল। ছেলেটা নিশ্চয়ই কোনো দুষ্টুমি করছে। যা ভেবেছিলেন তাই। বার্থ উঠোনের দরজা খোলা রেখে গেছে। জাকো উঠোনে নেই। রাস্তার দিকের দরজা খোলা, যে-দরজাটা আপনি থেকে খুলে যায়। বাচ্চাটা ফুটপাথে বল খেলছে।

'জাকো, ওখানে কী করছিস? গাড়ি এলে…!'

ছোট্ট হাতটি দাদুর হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল।

'না, না…বল খেলব, দাদু।'

দাদু আবার গলে গেলেন। কিন্তু ভয় হয়েছিল। ছেলেটা লম্বা হয়েছে বটে, গায়ে জোরও হয়েছে। ভারি দরজা একা খুলে রাস্তায় গেল…আজকাল আগের মতো গাড়ি চলে না—তাই বাঁচোয়া।

'তোর খেলনা নিয়ে এখানে লক্ষ্মী হয়ে বস। শোন, কেমন সুন্দর গান!'

কিন্তু ছোট্ট দেবদূতটি দাদু কাজে ডুবে যাওয়া মাত্র সবকিছু নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করল। কয়েকটা জিনিস খুব সশব্দে পড়ল। দোকানের অন্যদিক থেকে আশ্চর্য, ভয়াবহ শব্দ ভেসে এল। কী ক'রে এরই মধ্যে ছেলেটা ওখানে চলে গেল! বার্থকে বলা উচিত ছিল, ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। দুষ্টুটা ভারি সুন্দর! হতভাগা মা-টার

চেহারা পেয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি মিল পিয়েরের সঙ্গে। পিয়েরও ছোটবেলায় এমনই দুরন্ত ছিল। চমৎকার স্বাস্থ্য, গায়ে ছিল বেশ জোর।

পিয়ের বেঁচে থাকলে কী ভাবত? আমি যা ভাবি, তাই। কেন নয়? ওর বুদ্ধি ছিল। হয়ত ওর অন্যরকম মত হতো। তার মানে এই নয় যে ও গলপন্থী বনে যেত। আমাদের মধ্যে মতের পার্থক্য থাকতেই পারত…নিশ্চয় খুব বেশি নয়…লোকে তো ঠিক একরকম চিন্তা করে না। যুক্তি মেনে চললে, আমি যা ভাবি, ও তাই ভাবত। তবে যদি ওর মতামত অন্যরকম হতো…কিন্তু এসব কথা ভেবে কী লাভ? বেচারা তো মারাই গেছে!

'জাকো সোনা, তোর খেলনা নিয়ে খেলা কর।'

কেবল বোকারাই ভাবে সবকিছু তাদের পছন্দমতো হবে। হয়ত পিয়ের আমার মতো চিন্তা করত না। তাতেই বা কিছু এসে যেত? যা সত্যি তা সত্যিই। এক আর একে দুই-ই হবে, এমন কি পিয়ের যদি…।

তবু ব্যাপারটা খুব সুখের হতো না। আগে পরিবারের মধ্যে মতের অমিল হলেও এমন কিছু এসে যেত না। আমাদের পুরোপুরি মিল ছিল। কিন্তু না থাকলেও …আর এখন…এমনিতেই প্রতিবেশীরা সকলে আমার উপর চটা। যারা মনেপ্রাণে সত্যিকারের ফরাসি, ইংরেজ রেডিও তাদের ভয় দেখায়। একজন আছে যে কর্নেলের গলা শুনলেই ভয় পায়। আমি একবার শুনেছিলাম…ওরা যদি জেতে, মজা দেখিয়ে দেবে। বলশেভিজমের কথা ছেড়েই দিলাম। ওদের জয় অসম্ভব, তাই রক্ষা! একেবারে অসম্ভব নয়, তাই যা করার তা করতে হবে। না, অসম্ভবই বলা যায়।

'জাকো সোনা, কোথায় গেলি? ছেলেটা যা দুষ্টু হয়েছে! নাঃ, বাচ্চা রাখা আমার কর্ম নয়। সব জায়গায় টেপ ছড়িয়ে ফেলেছে দেখছি।'

সব আবার ঠিক ক'রে রাখতে একটু সময় লাগল। তারপর মঃ পিক জাকোর ছোট ছোট সুন্দর, ধুলোমাখা হাত ধুইয়ে দিলেন। জাকো সাবানজলে হাত নেড়ে হাসল। কী সুন্দর ফর্সা হাসি-খুশি ছেলে! ওর জন্য যুদ্ধের আগেকার ভাল সাবান [illegible] হয়েছে।

তা বলে পিয়ের সবকিছু বিশ্বাস করার মতো বোকামি নিশ্চয় করত না। লোকে কি না বলে। গত যুদ্ধের সময় যেমন বলা হতো, জার্মানরা বাচ্চাদের হাত কেটে দিচ্ছে। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন এসবই রটত। কেউ আপত্তি করলে তার প্রাণ বাঁচানো দায় হতো। শান্তির সঙ্গে সঙ্গে জার্মান-নিষ্ঠুরতার সব গল্প বন্ধ হয়ে

গেল। এখন একই ব্যাপার। যারা দেশ দখল করেছে, তারা সব শয়তান। লোক-জনের ওপর নির্যাতন করছে, গুলি ক'রে মারছে, মা-র কাছ থেকে ছেলেমেয়েদের ছিনিয়ে নিচ্ছে, হাসপাতালে রোগীদের শেষ ক'রে দিচ্ছে। আরো কত গালগল্প বানানো হচ্ছে তার হিসেবই নেই। শুধু জার্মানদের নয়। আমাদের—ফরাসিদের বিরুদ্ধে একই রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বন্দীশিবির···জেল···নখে পিন-ফোটানো···আরো সব নির্যাতন। ওদের কথা সত্যি হলে তো বলতে হবে মার্শালের[৭] পুলিশ অত্যাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আর ইংরেজরা যে ওয়াশিংটনের ইহুদিদের খুশি করতে দু'বেলা আমাদের সহরের ওপর বোমা ফেলছে! হাসপাতাল, স্কুল, কিণ্ডারগার্টেন···সব ছারখার ক'রে দিচ্ছে! সে-বিষয়ে তো একটা কথাও নেই! না, পিয়ের কখনোই এমন বোকা হতো না।

একটা চিন্তা মাথায় এল।

'জাকো সোনামণি, এই ছবির বইটা দেখ। এই যে বাঘ, সিংহ, ছোট্ট ভেড়া, দুষ্টু নেকড়ে। বাচ্চাটা এমন ছবি ভালবাসে। এবার অন্তত পনেরো মিনিট শান্তি পাবো।'

অনেকক্ষণ ধরে বেল বাজল। দরজা বন্ধ নেই।

'দরজা বন্ধ করুন।'

আগন্তুক ইতস্তত করল। সাঁড়াশি কিনতে এসেছে।

'না মশাই, আমার দোকানে ও জিনিস নেই।'

আগন্তুক ফিরে গেল। ওর চেহারা অনেকটা মিশেল সিমঁর মতো। কিন্তু খামোকা রেডিও-মেরামতের দোকানে তুলো-ধরার সাঁড়াশি কিনতে এল কেন? আজকাল লোকদের মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। তুলো-ধরার সাঁড়াশি। সত্যিই কেউ তা দিলে এখনি বিনা বাক্যব্যয়ে নিয়ে নিত। কত দাম জিজ্ঞেস করত। লণ্ডন রেডিওর পোয়া বারো! এসব লোকগুলো চোখের সামনে বলশেভিকদের দেখলেও চিনতে পারবে না। না, চিনতে পারছে বইকি! তাদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাচ্ছে। ঐ তো সেদিন কাপড়ের দোকানের মেয়েরা বলল, হিটলারের চেয়ে স্তালিন ভাল। কল্পনা করা যায়—স্তালিন ওদের দোকানে দু'পয়সার তুলো কিনছেন! হ্যাঁ, স্তালিন আসতে পারেন বইকি···অবশ্যই নিজে নয়। কিন্তু হিটলার হেরে গেলে এই মেয়েদের দশা কী হবে? কিন্তু তা হবে না। মঃ লাভাল বলেছেন যে ঐ নেতাকে সে চিরকাল বিশ্বাস করেছে। উনি কখনো ভুল করেন নি···চিরকাল লড়াই চালিয়েছেন বলশেভিজমের বিরুদ্ধে। উনি গোড়াতেই বুঝেছিলেন যে মুসোলিনি আসলে শান্তিকামী। আবার বেল বাজছে! কে এল?

'মাদাম, দরজা বন্ধ করুন।'

সকলেই দরজা খোলা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

'জাতীয় সেবা সংঘের জন্য...আপনার পুরনো কাপড়... ?'

'মাদাম, পুরনো কাপড় কোথায় পাব ? এটা রেডিও মেরামতের দোকান, বিছানা তৈরির নয়।'

শেষ অবধি দশ ফ্রাঁ দিতে হল। মহিলাটির ফ্যাকাসে চেহারা, চ্যাপ্টা বুকে অনেক ব্যাজ লাগানো।

জাকোর দিকে তাকিয়ে তিনি যাবার সময় বলে গেলেন, 'কি সুন্দর বাচ্চা! কেমন লক্ষ্মী হয়ে বসে আছে।'

সত্যিই জাকো খুব মন দিয়ে ভেড়ার ছানার ছবি দেখছিল। সে উজ্জ্বল চোখ তুলে দাদুর দিকে তাকালো। বুট-পরা বেড়ালের ছবি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'এটা কী ?' ওর জ্ঞানতৃষ্ণা খুব উৎসাহব্যঞ্জক নয়। পুরো গল্পটা অনেকবার শোনা। তবু দাদু ওকে কোলে নিয়ে আবার শুরু করলেন।

'সেসময় পৃথিবীতে এখনকার মতো শান্তি ছিল না। ছোট ছেলেরা ডাকাত আর মানুষখেকো রাক্ষসের ভয়ে রাস্তায় খেলতে পারত না। গ্রামে সব হিংস্র নেকড়ে চরে বেড়াত, তাদের দাঁত ছিল লম্বা...' ইত্যাদি।

'ও লক্ষ্মী হয়ে ছিল তো ?'—মাদাম পিক ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন।

'ছবির মতো...আসলে ছবিগুলোই...' মঃ পিক ভয় পেয়ে থেমে গেলেন।

'কি হয়েছে বার্থ! তোমাকে এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন ?'

সত্যিই বার্থকে খুব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। পরনে বহুবার-কাচা সাদা পোশাক, তার ওপর ছাপা ফুল। হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। তাঁর হৃৎকম্পন অনুভব করা যাচ্ছিল। জাকোর জন্য আনা মিষ্টি দু'হাতে জোরে চেপে ধরেছেন।

'ভীষণ ব্যাপার! আবার বোমা...'

তার জন্য এত বিচলিত হবার কি আছে। তবে ব্যাপারটা সাংঘাতিক ঠিকই। পিক প্রশ্ন করলেন, 'কোনো জার্মান মরেছে ?'

'হ্যাঁ, দু'জন। বেচারা...কিন্তু সেটা আসল কথা নয়।'

'বল কি ? বেচারা ছেলেদুটোকে ওরা মেরে ফেলল, আর সেটা আসল কথা নয় ?'

'ফারের দোকানদার, মঃ লেপাজ...আজ রাতে....ওকে, ওর স্ত্রী আর মেয়েকে ...গেস্টাপোরা[৮] ধরে নিয়ে গেছে।'

মঃ পিক অবাক হয়ে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'তার মানে ? 'দুজন

কমবয়সের ছেলেকে মেরে ফেলা হয়েছে, তারা কেবল কর্তব্য করছিল বলে। আর এসব লোক ষড়যন্ত্র করছিল। তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে জিজ্ঞাসবাদের জন্য। এতেই তুমি পাগল হয়ে গেলে?'

বার্থ ব্যাপারটা ঠিক বোঝাতে পারলেন না। লেপাজদের ধরে কোথায় নিয়ে গেল কেউ জানে না। মাদাম লেপাজের বাবা খোঁজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে বলা হল, নিজের চরকায় তেল দিতে। এটা তাঁরই গরজ, এ-উত্তরে কাজ হল না। জার্মানরা তাঁকে চুপ করতে বলল। ফরাসিরা জানালো, এটা তাদের ব্যাপার নয়।

বার্থের স্বামী বাধা দিয়ে বললেন, 'তোমরা বোমা ছুঁড়বে, তারপর দোষ দেবে জার্মানদের। এর মধ্যে যুক্তি কোথায়?'

বার্থ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আপাতত রোজ আটটা থেকে কার্ফিউ হবে। আজ থেকে শুরু। খুশি হলে তো?'

'কার্ফিউ?' গ্রেগোয়ার চমকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপরই নিজেকে সামলে নিলেন খুব তাড়াতাড়ি। কার্ফিউ তো আটদিন অন্তর অন্তর হয়ই। তাতে হয়েছে কী? আসলে তিনি চমকেছিলেন বার্থের কথায় অভিযোগের সুরে। অভিযোগ কার বিরুদ্ধে? বোমা ফেললে কার্ফিউ হবেই, এ তো জানা কথা। এতে জার্মানদের দোষ কোথায়? যুক্তির বালাই নেই!

তিনি আপসের সুরে বললেন, 'ব্যাপারটা বিরক্তিকর ঠিকই। আজ সন্ধ্যায় সিনেমা যাব ভাবছিলাম। সিনে দ্য ফ্ল্যারে একটা জার্মান ছবি চলছে—"ইহুদি সুস"[৯]। গত বছর যখন ছবিটা সহরে এসেছিল, দেখা হয় নি। শুনেছি খুব ভাল হয়েছে। চমৎকার অভিনয়! যাকগে, কি আর করা যাবে। মরে তো আর যাব না। যুদ্ধে এসব হবেই। কিন্তু তুমি কার্ফিউ হলে, বা একটু অসুবিধা হলেই জার্মানদের শাপ শাপান্ত করবে?'

'নিশ্চয়ই।'—বার্থের গলার স্বরে আন্তরিকতা।

'ভগবান তোমার প্রার্থনা শুনলে আমাদের কী অবস্থা হবে! লণ্ডনের হুকুম শুনে আমাদের মাথাগরম ছেলেরা রিভলবার ছুঁড়বে! তার চেয়ে মাঝে মাঝে কার্ফিউ ভাল। অথবা যদি আমার দোকানে জনকমিশার ঢোকে!'

'তোমার দোকানে জনকমিশার কী করতে আসবে?'

'বোকা সেজ না। তুমি আমার কথা ভাল করেই বুঝতে পারছ। যাকগে, অন্য কথায় আসা যাক। তুমি যাবার দশ মিনিট পরে, আমি ভাবছি জাকো শান্ত হয়ে বসে আছে, এদিকে...'

'এদিকে এস, আমাকে এখন রান্না করতে হবে। লেপাজের ব্যাপারে দেরি হয়ে গেল। মিষ্টির দোকানদার বলছিল, লেপাজের মেয়ের নাকি প্যারাশুটারদের[১০] সঙ্গে যোগাযোগ ছিল!'

'প্যারাশুটার? দেখছ তো? লোকগুলো ভাল বলতে হবে। যা শোনা যায় সব যদি বিশ্বাস করা যেত! প্রথম কথা, প্যারাশুটার বলে আসলে কিছু নেই। ওসব ছেলেভোলানো গল্প। ফারের দোকানদার গুপ্তচর, আর ওর মেয়ের স্বভাব-চরিত্র খারাপ।'

'কি যে বল! ও খুব ভাল মেয়ে।'

'তুমি ওর দিক টানছ? তোমার মেয়ে থাকলে, তুমি কি তাকে প্যারাশুটারদের সঙ্গে মিশতে দিতে? না। তবে? যুক্তির বালাই নেই। আর আমি যখন জার্মানদের ভাল বলি, বলি যে, তারা যা দরকার তাই করছে, সে বেলা? তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তুমি ক্ষেপে গেছ।'

'ঠিক তা নয়, তবে বিরক্ত লাগে!'

'ঐ হল। তুমি ক্ষেপে যাও। অথচ ফারের দোকানদারের মেয়ে প্যারাশুটারদের নিজের বিছানায় ডেকেছে বলে তুমি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

'তোমাকে কে বলল যে বেচারা মেয়েটা তাদের নিজের বিছানায় ডেকে নিয়েছিল?'

'মেয়েটা বেচারাই বটে! তুমিও। হুঁ, যুক্তির তো বালাই নেই। নিজের বিছানায় না তো কি ওর মা-র বিছানায় ডাকবে। আমাদের সময় তো বিছানায় এসব হতো। এখনকি আর কোথাও....কি হয়েছে, জাকো?'

জাকো মিষ্টি খুঁজছে।

'এখন না, মানিক, খাবার পর। নইলে খিদে হবে না। গ্রেগোয়ার, তোমার সঙ্গে তর্ক করব না। মেয়েটাকে তুমি ভুল বুঝেছ। তাছাড়া সাতটা বাজল, এখনো রান্না শুরু করি নি।'

'মিষ্টি—মিষ্টি!'

জাকো তার ঠাকুমার সঙ্গে চলে গেল। এর মধ্যেই সাতটা বেজে গেল। বেল বাজল, আবার দোকানের দরজা খুলে গেল।

মঃ পিক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দরজা বন্ধ করুন। কী চাই?'

'রঙ কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

এটাই বাকি ছিল। তাও আবার সন্ধ্যা সাতটায়। লোকটার গলার স্বর

অনেকটা রেমুর মতো। মিশেল সিমঁ, তারপর রেমু…সব সিনেমার নায়ক…আরো কে আসবে।

দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। না হলে এরপর এখানে জুতোর ফিতের খরিদ্দার আসবে। তবু চৌকাঠে মঃ পিক একটু দাঁড়ালেন। আবহাওয়া এখন ভালই। গরম, কিন্তু এ সময়ের পক্ষে বেশি গরম নয়। কালকের বৃষ্টির পর অনেকটা গুমোট কেটে গেছে। উল্টোদিকের মুদিখানার মালিকানির সঙ্গে কথা বলে পিক খুব মধুর উত্তর পেলেন না। মাদাম দেলাভিনেৎ এরকমই বটে। ওদিকের লণ্ড্রি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে। রাস্তাটা বেশ শান্ত। ট্রাম-টার্মিনাসে গত ছ'মাস ট্রাম আসে না। একজন পাগলের মতো সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

লণ্ড্রির মালিক বলে উঠলেন, 'দেখলেন মঃ পিক, আজকাল মোটর চলছে না বলে ছেলে-ছোকরারা যা খুশি তাই করে। আপনার নাতি কতবার এখানে বেরিয়ে এসে খেলে।'

'আর বলবেন না, মঃ ব্রাঁ। এসব ছেলেদের জার্মানিতে পাঠালে ভালই হয়,' গ্রেগোয়ার মুরব্বীয়ানার সুরে বললেন। যারা ঠিক তাঁর নিজের শ্রেণীর নয়, তাদের সঙ্গে তিনি সেই ভাবেই কথা বলেন।

'আমি তা বলতে চাই নি।'

মঃ ব্রাঁ হঠাৎ সরে গেলেন। নিশ্চয়ই কেউ তাঁকে ভিতর থেকে ডাকছিল। মঃ পিক মাথা নাড়লেন। ছেলেদের জার্মানিতে পাঠানো হয়, এটা তো ঠিক। ভাল না লাগলে কী হবে! আর ছেলে-ছোকরাদের একটু শৃঙ্খলা শেখালে মন্দই বা কি! আগে তো সেনাবাহিনীতে শিক্ষানবিশির ব্যবস্থা ছিল। এখন জার্মানিতে ব্যবস্থা হচ্ছে। না হলে অকর্মা আর গুণ্ডার দলে দেশ ছেয়ে যেত। আমাদের বরং জার্মানদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

পিক রাস্তায় একটু ঘুরে এলেন। সেখানেও ষোল-সতেরো বছরের ছেলেরা বেঞ্চে বসে বা দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কথা বলছে। পিকের যা মনে হল, তা আর বললেন না। একটা থামে আটকানো মিলিসের[১১] বিজ্ঞাপন পড়লেন। না, লাল বিপদের কমতি নেই। নইলে কাগজের ঘাটতি সত্ত্বেও এরা এত বিজ্ঞাপন দেবে কেন। তাছাড়া কমবয়সী ছেলেদের দেখলেই বোঝা যায়। সেদিন বলশেভিক-বিরোধী প্রদর্শনীতে গিয়ে যা দেখেছিলেন, তার তুলনা নেই। ওদের জেলখানায় বলাও যায় না। এসব তো বানানো গল্প নয়!

সেই কথাই পিক মঃ রবেয়ারকে বললেন। রবেয়ার মাথা থেকে লোহার টুপি সরিয়ে তাঁর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলছিলেন—আবহাওয়ার কথা, কার্ফিউ-র কথা, যা সকলেই বলছে। যে-নাচের আসরে দু'জন জার্মান মারা গিয়েছিল, সেখানে নাকি একজন ফরাসি মেয়েও আহত হয়েছিল। সকলে বলছে, বেশ হয়েছে। ওর কী দরকার ছিল শত্রুদের সঙ্গে নাচতে যাওয়ার। মঃ রবেয়ার বয়স্ক মানুষ,একটু ভীরু। গোঁফে পাক ধরেছে, চিবুক দেখা যায় না। তিনি খুব খোলাখুলিভাবে কথাগুলো বললেন না। কিন্তু পিক আসল কথা বুঝে একটু বিরক্ত হলেন। তবে রবেয়ার সর্বদা তাঁর সঙ্গে ভাল ব্যবহার ক'রে এসেছেন। অন্য পড়শিদের সঙ্গে তো তেমন সম্পর্ক নেই।

'কেন মঃ রবেয়ার, আমরা দু'জনেই তো উনিশ সালে রাইনল্যাণ্ডে ছিলাম। সেসময় কোনো মেয়ে আমাদের সঙ্গে নাচলে কি আমরা খুশি হতাম না? তবে একটা যুক্তি থাকা চাই।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ও-দেশে মেয়েরা আমাদের সঙ্গে নাচলে, জার্মানরা তাদের মাথা নেড়া ক'রে দিত।'

'সব দেশেই কিছু মাথাগরম লোক আছে। তার থেকে কী প্রমাণ হয়?'

'না, না, আমি কিছু প্রমাণ করতে চাইছি না। কেবল কথার কথা…জার্মানরা যা করছে, আমরা তার সব করলে আর দেখতে হতো না।'

'আমরা ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি।'

'জার্মান ভাষা শিখতে পারি। না, আমি ঠাট্টা করছিলাম।'

পিকের এ-ঠাট্টা ভাল লাগল না। ফরাসিরা যখন জার্মানির এক অংশ দখল করেছিল, সে সময়কার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি তখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে গডেসবার্গে ছিলেন। আর ভিসবাডেন…সুন্দর সহর! তখন তাঁর দিকে লোকে বোমা ছুঁড়লে কি তিনি খুশি হতেন? কি কোনো সৈন্যের বুকে ছুরি বিঁধলে কমাণ্ডার তা পছন্দ করতেন।

'যুক্তি থাকা চাই', তিনি আবার জোর দিয়ে বললেন।

মঃ রবেয়ার জানতেন না যে পিক রাইনল্যাণ্ডের কথা ভাবছেন। তাঁর নীল চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল।

'কি বলছেন?'

'না, বলছিলাম কি সব জিনিসের একটা যুক্তি থাকবে তো?'

'নিশ্চয়ই!'

দু'জনে দু'দিকে চলে গেলেন।

রান্না শেষ হয় নি। খেতে বসতে বসতে আটটা বাজল। আজ শুক্রবার খাবার খুব বেশি নেই। বার্থ কি-একটা রেঁধেছে···ডিম পেল কোথায়? কালোবাজারে কিনেছে নাকি? কালোবাজারে কিছু কিনলে বার্থ সে-কথা স্বামীকে বলেন না। শুনলেই গ্রেগোয়ারের খাবার আনন্দ নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি আমি কালোবাজারি করতাম? যদি সকলেই তাই করত, তবে দেশের অবস্থা কী হতো? অনেকেই করে বইকি, সবাই করে। ভাগ্যিস জার্মানরা আছে।

বার্থ বাধা দিয়ে বললেন, 'তুমি কি মনে কর, জার্মানরাও একটু-আধটু কালো-বাজারি চালায় না?'

পিক ইতস্তত করলেন। একথা মেনে নেওয়া মানেই এক বিশেষ দলকে সাহায্য করা। কিন্তু কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। মঃ লাভাল এ নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। হাজার হোক, জার্মানরা দেবতা নয় – মানুষ, এমনকি একটু···

'হ্যাঁ, আমি বলছি না ওরা করে না, তবে ওরা করলে ঠিক কালোবাজারি বলা যায় না।'

জাকো কিছু খাচ্ছে না।

'লক্ষ্মী, এইটুকু খেয়ে নাও। দাদুর জন্য এক চামচ, ঠাকুমার জন্য এক চামচ, বাবার জন্য এক চামচ। আহা, তোমার বাবা···'

ছেলেটা কি সুন্দর! ফর্সা রঙের নিচে যেন রক্ত ফেটে পড়ছে। ঐ চোখ তুলে তাকালে, ছোট নরম হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে, ওকে মিষ্টি না দিয়ে পারা যায়!

'যাও খেলা কর।'

জানালা দিয়ে ওঁরা দেখলেন, জাকো উঠোনে বল নিয়ে খেলছে। সুন্দর, ছোট রবারের বল। জাকো এখনো ভাল ক'রে খেলতে পারে না। বলটা বার বার যে-কোনো জায়গায় ছোঁড়াটাই মজা। জাকোর হাসির শব্দে শান্ত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আরো মিষ্টি হয়ে উঠছিল। বাগান থেকে ভেসে আসছিল ফুলের সুন্দর গন্ধ।

গ্রেগোয়ার বললেন, 'রাস্তায় মঃ রবেয়ারের সঙ্গে দেখা হল। ওর কিছু-একটা গোলমাল হয়েছে।'

'তোমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলে নি?'

এটাই বার্থের ভয়। মঃ রবেয়ার চিরকাল খুব ভদ্র। সে যদি একদিন গ্রেগো-য়ারের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা না বলে, তবে বুঝতে হবে, অবস্থা খারাপ।

'না, না, তা নয়। তবে এমন আজেবাজে কথা বলল।'

মাদাম পিক স্বাভাবিকভাবে বললেন, 'হয়ত ও গলিজমের দিকে ঝুঁকেছে। তুমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাবে নাকি? ও ভুলেই গিয়েছিলাম…কার্ফিউ।'

'বাড়িয়ে বলছ। রাস্তায় না বেরলেই হল।'

'তাই নাকি? আচ্ছা আমি দেখি, অবস্থাটা কি রকম!'

রবেয়ারের কথাগুলো গ্রেগোয়ার যত ভাবছিলেন তত আশ্চর্য মনে হচ্ছিল। ওরকম ঠাট্টা মোটেই সুবিধার নয়। বুড়ো বয়সে লোকটার ভীমরতি হয়েছে।

বার্থ খুব উত্তেজিত অবস্থায় ফিরে এলেন। না, দরজার বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই। সবকিছু বন্ধ। উনি একতলার জানালা থেকে দেখেছেন। রাস্তায় জার্মানরা ছাড়া কেউ নেই।

'জার্মানরা? এখানে, এ-রাস্তায়?'

'হ্যাঁ, জনা বিশেক হবে। রাস্তার মোড়ে ভিড় ক'রে রয়েছে, পথ বন্ধ ক'রে। হাতে বন্দুক। রাস্তার ওদিকটায় কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।'

'এখানে?'

মঃ পিক আর কিছু বললেন না। ভেবে দেখলেন, তাঁর নিজের ব্যবহার অর্থহীন। জার্মানরা যখন দেশে রয়েছে, এই সহরেই রয়েছে, তখন তাঁর বাড়ির পাশে থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে? না থাকার কোনো কারণ নেই। সকলে যাতে কার্ফিউ মেনে চলে, ওরা তাই তদারক করতে এসেছে। রাস্তায় তিনি যেসব ছেলেদের ঘুরতে দেখেছিলেন, মঃ পিকের তাদের কথা মনে হল।

'এর থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না।'

তবু ব্যাপারটা তাঁর ভাল লাগল না। কিন্তু বার্থেরও ভাল লাগছে না দেখে ইচ্ছা ক'রে উল্টো সুর ধরলেন। প্রমাণ করলেন যে জার্মানদের উপস্থিতি সবদিক থেকে ভাল। ওরা রয়েছে বলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

'ওরাই কিছু হলে আমাদের বাঁচাবে। চারদিকে গোলমাল চলছে। যত্তসব মাথা গরম লোক…!'

একটু ভেবে বললেন, 'আমি উঠোনে গিয়ে সিগারেট ধরাবো জাকোকে নিয়ে।'

জাকো পা দিয়ে বল ঠেলা শিখছিল। মানব প্রতিভার নতুন আবিষ্কারের ফলে যেমন উৎসাহ হয়, তার তেমনি উৎসাহ হচ্ছিল। বল ছুঁড়ছিল ডাইনে বাঁয়ে। কিছুক্ষণ একটা ছোট্ট সবুজ-হলদে মেশানো কাঠের গাড়ি তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। গাড়িতে কয়েকটা পাথর জড় করা রয়েছে। জাকো দড়ি ধরে গাড়িটা টানতে লাগল। সে যেন ট্রেনের ইঞ্জিন।

ঠাকুমার চোখে স্নেহ উপচে পড়ছে। সত্যিই ছেলেটা এত মিষ্টি!

'আমি যখন পঁচিশ নম্বর রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে গস্তেসবার্গে ছিলাম…,' মঃ পিক পুরনো দিনের গল্পে ফিরে গেলেন। প্রত্যেকবার ধোঁয়া ছাড়ার পর তিনি এমনভাবে তাকাচ্ছিলেন যেন এই প্রথম সিগারেটটা দেখলেন।

জাকোর আর গাড়ি নিয়ে খেলতে ভাল লাগছিল না। সে আবার বল নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেল। বলটা দরজার নিচে গড়িয়ে গিয়েছিল, যে-দরজা আপনি থেকে খুলে যায়। জাকো ছুটে গেল। তার পা লেগে হঠাৎ ছিটকিনি খুলে গেল। কি হয়েছে ভাল ক'রে না বুঝেই জাকোর দাদু দরজার দিকে ছুটলেন।

কিন্তু যথেষ্ট তাড়াতাড়ি নয়। জাকো ততক্ষণে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে বল কুড়োচ্ছে। গলির মধ্যে মঃ পিক কেবল দেখতে পেলেন, একজন লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ জার্মান সৈন্য। বন্দুক তুলে সতর্কভাবে বাচ্চাকে তাক ক'রে সে গুলি ছুঁড়ল। দেখা গেল, তার হাতের টিপ অব্যর্থ।

অনুবাদ ॥ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

১. জার্মানির দখলে ফ্রান্সের যে-অংশ ছিল, সেখানে ইংরেজ-রেডিও শোনা ছিল নিষিদ্ধ।

২. ফ্রান্স এসময় পরাধীন ও মুক্ত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু মুক্ত অঞ্চলেও জার্মান প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

৩. লিলি মার্লেন : বিখ্যাত জার্মান গান।

৪. লিজন : এক দক্ষিণপন্থী সংগঠন।

৫. সেনাপতি দ্য গল ফ্রান্সের প্রতিরোধ-যুদ্ধের এক নেতা ছিলেন।

৬. ফ্রঁা মের্সঁ : এক উদারপন্থী গুপ্তসমিতি।

৭. মার্শাল পেতাঁ : জার্মানদের সহযোগিতায় ফ্রান্সের মুক্ত অঞ্চল শাসন করতেন।

৮. গেস্টাপো : হিটলারের নিজস্ব পুলিশবাহিনী, যার কুখ্যাতি সর্বজনবিদিত।

৯. ইহুদি সুস : নাৎসি জার্মানিতে নির্মিত কুখ্যাত ইহুদি-বিদ্বেষী চলচ্চিত্র।

১০. জার্মানদের দখল-করা দেশে মিত্রশক্তি প্যারাশুটার পাঠাতো।

১১. মিলিস : কুখ্যাত ফরাসি সংগঠন, নাৎসিদের সহযোগী।

সি গ ফ্রি ড লে ন ৎ স

একনায়কের ছেলে

আমার বাবা গঙ্গো গরা—তাঁর সরকারি উপাধি 'জনগণের ও সমাজের পিতা'—খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি তাঁর প্রতিভা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। তাই মাত্র পনেরো বছর বয়সে আমি বিমানবাহিনীর ভাইস মার্শাল হলাম। তার কিছুদিন পরেই স্থান পেলাম 'শিল্প অ্যাকাডেমিতে'। সতেরো বছর বয়সে আমাকে দেওয়া হল সরকারি মুখপত্র 'প্রদ দন্দম' (অর্থাৎ 'আনন্দময় জাগরণ')-এর প্রধান সম্পাদকের পদ। যদিও এসব কাজে আমার অনেকটা সময় চলে যেত, আমার বাবা জেদ ধরেছিলেন যে আমাকে সেই সঙ্গে কলেজের পড়াও শেষ করতে হবে। অবশ্য আমাকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, যাতে আমি খুশিমনে কলেজের পড়া শেষ করতে পারি। প্রতিশ্রুতি ছিল যে পরীক্ষায় পাশ করার পরেই আমাকে উপযুক্ত পদ দেওয়া হবে। উপযুক্ত পদ হিসাবে বাবা বিদ্যুৎ ও তেল দপ্তরের মন্ত্রীত্বের কথা ভেবে রেখেছিলেন।

অথচ এই প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ কখনো আমার ভাগ্যে জুটবে না। যে-প্রতিভা আমি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম, যা আমার বাবা খুব তাড়াতাড়ি আবিষ্কার করেছিলেন, সে-প্রতিভা রাষ্ট্রের কোনো উচ্চপদের কাজে লাগানো যাবে না। এমন কি ট্রেড ইউনিয়নের প্রথম-সেক্রেটারি হতেও আমার ডাক পড়বে না। কারণ আমাদের দেশের এনসাইক্লোপিডিয়া ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বইয়ের তথ্য অনুযায়ী, আমি মৃত। যেসব মৃতরা দেশের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবে, আমার স্থান তাদের মধ্যে। এই প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, আমি একদল বিদ্রোহী অস্ট্রালনিকির হাতে প্রাণ হারিয়েছি। নতুন সংস্করণে যোগ করা হবে যে ঘটনাটা ঘটেছিল আমার পরীক্ষার ঠিক আগে। আর প্রতিশোধ হিসাবে বহু বন্দী অস্ট্রালনিকিকে—রাষ্ট্র-এনসাইক্লোপিডিয়ার ভাষায়—'জঘন্য অস্ট্রালনিকিকে'—গুলি ক'রে মারা হয়েছিল। আমার সরকারি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আমার পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হয় নি। কিন্তু প্রাইভেট সেলের দেওয়ালের মধ্য থেকে শুনতে পেয়েছিলাম, আমার

মা জিনেদার করুণ কান্না, জনতার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর, সমস্ত অস্ট্রালনিকিদের নির্মূল করার ডাক।

না। আমার আশায় ছাই পড়েছে। হয় এখনকার মতো, নয় চিরদিনের মতো। প্রতিশ্রুত উঁচু পদে বসে দেশকে ধন্য করা আর হল না। আঠারো বছরের জন্মদিনে নিজেকে প্রশ্ন করি, কোথায় আমার ভুল হয়েছিল। বাবা তো আমাকে খোলাখুলি ভুল স্বীকারের কোনো সুযোগই দিলেন না। এ নিয়ে ভাবতে গেলে সর্বদা মনে পড়ে আমার প্রাক্তন শিক্ষক আলফ্রেড উলের কথা। বলতে গেলে, উনিই হলেন আমার ভুলের শিকলের প্রথম আংটা—যে-ভুলের জন্য আজ আমার এই অবস্থা। হ্যাঁ, সবকিছু শুরু হয়েছিল উলকে দিয়ে। উলের ছিল লম্বা হাত-পা, হলদে চামড়া, শুকিয়ে-যাওয়া চেহারা। তিনি ছিলেন আমাদের ক্লাসের ইতিহাসের শিক্ষক। 'আমরা' অর্থাৎ হোমরা-চোমরা সরকারি লোকজন, ব্যবসায়ী, সেনাপতি আর কৃতী শিল্পীদের ছেলেরা। উল আমার বাবার সরকারি জীবনী আর দেশের ইতিহাস নিয়ে পাঠ্য বই লিখেছিলেন। পুরস্কার হিসাবে পেয়েছিলেন, ঐতিহাসিক-সমিতির সভাপতির উপাধি। এ ছাড়া, তাঁর কাজ ছিল দেশের বিখ্যাত লোকদের পরিচয়-পত্র তৈরি করা। বারো বছর কাজ করেও কিন্তু তিনি এ-ব্যাপারে সফল হন নি। কারণ যখনই বইটা ছাপাখানায় যেত, বিখ্যাত লোকদের নাম যেত পাল্টে।

আলফ্রেড উল ছিলেন আমার বাবার একজন গোঁড়া সমর্থক। আমার মনে আছে, একদিন অস্ট্রালনিকিরা আমার বাবাকে মারার চেষ্টা করায় উল একদম ক্ষেপে গিয়েছিলেন। ক্লাসে ঢুকে নীরব-রাগে পায়চারি করতে লাগলেন। জানালা দিয়ে অদৃশ্য কাউকে ঘুষি দেখালেন। মাঝে মাঝে বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'শেয়াল! শেয়াল!' হঠাৎ আশাতীতভাবে তাঁর হলদে মুখে খুশির আলো দেখা গেল। তিনি আমাদের বললেন, খাতা কলম বার ক'রে আজকের কাজ শুরু করতে। অ্যাকাডেমি, কংগ্রেস ও জনতা আমার বাবাকে যেসব গৌরবময় নামে অভিহিত করেছে, আমরা সেগুলি লিখব। এটাই হবে খুনের প্রচেষ্টার যোগ্য প্রত্যুত্তর। উল জানালার দিকে ঘুষি পাকিয়ে বললেন, 'শেয়ালরা আগে যা কখনো করতে সাহস পায় নি, গত দু'মাসে তাই করেছে। আমরা জানি, ওদের গতবারের বিদ্রোহের নেতা এক টাকা-খাওয়া দালাল। ওরা তাকে আদর ক'রে ডাকে 'অস্ট্রালভিনিয়ে' বা ফড়িং। আমরা এখন ঐ পোকাকে তার উপযুক্ত উত্তর দেব।' উল মাথা নেড়ে আমাদের উৎসাহ দিলেন। আমি দেখলাম, আমার পাশের ছেলেটি অবলীলাক্রমে আমার বাবার সব উপাধি লিখে যাচ্ছে—'জনগণের পিতা' থেকে

শুরু করে 'যন্ত্রশিল্পের আলো,' 'জাহাজের পথপ্রদর্শক,' 'অগতির গতি' ইত্যাদি নিয়ে 'প্রগতির জ্যোতি' পর্যন্ত। সব মিলিয়ে আটচল্লিশটা উপাধি সে লিখল।

খাতাগুলো জড় ক'রে আলফ্রেড উল তাড়াতাড়ি পাতা উলটে পালটে দেখলেন। তারপর আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। উল কিছু বুঝতে না পেরে আমাকে ডেকে খুব সতর্কভাবে প্রশ্ন করলেন। কেন আমি একা কিছু লিখি নি। আমি চুপ ক'রে রইলাম। তিনি কোমলস্বরে একই প্রশ্ন করলেন। আমি তখন ভাবছিলাম, গত-রাতে বাবার সঙ্গে আমার ঝগড়ার কথা। শেষ অবধি, বেশ কষ্ট করে বাবা আমাকে তর্কে হারাতে পেরেছিলেন। আমার বাবার প্রিয় পানীয়—অষ্ট্রালনিকিদের কাছ থেকে লুট করে আনা, 'বুটর গ্লিম'—আমি তারই শেষ বোতল শেষ করেছিলাম, রাষ্ট্রীয় অপেরার প্রধান ব্যালেরিনার সঙ্গে। আমি যত সেকথা ভাবছিলাম, মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছিল। এদিকে উল খুব নম্রভাবে একনাগাড়ে প্রশ্ন করেই যাচ্ছিলেন। কোনো উত্তর না পেয়ে শেষে আমাকে বললেন, বাবার উপাধিগুলো বাড়ি হতে লিখে আনতে। নানা কারণে আমার তা করার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু উলকে সেসব কথা বলা উচিত মনে করলাম না। অথচ ঠিক জানতাম, পরের দিন উনি আমাকে লেখার বিষয়ে প্রশ্ন করবেনই। কাজেই আগে থেকে ব্যবস্থা নিয়ে রাখা ভাল। আমি সেদিন দুপুরেই 'আনন্দময় জাগরণ'-এর সম্পাদক হিসাবে একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললাম। বিষয়বস্তু—কোনো কোনো বয়স্ক শিক্ষকদের প্রাচীনপন্থী শিক্ষাপদ্ধতি। হাতে হাতে ফল পাওয়া গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উলকে দেওয়া হল রাষ্ট্রীয় কাঠের কারখানার পরিচালকের পদ। তাঁকে চলে যেতে হল বহু দূরে পুম্বালের নীল অরণ্যে। যেসব পদ খালি হয়ে গেল, তার কয়েকটা আমি দিলাম আমার ক্লাসের বন্ধু গ্রেগর গে. গামকে। অনেকদিন থেকেই সে আমার বিশ্বস্ত সহচরদের একজন। এ-সমস্তই আমার প্রিয় পরিকল্পনার অংশ।

অবশ্য আমার প্রবন্ধ আর তার ফলাফলের কথা লোকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে গেল। কারণ তখন অস্ট্রালনিকি আর তাদের নেতা অস্ট্রাল-ভিনিয়ে (ফড়িং)-এর ভয়ে দেশশুদ্ধ মানুষের চোখে ঘুম নেই। যেখানে যাই ঘটুক না কেন, লোকে দোষ দিত অস্ট্রালনিকিদের। মাঠ শুকিয়ে গেলে, পঙ্গপাল গাছ নষ্ট করলে, সরকারি অফিসের কাছে শুয়োর চরলে বা মোটরগাড়ি রাস্তার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলে, তার একই কারণ ধরা হতো। লোকেরা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক্ষেপে উঠল। বিমান-বাহিনীর সেনাপতিরা ঠিক করলেন, একটা কিছু করা দরকার। মার্শাল টিবর টুট্রাস বেশ ভালমানুষ। তাঁর পা ফোলা, চিবুক ঝুলে পড়েছে। আমার বাবা তাঁকে

উপাধি দিয়েছেন—'প্রথম শ্রেণীর মেঘের রাজা'। মার্শাল এক গোপন বৈঠক ডাকলেন। আমি ভাইস-মার্শাল হিসাবে তাঁর ডানদিকে বসলাম। বিমানবাহিনী থেকে আমার বাবাকে যেসব নামে অভিহিত করা হয়েছে, মার্শাল প্রথমে সেগুলো গড়গড় ক'রে বলে গেলেন। তারপর প্রস্তাব করলেন, অস্ট্রালনিকিদের দখল-করা এলাকায় আরো কয়েক স্কোয়াড্রন জঙ্গী বিমান পাঠাতে হবে। সবকিছু জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে বিদ্রোহীদের শিক্ষা দিতে হবে। অন্য অফিসাররা প্রশংসাসূচক মাথা নাড়লেন। মার্শাল বলে চললেন, 'এই শেয়ালরা—অস্ট্রাল-ভিনিয়ে (ফড়িং)-কে নেতা হিসাবে পাওয়ার পর, এদের নিষ্ঠুরতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আমাদের সৈন্যরা যে-সব অঞ্চল দখল করেছিল, বা দখল ক'রে আছে, সেখানে ওরা স্বচ্ছন্দে নাক গলিয়েছে। কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, সবচেয়ে উঁচু পদেও ওদের চররা রয়েছে! তাই আমি চাই, সুবিধামতো কিছু লক্ষ্যের উপর বোমা ফেলে ওদের ভয় পাইয়ে দিতে। ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি ন্যাপাম বোমা ফেলার প্রস্তাব করছি।' অফিসাররা নিয়মমাফিক উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়লেন। কেবল আমি মুচকি হাসলাম। যতক্ষণ টিবর টুট্রাস কথা বলছিলেন, আমি একই-ভাবে মুচকি হেসেছিলাম। মার্শাল ঘাবড়ে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি তাঁর সঙ্গে একমত কিনা। তাছাড়া আমার বাবাই এ-প্রস্তাব আগের ক্যাবিনেট মিটিং-এ তুলেছিলেন। আমি উত্তর দিলাম, 'এরকম আক্রমণে যা লাভ হবে, তাতে পেট্রোলের দাম উসুল হবে না'। গলা চড়িয়ে আরো বললাম, 'বিমান স্কোয়াড্রন জনগণের সম্পত্তি। শুধু শুধু সেসব কাজে লাগালে জনগণ খুশি হবে না।' অফিসাররা মাথা নাড়লেন, টিবর টুট্রাসও নাড়লেন। দেখে মনে হল, তিনি খুব কষ্ট করে পুনর্বিবেচনা করছেন। আমি তাঁর প্রস্তাব ভুলে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। এমন সময় তিনি বললেন যে এ-সপ্তাহের শেষে তিনি এ-বিষয়ে আমার বাবার কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন। বুঝলাম, আমাকে তাড়াতাড়ি চাল চালতে হবে। আমি সে-রাতটা কাটালাম আমাদের রাষ্ট্রীয় অপেরার প্রধান ব্যালেরিনা, নাদভিনা শেবের সঙ্গ ছাড়াই। তার বদলে 'আনন্দময় জাগরণ'-এর একটা বড় প্রবন্ধ খুব সাবধানে লিখলাম। আক্রমণের লক্ষ্য, বিমানবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব। তারপর টিবর টুট্রাস আর আমার বাবার কাছে রিপোর্ট পেশ করতে এলেন না। কারণ সপ্তাহের শেষে আমি তাঁকে চিলির সান্তিয়াগো সহরে বিমানবাহিনীর এট্যাশে হিসাবে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম।

আমি বিমান চালানো বিশেষ ভালবাসি না, তাই নিজে মার্শাল টুট্রাসের

জায়গায় এলাম না। অথচ এই পদের গুরুত্ব কম নয়। অতএব আমি এখানে বসালাম আমার আর একজন ক্লাসের বন্ধু বলেসলভ স্মিটকে। সে-ও আমার প্রিয় পরিকল্পনার অংশীদার।

আমার ইতিহাস-শিক্ষক, আলফ্রেড উলকে নিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল, মার্শাল টিবর টুট্রাসকে নিয়ে ব্যাপারটা আরো বেশি দূর গড়ালো। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমি প্রচুর উচ্চপদস্থ লোককে সরিয়ে তাদের জায়গায় আমার ক্লাসের বন্ধুদের বসালাম। এদের অধিকাংশই ছিল সরকারি হোমরাচোমরা লোক, সেনাপতি বা কৃতি শিল্পীদের ছেলে। এটা বেশ সহজেই হয়েছিল, কারণ আমার বাবা নিজেই মাঝে মাঝে বক্তৃতায় বলতেন যে বয়স্ক নেতারা ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই বেশির ভাগ সময় সরকারি কাগজে একটা বড় প্রবন্ধ, এমন কি কাউকে আক্রমণ করে একটা রিপোর্ট বার হলেই কাজ হতো। পুরনো নেতাদের জায়গায় বসত আমার অনুগত ক্লাসের বন্ধুরা। সবচেয়ে গোলমাল হয়েছিল জনশিক্ষা বিভাগের মন্ত্রীকে নিয়ে। শেষ অবধি আমরা অস্ট্রালনিকিদের সঙ্গে ওর গোপন যোগাযোগ আবিষ্কার করতে পারলাম। সেই বসন্তে ওকে গুলি ক'রে হত্যা করা হল।

আমার বাবাকে দেখে মনে হতো, তিনি আমার কাজকর্মে খুশিই হয়েছেন। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন। দিল খোলাভাবে আমাকে খাওয়াতেন, দেশের পরাজিত-শত্রু অস্ট্রালনিকিদের কাছ থেকে লুট করে আনা মদ 'বুটর গ্রিম'। যখন আমি সব গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার অনুগত ক্লাসের বন্ধুদের বসিয়ে ফেলেছি, তখন বাবা একদিন আমাকে একটা কথা বললেন, 'যে-বিপ্লব নিজেকে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঐতিহাসিক বলে দাবি করে, তার কোনো দাম নেই। বিপ্লব চলতে থাকবে।' আমি খুব জোরের সঙ্গে তার কথায় সায় দিলাম। জানালাম, আমি সবচেয়ে উঁচু পদে নতুন মুখ আনার কাজ কতটা এগিয়ে নিয়ে গেছি। বাবা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল। আমার বাবা লুহাকে গেলেন, নতুন জমানার সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ-স্টেশন উদ্বোধন করতে। লুহাক খানিকটা জনশূন্য অঞ্চল, গাছপালাও বিশেষ নেই। আমার বাবা ঠিক করেছিলেন, উদ্বোধন-ভাষণ নিজেই দেবেন। নিমন্ত্রিত ডিপ্লোমাটদের সঙ্গে, সকলের আগে, বাঁধের উপর দিয়ে হেঁটে যাবেন। অবশ্য আমার মা জিনেদা বাবাকে সাবধান ক'রে দিয়ে বলেছিলেন যে লুহাক-এলাকায় কিছু অস্ট্রালনিকিদের দৌরাত্ম্য চলছে। যাই হোক, বাবা ঠিক করেছিলেন, তিনি বাঁধের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যতক্ষণ না তাঁর

পায়ের নিচে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। তিনি নিজের শক্তির সঙ্গে বিদ্যুতের এক ধরনের সহমর্মিতা অনুভব করতেন।

আমি বাড়িতে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম, কারণ লুডি ভ্যানডের ভিসের সততাকে সন্দেহ করার কোনো কারণ ছিল না। লুডিকে আমি দিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পরিচালকের পদ। সে আমাকে কথা দিয়েছিল, আমার বাবা আর ডিপ্লোমাটদের বড় অংশ যখন যন্ত্রের শব্দ শোনার জন্য অপেক্ষা করবেন, সেই মুহূর্তেই বোমাটা ফাটবে। আমি নিশ্চিন্ত মনে নাদভিনার সঙ্গে কাউচে শুয়েছিলাম। নাদভিনা আমার হোমটাস্কের অঙ্ক কষে দিচ্ছিল। আমি অস্ট্রালনিকিদের কাছ থেকে লুট করে আনা তামাক দিয়ে আমাদের জন্য সিগার পাকাচ্ছিলাম। খুব ভাল তামাক, ভার্জিনিয়ার চেয়ে কম যায় না। মাঝে মাঝে নাদভিনা আমার মাথা টিপে দিচ্ছিল। কারণ আমি উদ্বোধনে না যাওয়ার জন্য ভীষণ মাথাব্যথার অজুহাত দিয়েছিলাম। আমরা অন্ধকার হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পরস্পরকে নিয়ে সময় কাটালাম। হঠাৎ রাস্তা থেকে খবরের কাগজওয়ালার চিৎকার শুনলাম। কাগজের বিশেষ সংস্করণ বিক্রি হচ্ছে। আমি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে নাদভিনাকে চুমু খেয়ে, ছুটে বাইরে গেলাম। কাগজের বিশেষ সংস্করণ এক বুড়ির হাত থেকে ছিনিয়ে নিলাম। তারপর আমার বাবার পড়ার ঘরে গিয়ে পর্দা টেনে, আনন্দে আত্মহারা হয়ে কাগজ পড়তে শুরু করলাম। 'অস্ট্রালনিকিদের জঘন্য হত্যাকাণ্ড'—এই হেডলাইন পড়ে আমি আনন্দে হাততালি দিলাম। নিজেকে শান্ত করতে একটা সিগারেট ধরালাম। পরের মুহূর্তে একটা ছবির উপর চোখ পড়ায়, আমি ভয় পেলাম! দেখলাম, আমি নিজেই পাথুরে মাটির উপর পড়ে আছি। সমস্ত শরীর যেন ভেঙে-চুরে গেছে। রক্তাক্ত মুখ, ছেঁড়া ইউনিফর্ম, দু'হাত পোড়া। পিছনের পটভূমিকা—বিধ্বস্ত বাঁধের ধ্বংসাবশেষ, তার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে জলের স্রোত। আমি স্তম্ভিত হয়ে ছবির নিচের লেখা পড়লাম। শেয়ালরা নাকি গোপন আক্রমণ করে বাঁধ উড়িয়ে দিয়েছে। আমার বীরত্বই অন্যদের প্রাণ বাঁচিয়েছে। আরো লেখা ছিল: তাঁর ছেলে নিজে বোমার কথা জানতে পেরে অন্যদের সাবধান করে দেয়। নিজের হাতে বোমা সরাতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দেয়। ইউর্গেন গরা বৃথা প্রাণ দেয় নি।

আমি আর পড়তে পারলাম না। শুধু আমার নিজের মৃতদেহের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমনই নিখুঁত ছবি যে আমিও কোনো ভুল ধরতে অক্ষম। আমি যখন গভীর চিন্তায় ডুবে আছি, গোপন দরজা দিয়ে আমার বাবা ঘরে

ঢুকলেন। দরজাটা আমি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। বাবার চেহারা দেখে মনে হল, পরিষ্কার হয়ে এসেছেন। ঘষতে ঘষতে হাতের চামড়া উঠে গেছে। আমাকে দেখে অবাক হলেন না। এক গেলাস 'বুটর মিম' খেয়ে ইসারায় আমাকে জানালেন, আমি ওঁর পড়ার টেবিলের উপর বসে আছি। 'ইউর্গেন, এই পড়ার টেবিলটা আপাতত তোমার পক্ষে বেশি বড়। এখনকার মতো স্কুলের চেয়ারই যথেষ্ট।' আমি এ-কথার মানে বুঝলাম, কিন্তু কোনো উত্তর মুখে এল না। চুপ ক'রে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তিনি এক গেলাস 'বুটর মিম' খেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। কাগজের বিশেষ সংস্করণ আর ছবি দেখে খুশি হয়ে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি ঠিক তোমার মতো দেখতে একজন ছেলেকে জোগাড় করা সহজ ছিল না। এমনই মিল যে তোমার মা পর্যন্ত তফাৎ বুঝতে পারবেন না। তাছাড়া লুকিয়ে তাকে মেরে ফেলার ব্যাপারটাও ছিল। কিন্তু দেখছ তো, সব ঠিকমতো হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে তুমি যে-তামাশা আরম্ভ করেছিলে, তারপর আমার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।

'লুডি ভ্যানডের ভিস,' আমি হতাশভাবে বললাম। 'লুডি তোমার ক্লাসের অন্য বন্ধুদের চেয়ে বেশি খারাপ নয়,' বাবা বললেন। 'ওরা সবাই ছিল আমার বিশ্বাসী চর। আমি খুব সহজেই ওদের নিজের দিকে আনতে পেরেছিলাম। মাথা গরম করে কাজ করতে গিয়ে তুমি একটা ব্যাপার ভুলে গিয়েছিলে। আমি ওদের জন্য ব্যাঙ্কে একটা অ্যাকাউণ্ট খুলে দিয়েছিলাম। তার থেকে ওরা যত খুশি হাতখরচের টাকা তুলতে পারত। তুমি কেবল ওদের বড় বড় পদে বসিয়েছিলে। সেটাই যথেষ্ট নয়!'

'হতভাগার দল!' আমি বললাম।

বাবা তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তুমি অনেকবার আমাকে আশ্চর্য করেছ বটে। এসব শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে এক হিসাবে আমার দুঃখই হচ্ছে। তোমার অস্ট্রালনিকিরা তোমাকে কী যেন নাম দিয়েছে? অস্ট্রাল-ভিনিয়ে, ফড়িং! আমার কাছে তুমি একটা গুবরে পোকা ছাড়া কিছুই নও। তবে আমাকে স্বীকার করতেই হবে, তোমার মতো চালাক নেতা অস্ট্রালনিকিরা আর কখনো পায় নি। এখন অবশ্য তুমি মরে গেছ। এই ছবি সে-কথাই বলে।'

এবার আমার আর সঙ্কোচ হল না। মুখ নিচু ক'রে, ফিসফিস ক'রে প্রশ্ন করলাম, 'আর মা?'

'তোমার মা কালো পোশাক পরছেন[১]। তিনি কিছুই জানেন না।' একথা

বলার পর বাবা একটা গুলিভরা রিভলভার বার করে আমাকে বললেন, তাঁর আগে আগে বেরিয়ে যেতে। আমি তাই করলাম। যে-প্রাইভেট সেল বাবা বিশেষ কারণে তৈরি করিয়েছিলেন, আমাকে সেখানে বন্দী করে রাখলেন। আমার প্রতিভা আর কোনো পদে কাজে লাগবে না! তবে জীবনের ছোটখাটো আনন্দ থেকে আমাকে এখানে বঞ্চিত করা হয় নি। আমার কাছে সেসবের অনেক দাম। এর থেকেই প্রমাণ হয়, আমাকে নিয়ে বাবার গর্ব আছে। এই পুত্র-গর্বই কি ভালবাসার এক ধরণের চিহ্ন নয়?

অনুবাদ ॥ সুদেষ্ণা চক্রবর্তী

১. শোকের চিহ্ন।

হাওয়ার্ড ফাস্ট

সিডনীর জন্য স্মারকলিপি

১

আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে সিডনীর স্মারকলিপি স্বল্প কথায় হবে না। বেশ খানিকটা লিখতে হবে। আমরা যারা তাকে ভালভাবে জানতাম সবাই মিলে তার সম্বন্ধে সংগৃহীত খবরগুলো খুঁটিয়ে দেখতে সুরু করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কাগজপত্র আমার হাতে দেওয়া হলেও ওগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারলাম না। আমরা যা যা পেয়েছিলাম তা দিয়ে কেন মোটে এক লাইনে সিডনীর জন্য স্মারকলিপি লেখা হয়েছিল তা এখন আপনারা সহজেই বুঝতে পারবেন।

আমাদের মধ্যে কয়েকজন সিডনী গ্রীনসপ্যানকে খুব ছোট থেকেই জানত। সে জন্মেছিল ১৯২৫ সালে ওয়াশিংটন হাইট্স্-এ। তার ছোটবেলা ওখানেই কেটেছিল। ছেচল্লিশ নম্বর পাবলিক স্কুলে সে পড়ত, পরে দ্য উইট ক্লিন্টন হাইস্কুলে যায় এবং তারপর ভর্তি হয় সিটি কলেজে। কিন্তু সিটি কলেজের পড়া সে শেষ করে নি। রোগা লম্বা, সরু সরু পা—এমনি এক ছোট্ট কিশোর ছিল সে। কোনোদিনই চেহারা, উচ্চতা বা স্বাস্থ্যে পুরুষোচিত হয় নি। অতিমাত্রায় পড়াশোনা করার ফলে অল্পবয়সেই সে স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি হারায় এবং শেষদিন পর্যন্ত ক্ষীণ-দৃষ্টি নিয়েই সে বেঁচেছিল।

এক দরিদ্র ইহুদি পরিবারে তার জন্ম। শীর্ণ ক্লান্ত মা ও সেলাই-মেশিনের কর্মী বাবার পাঁচটি সন্তানের একজন ছিল সে। বাবা প্রায়ই এক সোয়েটসপ[১] ছেড়ে আরেক সোয়েটসপে কাজ নিত। তার বাবার সোয়েটসপে কাজ না করলেও চলত। সে ইউনিয়ন সপগুলোতে চাকরি নিতে পারত এবং একথা সিডনী তাকে বলে বুঝিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা অল্পবয়সে দীর্ঘকালীন ধর্মঘটে কাজ হারিয়ে পনেরো মাস বেকার হয়ে বসে থাকার ফলে জীবনের সারবস্তু এবং হৃদয়টিকে হারিয়ে যেন এক জোড়াতাড়া-দেওয়া পদার্থে পরিণত হয়। তার ফলে যদি ধর্মঘট হয় তাহলে তার হাত থেকে রেহাই পাবে—এই মনে ক'রে দিনে সে দশ

থেকে বারোঘণ্টা সোয়েটসপে কাজ করত। সিডনীর মা ছিল ছায়ার মতো—এদিক-ওদিক চলাফেরা করছে, রান্না করছে এবং সব পরিষ্কার করছে ; কিন্তু শুধুই একটি ছায়া। তার ছেলেমেয়ে-অন্ত প্রাণ ছিল, কিন্তু প্রতিদানে কিছুই চাইত না, এমনকি ভালবাসাটুকুও নয়। ১৯৩২ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত সে এই রকমই ছিল। সিডনী সদ্য কলেজে ঢুকেছে এই সময়ে তার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুতে সিডনী এক বন্ধুকে লেখে, '…আমি দুঃখকষ্ট কিছুই অনুভব করছি না, শুধু রাগ হচ্ছে…।' মিঃ গ্রীনসপ্যান মুষড়ে পড়ে নামেই বেঁচে থাকে, পুরনো ঘড়ির দম ফুরিয়ে আস্তে, আরো আস্তে চলার মতোই তার কাজকর্ম চলছিল।

সিডনীর ভাইবোনের মধ্যে দু'জন মাত্র দীর্ঘজীবি হয়েছিল। সাতবছরের ছোট্ট ছেলে লিষ্টার ট্রামের তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। বড় বোন সিলিয়া মারা যায় মাষ্টয়েড্ রোগে। অ্যাড্রিয়ান এবং ফ্যানি এখনো বেঁচে আছে। অ্যাড্রিয়ান স্কুলশিক্ষক হয়েছে এবং বৃদ্ধ মিঃ গ্রীনসপ্যান সে জন্য গর্বিত। ফ্যানি একজন ফার-কর্মীকে বিয়ে করেছে। সে সিডনীর চেয়ে দু'বছরের ছোট, কিন্তু সে যখন ছোট্ট মেয়েটি ছিল সিডনী তখন তাকে সমীহই করত।

২

তার এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়েই বোঝা যায় যে 'বীর' বলতে যা বোঝায় কিংবা আমেরিকানদের মধ্যে 'বীর' বলতে যে-বিশেষ ধারণা আছে সিডনী গ্রীনসপ্যান সেরকমও ছিল না। যে-পরিবেশে সে বড় হল এবং যেখানে সে বাস করত সেটা ঠিক বস্তি না হলেও বস্তিরই কাছাকাছি ছিল বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে সে বড় ভীত সন্ত্রস্ত রোগা ছেলেটি ছিল। এই ছেলেটিই কিনা যুদ্ধের পর যুদ্ধ ক'রেই প্রাণ দিল! সে প্রায়ই ভয়ে ভয়ে থাকত এবং এই ভয়ের আবার সূক্ষ্ম তারতম্য ছিল। সে মৃত্যুকে, মার-খাওয়াকে এবং না-খেয়ে-থাকাকে অথবা পরীক্ষায়-পাশ-করতে-না-পারাকে ভয় করত। এইভাবে এক ভয় থেকে আরেক ভয় তার জীবনের সুতোয় গেঁথে গিয়েছিল এবং সে মেনেও নিয়েছিল ; ঠিক যেমনভাবে এগারো বছর বয়স থেকে প্রথমে ডেলিভারী বয়, তারপরে খবরের কাগজের হকার, এরপর একটি স্থানীয় ক্লাবের ক্যানভাসার, তারপরে ষোল বছর বয়সে রাস্তার কোণে রাজনৈতিক বক্তার কাজকে সে মেনে নিয়েছিল। তার বাবার মনের মধ্যে এক উজ্জ্বল আশা অনির্বাণ হয়ে জ্বলত—সিডনী আইন পড়বে। কিন্তু সিটি কলেজে এক ছাত্র বিক্ষোভে সিডনী যখন চোয়াল ভেঙে ঘরে ফিরল, তখনই তার বাবা

ছেলের ক্ষতবিক্ষত যন্ত্রণাকাতর দেহ দেখে মর্মাহত হয়ে বুঝলেন যে তার ছেলে এক মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী। আরো বুঝতে পারলেন যে তার ছেলে কোনোদিনই আইনজীবি, অল্ডারম্যান কিংবা অ্যাসেম্বলিম্যান, এমনকি স্কুলশিক্ষকও হতে পারবে না।

কিন্তু ভয় সিডনীকে মৌলিক চিন্তাধারার অধিকারী করে নি। এ-বস্তু অন্য ধাতে তৈরি এবং সিডনীর একটি ভিন্ন জগৎ ছিল, যে-জগৎ হারিয়ে যায় না। কেউ কেউ এমন ধাতুতে তৈরী যে 'সম্পূর্ণ'কে সকল দৃষ্টিকোণ দিয়েই দেখতে পায়, একদিক দিয়ে নয়। সরু গলি বা ছোট রাস্তা বা একটি পথ দিয়ে নানাভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যাওয়া যায় এবং শুধুমাত্র একটি সরু গলি অথবা একটি রাস্তা দিয়েই যাওয়া যায় না, সব রাস্তা অতিক্রম ক'রে তবেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছান যায়। এইসব পথই এগিয়ে নিয়ে যায়। সিডনীর সেই জগতেরই একাংশে তার স্বজনদের মধ্যে বড় হয়েছিল। যদি সে তার এই জগৎকে স্বীকার করে নিত তাহলে তার স্মারকলিপি লেখা অনেক সহজ হতো। কিন্তু সে স্বীকার করল না—সে জানতে চাইল। তার ছোটখাটো অস্থিসার শরীরে এমন এক প্রবল প্রাণশক্তি ছিল যা কোষের মিলনফল নয়—জীবনের সঙ্গে পরিচয়েরই পরিণতি। মৃত্যু জীবনকে ফাঁকি দেয়, প্রত্যাখ্যান করে এবং সিডনী যেসব দুর্ঘটনা দেখেছে সবই এই মৃত্যুরই অংশবিশেষ। তাই মাথা উঁচু ক'রেই সে জীবনের পথে যাত্রা শুরু করে। বলতে গেলে তার প্রবল প্রাণশক্তিই এর মূল। এই প্রাণশক্তিই সিডনীকে একপাশে সরিয়ে না রেখে সামনের সারিতে দাঁড় করায়।

তার বাবা মিঃ গ্রীনসপ্যান অনেকদিন পরে আমরা যারা তাঁকে জানতাম তাদের মধ্যে একজনকে বলেছিলেন, 'আমি তাকে বলেছিলাম, এতে কিছু ভাল হবে না। সে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে। তার উচিত হচ্ছে ভাল খাটিয়ে কর্মী হওয়া এবং ঝামেলা থেকে দূরে থাকা।'

সিডনী তো ঝামেলা চাইত না। ছোটবেলায় সে খুব কমই মারামারি করেছে বা মারামারিতে জিতেছে। সে শক্তসমর্থ ছেলে ছিল না এবং যতক্ষণ পারত মারামারি থেকে দূরেই থাকত। সে স্কুল ছাড়ার পর সর্বদাই একটা না একটা চাকরি করত এবং এমনকি সি. সি. এম. ওয়াই-এর মতো বিনাবেতনের কলেজে পড়ার সময়ও গরমের ছুটিতে কাজ করত। দু'বার সে গরমের ছুটিতে হাডসন স্ট্রীটে 'হোলসেল গ্রসারি ওয়্যারহাউসে' কাজ করেছিল, কিন্তু পরে ওখানে সংগঠনের কাজে জড়িয়ে পড়ে এবং চাকরি হারায়। তারপর আরেক গ্রীষ্মে কনে দ্বীপে এক

ম্যাজিসিয়ানের প্রদর্শনীতে তদারকির চাকরি পায়। আসল কথা হল সে কখনো ঝামেলা চাইত না এবং একথা যে সত্যি সেটা তাকে দেখলেই বোঝা যেত।

তার চেহারায় আঠারো বছর বয়সের থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি—প্রায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা, ওজন দেড়মনের কাছাকাছি, নিচু কাঁধ, খাড়া নাক এবং পাতলা বাদামী চুল। তার বাদামী চোখ দু'টি শান্ত এবং অনুভূতিশীল, দেখলেই মনে হতো সহানুভূতিতে কোমল; কিন্তু আবার ঐ চোখের দৃষ্টিতেই কাঠিন্য দেখে অবাক হতাম। শুধু তাই নয়, সিডনীকে যত জানা যাবে ততই অবাক হতে হবে।

যখন তার আঠারো বছর বয়স, সিটি কলেজের একেবারে নতুন ছাত্র, এমন সময়ে জেন অ্যালবার্টসনের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার প্রেমে পড়ে। উভয়ের পারিবারিক অবস্থায় ছিল আকাশপাতাল তফাৎ, কারণ জেনের বাবা ও মায়ের কিছু টাকা-পয়সা ছিল এবং তারা আদি আমেরিকান বলে গর্বিতও ছিল। তার ওপর জ্যানি ছিল (জেনকে এই নামেই ডাকা হতো) সিডনীর থেকে এক ইঞ্চি লম্বা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে প্রথমে একটু-আধটু খটামটি লাগলেও জ্যানিও তার প্রেমে পড়ে গেল। এটা যে কেমন ক'রে সম্ভব হল তা অন্য কেউ না বুঝলেও আমরা যারা সিডনীকে জানতাম বুঝেছিলাম।

জ্যানিকে যেদিন সে প্রথম তাদের অনেকদিনের বাসস্থল ছোট্ট অ্যাপার্ট-মেণ্টটিতে নিয়ে এল, তখন সেই অ্যাপার্টমেণ্টটি ছিল যেমন নোংরা তেমনই অগোছালো। কারণ ঘরের কাজে ফ্যানি একটুও পটু ছিল না, সে ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে চাইত, কিন্তু পারত না। তখন অ্যাড্রিয়ানও বিয়ে করেছে। বৃদ্ধ গ্রীনসপ্যান স্ত্রীর শোকে বোবা জন্তুর মতো মূক। জ্যানি এসে বৃদ্ধকে চুম্বন করল। তার ব্যবহার দেখে মনে হল সে যেন এ-পরিবারের কতকালের পরিচিত—মনে হল অনেকদিন সে ওদের সঙ্গে বাস করেছে। বৃদ্ধ কাঁদতে লাগল। জ্যানির মনে আছে যে তখন সিডনী খুব অপ্রস্তুত হয়েছিল এবং যখন জ্যানি বলল যে তার খিদে পেয়েছে তখন সিডনী তাড়াতাড়ি জ্যাকেট পরে দোকানে ছুটল। আর তারপর থেকেই জ্যানি ও বৃদ্ধটির সম্পর্ক পরিণত হল মেয়ে আর বাবার মতো।

তাদের প্রেমে পড়া এবং কলেজে মেলামেশার ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যের, কারণ সিডনী সময় পেত খুব কম। কলেজের পর সে একটা দোকানে কেরানির কাজ করত; ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিত। ১৯৩৪ সালে ইয়ং কমিউনিষ্ট লীগে যোগ দেয়। যাই হোক সে ও জ্যানি ঘনিষ্ট থেকে ঘনিষ্টতর হল। জ্যানিও ইউ. সি.

এল-এ যোগ দিল এবং এই নিয়ে তার পরিবারের সকলের সঙ্গে প্রচণ্ড মতবিরোধ হয়। এরপরই ১৯৩৫ সালে তারা তাড়াতাড়ি সিটি হলে বিয়ে সেরে ফেলে। কিন্তু এই ঘটনাটি তারা চার বছর গোপন রেখেছিল।

শুধু তার অন্তরঙ্গ আমরা কয়েকজনই এই বিয়ের খবর জানতাম। ১৯৩৪ সালে আমি সিডনীকে প্রথম দেখি। সহরে এক বিক্ষোভ মিছিলে তার মাথা লাঠির আঘাতে যখন ফেটে যায় তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। আমিই তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাই। ডাক্তার এসে যখন তার মাথায় সাতটি সেলাই করল তখনো আমি তার কাছে ছিলাম। সেই সময়েই প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে সিডনীর বাবা প্রশ্নটি তুললেন, 'কেন···কেন সে এই গোলমালে জড়াল?'

শুয়ে শুয়েই সিডনী উত্তর দিল, 'বাবা, এর জন্য চিন্তা কোরো না।'

'একটা ভাল ছেলে, আমার এমন ভাল খাটিয়ে ছেলে!'

'বাবা, আমি গোলমালে যাই না,' সিডনী শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'আমি কখনই গোলমালের মধ্যে যাই না। তুমি কি মনে কর, আমি আমার মাথা ফাটুক – তাই চাই?'

'কী যে বলব, জানি না,' মিঃ গ্রীনসপ্যান বললেন, 'তুমি দেখতে পাচ্ছ, ঐ কমিউনিষ্টরা যত গোলমালের সৃষ্টি করছে। তারা ঝামেলা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে না।' কিন্তু সিডনীর উত্তর, 'এই কি সুন্দর জগৎ? এই জগৎকে তুমি আমায় মেনে নিতে বলো?'

এরপরই সিডনীর পরিবর্তন হয়। তারা বলে কোনো ঘটনাই চিরস্থায়ী নয়। এভাবে যদি বলা যায় তাহলে একরকম। কিন্তু আমরা যারা ছেলেমানুষ নই এবং অভিজ্ঞ তাদের কাছে সিডনীর জীবন তো মামুলী ছকে ফেলা নয়। কোনো সাধারণ নিয়মাফিক অঙ্কের মতো এ-জীবনকে মেলানো যাবে না। তাকে বুঝতে হলে অন্ত দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আমার মনে পড়ে সিডনীর যখন উনিশ বছর বয়স, তখন সে একবার আমাকে বলেছিল, 'তুমি কি জান, আমি একজন পেশাদার বিপ্লবী!' যেন ঐ-কথাটা একমাত্র তার ক্ষেত্রেই সত্যি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাই-ই এবং তার অন্যান্য কাজও ঐ কথাই প্রমাণিত করে। হাজার হাজার বছর আগে – কি ঐতিহাসিক যুগেরও আগে – মানুষের মনে হতো যে-জগতে সে বাস করে সে-জগৎ স্থায়ী হতে পারে না। আর সত্যিই সে-জগৎ আজ আর নেই। তিন কোটি শহীদের রক্তে সে-জগৎ ভেসে গেছে, কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয় নি। সিডনী সেই জগতেরই মানুষ – যখন দূর, অতি দূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ শেষ হবে, যখন বন্দুকের কর্কশ আওয়াজ আর

শোনা যাবে না, যখন আনবিক বোমার মারাত্মক ধ্বংসের চিহ্ন বিলীন হয়ে যাবে, যখন যুদ্ধজাহাজগুলি সমুদ্রের তলায় কবরস্থ হয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকবে। তখনই সিডনীর প্রকৃত পরিচয় জানা যাবে, সে কী করতে চেয়েছিল তা সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে। তখনই সম্ভবত তারা সাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুই বিশ্লেষণ করতে পারবে।

'বিশ্রামের জন্য শুধু দু'টি সপ্তাহ পাহাড়ে সবুজ ঘাস ও পাখিদের মধ্যে কাটাতে চেয়েছিল, কিন্তু সে আর তা পেল না'—মায়ের মৃত্যুর অল্পদিন পরেই বাবার মুখে এইকথা শুনে সিডনীর মুখে যে কী ভাব ফুটে উঠেছিল তাও তারা সেদিন বুঝতে পারবে।

কিন্তু সিডনীর ঘৃণা—সে অতি তীব্র। যে-বস্তু মানুষকে অবনতি ও বিনাশের পথে নিয়ে যায় তার প্রতি প্রচণ্ড সাংঘাতিক ঘৃণাই তাকে তার কর্তব্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই স্পর্শকাতর শান্ত ধীর-মনা ইহুদিটি যখন কলেজ ছেড়ে স্পেনে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্রিগেডে'[২] যোগ দিল তখন আমরা যারা তাকে ভালভাবে জানতাম খুবই অবাক হয়েছিলাম। সে বন্দুককে ঘৃণা করত, অবিশ্বাস করত; বরঞ্চ আমরা ভেবেছিলাম যে সে খুব ভাল রাজনৈতিক উপদেষ্টা বা কমিসার হবে। অনেকে তাকে কমিসার বলতেও শুরু করেছিল। বাস্তবে কিন্তু আমরা ভুল করেছিলাম। এব্রো নদীর তীরে পিছু-হটার সময় তারা তাকে ক্যাপ্টেন-পদে বসিয়েছিল।

৩

সিডনীর ছয়-সাতজন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও সহযোদ্ধার মুখে এব্রো নদীর তীরে পিছু-হটা ও শেষ আক্রমণের কাহিনী শুনেছি। জ্যানি, তার বৃদ্ধ পিতা, ভাই অ্যাড্রিয়ান এবং বোন ফ্যানিকে লেখা চিঠি থেকে সে-যুদ্ধ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। চিঠিতে সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং তার সঙ্গীদের কথাও ছিল।

প্রথম যেদিন ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের সঙ্গে লিঙ্কন ব্যাটেলিয়ান তাদের পতাকা উত্তোলন করল—১৯৩৭ সালের সেই দিনটি কেমন ছিল একবার ভেবে দেখুন! মাদ্রিদই কি ফ্যাসিবাদের সমাধিভূমি হবে! যেসব ছেলেরা পুলিশের রিভলভার ছাড়া আর কোনো মারাত্মক অস্ত্র দেখে নি, তারাই যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। ক্ষীণদৃষ্টি অস্থিচর্মসার ছেলের দল শ্রমিকের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্ধর্ষ মেসার্সস্মিট্‌স্

এবং প্যানজার-বাহিনীর মোকাবিলা করতে এগিয়ে গেল। শেষ যুদ্ধ হল স্পেনের বৃক্ষশূন্য পাহাড়ে এবং খাদে। ফ্যাসিবাদের ধ্বংসস্তূপে জন্ম নিল নতুন সাহসে-ভরা পৃথিবী! আমরা বিশ্বাস করি এটাই ছিল প্রকৃত পথ।

১৯৩৭ সালের প্রারম্ভে সিডনী গ্রীনসপ্যান তার দলের সঙ্গে স্পেনে আসে। পরের বছর এপ্রিলের মধ্যে এব্রো নদীতীরে পিছু-হটার সময় সে দু'বার অল্পবিস্তর জখম হয়। পরে সে লেফটেন্যাণ্ট হল; চোখ বুজে কেমন ক'রে মেসিনগান চালাতে হয় শিখল। আরো শিখল—যদি বুঝতে পারা যায় কী করা উচিত—তাই-ই করতে হবে। কারণ মনপ্রাণের নির্দেশে চলা—'কী করি কী করি' ভেবে সময় নষ্ট করার থেকে ভাল। কিন্তু বাইরে সে আগের মতোই ছিল। তখনো সে শিখেই যাচ্ছিল। কাগজে আমেরিকার শ্রমিকদের খবর পেলেই পড়ত। ভবিষ্যতের কথা যখন সে বলত তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বুঝিয়ে দিত, এই যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হবে এবং আশা করত দক্ষিণে গিয়ে সে একজন শ্রমিক-সংগঠক হবে আর জ্যানিকে নিয়ে সেখানেই ঘর বাঁধবে।

১৯৩৮ সালে সেই ঐতিহাসিক পশ্চাদপসরণের প্রথম দিকে সে লিঙ্কন ব্যাটেলিয়নে ছিল। কিন্তু তারা কেউ তখন বুঝতে পারে নি যে তারা পিছু হটছে। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থির হল, যেভাবেই হোক এই বাহিনীকে ঘুরিয়ে দিতে হবে এবং ব্রিগেড কমিশনার ডেভ ডোরান লিখিতভাবে জানান যে পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত বাহিনীকে এগিয়ে যেতেই হবে। সুতরাং লিঙ্কন ব্যাটেলিয়ন এগিয়ে চলল, তারা জানলও না যে সর্বত্রই সৈন্যের সারি ভেঙ্গে যাচ্ছে, ওপরে নিচে সর্বত্রই বিরাট রিপাবলিকান ব্যাটেলিয়ন সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছু হটছে। জ্যানিকে লেখা সিডনীর একটা চিঠি থেকে এ-ব্যাপারে অনেক বিষয় জানা যায়:

...চিন্তা কোরো না, কেমন! আমি এখন ভালই আছি। কিন্তু এক সপ্তাহ আগেও অবস্থা খারাপ ছিল এবং আমাদের ব্যাটেলিয়নের অধিকাংশ যোদ্ধাদের হারিয়েছি। তুমি এ-বিষয়ে কাগজে পড়েও থাকতে পার। ঠিক কীভাবে এ-ঘটনা ঘটেছিল তাই লিখছি। আমাদের কমিসার জনি গেট্‌সকে তোমার বোধহয় মনে আছে। ওকে তুমি 'মিল্‌টির' বাড়িতে দেখেছ। সে-ই আমাদের জানালো যে জেনারেল এগিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন এবং আমরা সামনের দিকে এগিয়েই চললাম। প্রথমে আমরা খুব ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু ফ্যাসিস্তদের একটা জলের ট্রাক আমরা দখল করতে পারায় অবস্থা অনেকটা ভাল হয়। আমরা ঐ-মুহূর্তে যতটা সম্ভব গোলাবারুদ নেওয়া যায় তাই নিয়ে দ্রুত এগিয়ে

যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমাদের যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় আমরা যে সর্বত্র পিছনে হটে যাচ্ছি জানতাম না। আমি জানি না এ জন্য কাকে দোষ দেব; কাউকেই এখন আমি দোষী সাব্যস্ত করছি না।

যাই হোক, বিকেল তিনটে পর্যন্ত আমাদের দুর্বার, দুঃসাহসী যাত্রা অব্যাহত ছিল। তারপর কয়েকটি জলপাই গাছের নিচে বিশ্রাম করতে করতে আমরা বুঝতে পারলাম, কোথাও একটা ভুল হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আগত ব্রিগেড অপারেশন অফিসার বব মেরিম্যান এগিয়ে এসে মরিয়ার মতো বলল যে প্রকৃত ব্যাপারটা কী তা দেখতে হবেই। আমি বলতে চাইছি যে এই অনভিজ্ঞ সোজা-বাড়ী-থেকে-যুদ্ধক্ষেত্রে-আসা ছেলের দল নিয়েই আমরা সোজাসুজি আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলাম। তখন আমরা প্রায় তিনশো জন ছিলাম। আমরা গান্দেসা পাহাড়ে উঠলাম এবং নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে ফ্যাসিস্তরা রাস্তায় রাস্তায় আক্রমণ চালাচ্ছে। কিছু বাড়ী জ্বলছে, কিন্তু তখনো সহরের অনেক অঞ্চল আমাদের লোকে-দের দখলে। কোনোরকমে নিজেদের আত্মরক্ষাকারী দলের সাহায্যে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মেরিম্যান ভেবেছিল এবং আমরা পঁচিশজন ছেলের একটি দলও পাঠিয়ে দিলাম। তারা অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে—গেল একেবারে সবাই। এ যেন শেষের শুরু, প্রথম দফার শেষ। আমরা পিছিয়ে দু'টি পাহাড়ের ওপর উঠলাম, একটায় আমেরিকানরা, অন্যটায় স্পেনীয় এবং অন্যান্যরা। তখন শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে অশ্বারোহী সৈন্যদল পাঠালো এবং আমরা তাদের বিধ্বস্ত ক'রে পাল্টা জবাব দিলাম। অবশিষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যদল নেমে গিয়ে সার বেঁধে রইল এবং প্রায় সন্ধ্যের সময় গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে আবার আক্রমণ করল। ভার্জিনিয়া মিলিটারি ইন্‌স্টিটিউটের ভার্নন সেলবী আমাদের বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে বার করেছে—দেখা গেল, করবেরার দিকটা তখনো উন্মুক্ত।

এখানেই আমরা আমাদের সবাইকে হারিয়েছি, সেই সঙ্গে হারিয়েছি স্পেনীয়দেরও! রেড ইণ্ডিয়ানরা যেমন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একক সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়, আমরাও দেশের ভিতর দিয়ে রাত্রে ঠিক সেইরকম চলেছি। অতিরিক্ত ক্লান্তির ফলে কেউ ঘুমোলে আর উঠতেই পারত না। তারা ঝোপঝাড়ের মধ্যে হামাগুড়ি মেরে ঘুমোত, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা তাদেরও হারিয়েছি। আমাদের ধারণা, তারা সেখানেই আছে, কিন্তু আমরা তাদের ফেলে এগিয়ে গিয়েছি। এজন্য কী করে নিজেদের ক্ষমা করি? তারপর আমরা করবেরাতে সমস্ত শক্তি একত্র করে এক জার্মান রেডিও ষ্টেশনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারা

গ্রেনেড আর মেশিনগান দিয়ে আমাদের ছিন্নভিন্ন ক'রে দিল। মেরিম্যান এবং ডোরান ওখানেই মারা যায়, কিন্তু আমি তখনো সেটা জানতে পারি নি। এই-ভাবেই আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই। আমি স্মিথ ও গোল্ডস্টাইন নামে দু'টি ছেলের সঙ্গে রওনা দিলাম। কোনোরকমে আমরা এব্রো নদীর পারে এলাম। ওরা দু'জনেই আহত হয়েছিল। পরিদিন রাত্রিতে পুরো এক ডিভিশন ঘুমন্ত ইটালিয়ান সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে আমাদের হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র ষাটটি ছেলে এব্রো নদী পার হতে পেরেছিলাম—শুধুমাত্র ষাটজন…!'

সিডনী তাকে লেখে নি যে আহত স্মিথ এবং গোল্ডস্টাইনের শুশ্রূষা সে-ই করেছে এবং অনেক সময় তাদের বহন করেছে, এব্রো নদী পার করেছে কাঁধে তুলে নিয়ে। সে জ্যানিকে লেখে নি যে পরের দিন আবার এব্রো নদী পার হয়ে ফিরে এসে আহত অ্যাবেল ক্লার্ককে দেখতে পায়, তার ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা করে এবং তাকে নিয়ে নদী পার হয়ে ফিরে আসে। কী করে সে পারল, কোথা থেকে তার শক্তি এল সে তো সহজে বলা যাবে না। সে তাদেরই সমগোত্র যারা অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য ক্ষমতার অধিকারী। এই মুহূর্তে এটি তার স্মারকলিপি বা তার পরলোক-গত আত্মার প্রশস্তি হিসাবেই একটু বিশদভাবে বলছি। সে একবার এক বোতল পেট্রোল আর একটি কম্বল দিয়ে একটা ট্যাংক থামিয়েছিল এবং তার ভাঙ্গা চশমা সত্বেও ক্ষীণদৃষ্টির ফলে আলোআঁধারের মধ্যে দু'সপ্তাহ যুদ্ধ করেছিল।

এব্রো নদীর পারে শেষ আত্মরক্ষার জায়গাটিতে আসার পর ন'দিনের শেষে সিয়েরা কার্বোলামে পৌঁছল এবং তখন সে প্রায় গান্দেসা জয় করে ফেলেছে। সে তখন একজন ক্যাপ্টেন—এব্রো পার হয়ে পিছু-হটার সময়েই তাকে ক্যাপ্টেন করা হয়। তার দলকে একটা টিলার পাথুরে জায়গায় দিন কাটাতে হয়। এরপর তার দলকে শত্রুর গোলাবারুদের মুখে যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন তাদের কতগুলো বালির বস্তা ও খোলা আকাশের নিচে রুক্ষ পাহাড় ছাড়া আত্মরক্ষার আর কিছুই ছিল না। পাহাড়টি আবার জয় করার জন্য সে তিনদিনে বারো বার আক্রমণের নেতৃত্ব করে। কিন্তু পরে একবার এই বিষয়ের কথা বলতে গিয়ে সে শুধুমাত্র উল্লেখ করেছিল যে অল্প বিশ্রামের পর নিজেদের জায়গায় ফেরার পথে তারা ডিমিট্রিফ ব্যাটেলিয়নকে (স্লাভ ব্যাটেলিয়ন) দেখতে পায়। সিডনীদের ব্রিগেডের প্রত্যেক ছেলেই জানত যে স্লাভ ব্যাটেলিয়ন হচ্ছে সবার সেরা, তারা ইস্পাতের মতো দৃঢ় এবং কোনো শক্তিই তাদের কাবু করতে পারবে না। যখন এই ডিমিট্রিফ ব্যাটেলিয়ন হেরে গেল এবং লিঙ্কন ব্যাটেলিয়নকে তাদের শূন্যস্থান পূরণ করতে দেখল তখন

তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল এবং অঝোরে কাঁদতে লাগল। বিশালদেহী, লালচুল স্লাভরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। তারপরই তারা আমেরিকানদের সঙ্গে যোগ দিল এবং সবাই মিলে একসঙ্গে মাত্র কয়েকটা রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে শত্রুদের প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত বিরাট গোলন্দাজ-বাহিনী এবং সেই আকাশভরা প্লেনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো।

তারপর আর কখনো সিডনী ভয় পায় নি। সে বলত যে ঐ ঘটনা মনে করলেই আর তার ভয় করত না। এরপর বেশিদিন যেতে না যেতেই সে মুরদের[৩] হাতে ধরা পড়ল। ওখানে যেসব ছেলেরা ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন কেমন ক'রে সে ধরা পড়েছিল ঠিক ঠিক মনে রেখেছে। ওরা ভেবেছিল তাদের ডানদিকের স্পেনীয়দের দল ভালমানুষ, ফ্যাসিস্ত নয়। তাদের ব্যাটেলিয়নের একদল পাহারা দিতে বের হয়েছিল। সিডনীও ছিল এই দলের সাথে। জিম লার্ডনারও তার সঙ্গে ছিল, লার্ডনার ঐখানেই মারা যায় এবং সিডনীকে মুরেরা ধরে নিয়ে যায়।

৪

জেলের সেই দিনগুলো সম্বন্ধে সিডনী কথা বলত কম। যে কোনো দেশেই জেলের চরিত্র একই রকম। ইঁদুর, ছারপোকা, উকুন এবং নিঃসঙ্গতা আর একঘেয়েমী—যা মানুষের মানসিক-মৃত্যু ঘটায়—এসবই জেলের আন্তর্জাতিক চরিত্রের অন্তর্গত। কিন্তু যেখানেই ফ্যাসিস্তরা গেছে, সেখানেই তারা এ-ব্যাপারে এক ধাপ ওপরে। মুরেরা সিডনীর ডানহাতের আঙ্গুলগুলো ভেঙ্গে দিয়ে মজা উপভোগ করেছে। সিডনী আর কোনোদিন ডানহাত ব্যবহার করতে পারবে ভাবেও নি। তারা সে-যে ইহুদি একথা জানামাত্রই তাকে নাৎসিদের হাতে তুলে দেয়। এই নাৎসিরা মুরদের চেয়েও সৃজনশীল এবং তারা স্পেনে জার্মানবিরোধী আত্মগোপনকারী যোদ্ধাদের জন্য 'দাঁড়িয়ে-থাকা-সেল' তৈরি করেছিল। এই 'দাঁড়িয়ে-থাকা-সেল' চওড়ায় আড়াই ফুট এবং দেড় ফুট গভীর। তোমার পা অবসন্ন এবং মন অসহ্য না-হওয়া পর্যন্ত এর ভেতরে তুমি দাঁড়িয়ে থাকবে এবং তারপরই তুমি পড়ে যাবে, কিন্তু পড়বার জায়গাও সেখানে নেই। ছয় সপ্তাহ ধরে তারা সিডনীকে সপ্তাহে দু'দিন 'দাঁড়িয়ে-থাকা-সেলে' রাখত। তারা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা নিয়ে দেখত কেমন ক'রে একটি ছোটখাটো, ক্ষীণদেহ যুবক এই যন্ত্রণা সহ্য করে। ইহুদিদের রক্ত এবং ইহুদিদের প্রতিরোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব বিশেষ মত ছিল। ঐ মতগুলোকে বাস্তবে পরীক্ষা করাটা সর্বদাই তাদের বেশ রোমাঞ্চকর মনে হতো।

জেল হতে সিডনী কেমন ক'রে পালিয়েছিল এখনো তা বলা যাবে না ; ফ্রাঙ্কো যে এখনো স্পেনে রক্তচোষা মাকড়সার মতো বসে আছে, আমাদের কংগ্রেসে ভদ্রলোকেরা এখনো এ-বিষয়ে তর্কই করে চলেছেন। কিন্তু সে পালাতে সমর্থ হয়েছিল। পালিয়ে সে সমুদ্রতীরে আসে এবং সেখান থেকে একটি নৌকা তাকে ফ্রান্সে পৌঁছে দেয়। আমেরিকায় যখন সে ফিরে এল, তখন তার বয়স মাত্র চব্বিশ বছর, অথচ তখনই তার চুলের রঙ সাদা হতে শুরু করেছে। জেলের কথা সে বেশি বলতেও চাইত না। তার প্রধান লক্ষ্য তখন কী ক'রে তার ডান হাতখানাকে ব্যবহারযোগ্য করা যায়। শেষ পর্যন্ত অস্ত্রোপচার সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় তার মনের অবস্থা অনেক ভাল হয়। তিনমাস তার হাতে প্লাস্টার ছিল, ঐ সময়েই সে ও জ্যানি বাইরে গেল। সিডনীর জীবনে ঐ একটানা সময়ে শুধুমাত্র বসে বসে জীবনের মাধুর্যকে ভোগ করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজ ছিল না।

ভাল জায়গায় সে ভাল কাজ পেতে পারত। তার অনেক বন্ধু ছিল, অনেক লোকই নিজেদের তার কাছে ঋণী মনে করত। জ্যানিকে সে তার অনেকদিনের স্বপ্ন দক্ষিণে সংগঠন করার কথা বলে এবং জ্যানিকে নিয়ে সেখানে শেষ পর্যন্ত গেছিল।

৫

সিডনীর স্মারকলিপি শুধুমাত্র ব্যাখ্যাই তো করবে না, তা বাঙ্ময়ও বটে। কিন্তু কেমন ক'রে বোঝানো যাবে—একটি মাত্র মানুষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আন্দোলনের অর্থটা কী? খবরের কাগজ, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সমগ্র জাতির প্রেস নানাভাবে বলছে যে সিডনী গ্রীনসপ্যানের মতো লোকেরা কেন ঘুষখোর, অসাধু, স্বার্থপর এবং মানবজাতির শত্রু! এবং এরকম আরো কত কথা। অতএব তার উত্তরে একজন সিডনী সম্বন্ধে আর কী-ই বা বলতে পারে। শুধুমাত্র এইটুকুই বলা যায় যে যতদিন একটি মাত্র মানুষও দাস থাকবে, অত্যাচারিত হবে বা অপরের দ্বারা শোষিত হবে ততদিন সিডনীর বিশ্রাম নেই। সে দক্ষিণে গিয়ে ভাগচাষীদের সংগঠনের আন্দোলনে যোগ দিল। সে সেখানে চৌদ্দ মাস কাটিয়েছিল এবং ঐ এলাকাতেই আগে তিনজন সংগঠক নিহত হয়েছে—ওখানেই তারা একদিন অদৃশ্য হয়েছে, সোজাকথায় বলা যায়, পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ঐ কাজে সে সপ্তাহে তিরিশ ডলার পেত। তিনবার মাথার ওপর কুখ্যাত ক্লানদের[৪] গুলি করার শাসানি ছিল। কোনো গৌরব, বাহাদুরি, অর্থ কিংবা

খ্যাতির প্রত্যাশা সে করে নি। সহরতলীর ছোট্ট জায়গায় আমাদের একটা সংগঠন ছিল, যেখানে সে আর জ্যানিও থাকত। একবার আমাদের মধ্যে একজন সিডনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেন সে এভাবে জীবন কাটাচ্ছে।

সিডনীর উত্তর, 'এ তো কিছুই না। আমি স্পেনে পার্টির লোকদের সাথে একসঙ্গে লড়েছি। তারা সেখানেই শেষ শয্যা নিয়েছে। আমি তাও বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম।'

'কিন্তু কেন তুমি একাজ করেছ?'

'কোনো মানুষ কোনো কাজ কেন করে? চলমান জীবনের ঘটনাবলী হতে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এই অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ও নিজস্ব বোধশক্তিই তাকে এসব কাজে উৎসাহিত করে।'

তখন আরেকজনের প্রশ্ন, 'মনে করো, তোমরা জয়লাভ করলে এবং সেই নতুন সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টি করলে। তুমি কি মনে করো, তখন তোমায় কেউ মনে রাখবে?'

সিডনী ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'এটা একটা এমনকিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। কিন্তু তারা মনে রাখবে।'

একবার অনেকদিন আগে, আমাদের তখন খুবই অল্প বয়স, সিডনী এবং আমাদের অনেককেই বেকারদের বিক্ষোভমিছিলের জন্য কোর্টে ধরে আনা হয়। একজন ম্যাজিস্ট্রেট সিডনীকে ঠিক ঐ একই প্রশ্ন করেছিল—কেন সে এপথ বেছে নিয়েছে। ঐ সময়েই আমি প্রথম উপলব্ধি করি কেমন ক'রে একটি মানুষ দৃঢ়তা ও আনন্দ দিয়ে জীবনের সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করে। কারণ যখন সিডনী রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে স্বাভাবিকভাবে ম্যাজিস্ট্রেটকে বলল, 'আপনি যা করেন সে-সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তো করেন না। কারণ আপনি জানেন আপনাকে করতেই হবে এবং এইজন্য আপনাকে বেতন দেওয়া হয়। আপনি চাইছেন আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিই আমি যা করি তা কেন করি। আমি কি আপনাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ শোনাতে পারব? আমি আমার বেতন নিজের মুদ্রায় পাই!'—এই বলে সে তার শূন্য হাতটি বাড়িয়ে দেয়।

এইতো খুব বেশিদিন আগে নয়, আমি একবার তার বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বৃদ্ধ নামেই বেঁচে—একেবারে ভেঙ্গে-পড়া জরাজীর্ণ শরীর। তবুও সে তার কাজ করে চলেছে এবং নানা কথাবার্তার পর সে আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'কেন শান্তভাবে জীবন যাপনে সিডনী সন্তুষ্ট হল না?' বৃদ্ধর সেই জ্বালচে চোখ, বেঁকে-যাওয়া পিঠ, ফোলা ফোলা পা দেখতে দেখতে সিডনীর সাথে

প্রথম পরিচয়ের দিনটির কথা মনে পড়ছিল। আমি উপলব্ধি করেছিলাম বৃদ্ধ যেমন ভাবে বলছে তেমন ক'রে বরাবর শান্তিতে বাস করতেই সিডনী চেয়েছে। অন্য মানুষের মতোই মহান জীবনের স্বাদ স্বচ্ছন্দে এবং গভীরভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সেই মুহূর্তে পুরো উত্তরই পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে তা ভুলে যাই।

৬

পার্ল হারবারে জাপানী আক্রমণের পর, সিডনী প্রায় একরকম কৌশল করেই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে সক্ষম হয়। বয়সে তরুণ হলেও তার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। কিন্তু সে মনমাউথের একজন পরিচিত সৈন্যবাহিনীর ডাক্তারের সাহায্যে ঢুকতে পারল। তার চোখের এহেন খারাপ অবস্থা এবং তার মাথার যন্ত্রণার জন্য তাকে তারা 'আধ-কপালে' বলত, কিন্তু এ-সবই তো ফ্যাসিস্তদের অমানুষিক অত্যাচারের ফল! তাকে চিকিৎসা বিভাগে দেওয়া হয় এবং জাহাজে করে জর্জিয়ার একটি ক্যাম্পে পাঠানো হয়। দেড় বছরের মতো সে জর্জিয়ার ক্যাম্পে ছিল। তিনবার সে পদাতিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করে। অনেকবার দীর্ঘদিন ধরে শুধুমাত্র জ্যানি ছাড়া আমরা কেউ তার খবর পেতাম না। আমরা সবদিকেই খোঁজ করতাম, কারণ যুদ্ধ চলছিল পৃথিবীর অনেকটা অংশ জুড়েই। ঐ সময়েই তার একটি চিঠি আমি পাই, তাতে সে লিখেছিল :

'এদেশ স্পেনের মতো নয়। কয়েকজন অফিসার আমার অতীতের ভূমিকা জানতে পারে। আমি চুপ করে থাকি নি আর থাকতেও চাই নি। দিনেরাত্রে ঐ অফিসাররা আমায় শান্তিতে থাকতে দেয় নি। সবসময় বলত—তুমি এই, তুমি তাই, তুমি একজন কমিউনিস্ট বদমাইস এবং তোমাকে স্পেনে যুদ্ধ করার জন্য কত টাকা দেওয়া হয়েছিল?—ইত্যাদি। আমি সর্বদাই যোদ্ধার ভাব দেখিয়ে রয়েছি। যুদ্ধের সময় মানসিক দিক দিয়ে বিচার করলে সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্র সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

যুদ্ধে চিকিৎসক হিসাবে সে ইংলণ্ডে যায় এবং ইংলণ্ড থেকে যায় উত্তর আফ্রিকাতে। ওখানে ফার্স্ট রেঞ্জার্সের জনি গ্রাহামের কাছে সে ছুটে গিয়েছিল—যে জনি গ্রাহাম আগে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে ছিল। জনি আমাকে পরে বলেছিল যে সেটা এমন একটা অদ্ভুত যোগাযোগ যা জীবনে খুব কমই ঘটে। জনির উরুতে সাংঘাতিকভাবে গুলির আঘাত লাগায় সে পড়ে যায় এবং বালির ওপর শুয়ে সে গুলি বার করবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে ভয়ে

সে আত্মশক্তি হারিয়ে ঘামছিল। ঠিক এমন সময়ে সেই ছোটখাটো চিকিৎসক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল এবং 'আমি চেষ্টা করে দেখি' বলে স্প্লিন্টার বের করল, ওষুধ লাগালো। যখন সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল তখন জনি তার মুখ দেখতে পায় এবং চিনতে পারে। ওকে দেখেই জনি পরম শান্তি পেল এবং সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যালো, সিডনী।'

সিডনী বলল, 'আমি চিকিৎসা বিভাগে আছি। এটা কিরকম যাচ্ছেতাই ব্যাপার দেখ, আমি কিনা চিকিৎসা বিভাগে!'

'আমি কিন্তু খুব খুশি যে তুমি চিকিৎসা বিভাগে রয়েছ,' জনি বলল। কিন্তু ঐটুকুই। তারপর কয়েকজন স্ট্রেচারবাহক এল এবং তারা আহত জনিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে জনির মনে হয়েছে যে ওখানে সিডনীর উপস্থিতির অর্থই হল সিডনী আবার স্পেনের সীমান্তের সেই বৃক্ষলতাশূন্য পাহাড়গুলোকেও অতিক্রম ক'রে এসেছে! সিডনীর মতো মানুষের কাছে কোন শেষ তো নেই-ই, আছে শুধুই শুরুতে বার বার ফিরে আসা।

তারপরের মাসগুলোতে তাকে প্রথমে সিসিলিতে এবং পরে ইটালিতে পরিচিত একজন দেখতে পায় এবং তারপর থেকে পরপর যারা তাকে আগে কখনো চিনত না তাদের কাছে সিডনী এক রূপকথার মানুষে পরিণত হয়। স্পেনে এবং আমেরিকাতে সে যে-কাজ করেছিল তার দ্বারা কোনো রূপকথার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু ইটালিতে যেসব মানুষের সামনে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না, যারা জানত না কেন তারা যুদ্ধ করছে, কোথায় তারা যাচ্ছে, একটি পাহাড় অতিক্রম করার পরই আর একটি পাহাড় যাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতো এবং নাৎসিরা প্রথমদফার যুদ্ধশেষে আত্মসমর্পণ করলেও অন্যান্যদের সঙ্গে যুদ্ধশেষ যাদের তখনো হয় নি—সেইসব মানুষের সামনে এক শান্ত পটভূমিকা এবং স্থির লক্ষ্যের উদয় হল এবং এইসব মানুষের কাছেই সিডনী গ্রীনসপ্যান এমন একজন যে আলাদা জগতের এবং অন্য রকম লড়াই-করা মানুষ। কেউ এ-পর্যন্ত যে-প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নি, সে তাদের তা দিয়েছে এবং মানুষের মনে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। একথা প্রায়ই এবং ক্রমাগতই অনেক লোকের মুখে এবং আরো বেশি লোকের মুখে শোনা যাবে: 'আমি সিডনী গ্রীনসপ্যান নামে একটি মানুষকে দেখেছি, যে ছিল একজন চিকিৎসক এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় আমার মনে হয় সে ছিল একজন প্রগতিশীল...' ইত্যাদি।

তাদের মধ্যে যে আমেরিকায় ফিরে এসে জ্যানিকে দেখাশোনা করত, সে

প্রায়ই বলত, 'প্রায়ই তুমি ভয় পাবে, কিন্তু যখনই তুমি সিডনীর সাথে আলোচনা করবে, দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে।'

৭

১৯৪৪ সালের একেবারে প্রথমদিকে সে নিহত হয়। তার সম্বন্ধে আমেরিকার সামরিক বিভাগ কর্তব্যের বহির্ভূত মনে ক'রে তাদের ভাষায় শুধুমাত্র উল্লেখ করে :

প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস সিডনী গ্রীনসপ্যান, চিকিৎসা বিভাগ

১৯৪৪ সালের ২৪ জানুয়ারী ইটালির কারানোর কাছে শত্রুর মেশিনগানের গুলিবর্ষণের মধ্যে ষাট গজ হামাগুড়ি দিয়ে একজন আহত পদাতিকের প্রাথমিক চিকিৎসা করে এবং তারপর আরো পঞ্চাশগজ এগিয়ে গিয়ে আরো দু'জন আহত পদাতিকের শুশ্রূষা করে। একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় এবং তাকে নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তারপর সে দ্বিতীয় আহতটির কাছে ফিরে এসে তার চিকিৎসা করে। আহতটিকে শুশ্রূষা করার সময়ই তার শরীরের পিছনের ডানদিক মেশিনগানের গুলির আঘাতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় গুলির আঘাতে বাঁদিকেও ঐ দশা হয়। শুধু তাই নয়। নিজের প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ সে বন্ধ করতে পারেনি এবং এই অবস্থায় সে আহত সৈন্যর সেবা শেষ করে এবং তাকেও একটি নিরাপদ স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। নিজের ইউনিটের সঙ্গে আবার যোগাযোগের জন্য ষাট গজ পথ হামাগুড়ি দিয়ে যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রচণ্ড রক্তপাতের ফলে অতিরিক্ত দুর্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত আর এগতে পারে নি। আঘাত এবং অধিক রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু হয়।

এ-ধরনের ব্যাপার সামরিক বাহিনীর জনসংযোগ বিভাগ মৃত্যু হলে যেভাবে উল্লেখ করে সে-ভাবে বলাই সবচেয়ে ভাল। তারা কোনো কারণ বা বিষয়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামায় না। অন্যেরা আজকাল যে-ধরনের লিখছে তার চেয়ে তারা সিডনীর মতো মানুষের ব্যাপারে অনেক বেশি তথ্যনির্ভরশীল। সিডনীর নাম কংগ্রেশন্যাল মেডাল অফ অনারের জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু তারা তার শুধু অতীতকেই দেখল এবং অনেক আলাপ-আলোচনার পর ওখানেই ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি ঘটল।

আর ওটাও সিডনীর স্মারকলিপি থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। একদিন

অন্য পুরস্কার আসবে, হবে অন্য লেখাও এবং এমন একসময় আসবে যখন সব পাথর, সব প্রান্তর এবং বিধ্বস্ত শহরগুলো নাম-না-জানা মানুষদের কাহিনীতে বাঙ্ময় হয়ে উঠবে। তারা সিডনী গ্রীনসপ্যানকে ইটালির মাটিতে, যে-মাটি পবিত্র, সেখানে সমাধি দিয়েছে। স্পেনের মাটিও ভাল এবং ভাল আমেরিকার মাটি, সোভিয়েত রাশিয়ার মাটি এবং চীনের মাটিও। যদি সিডনীর ইচ্ছামতো হতো, তাহলে আমার মনে হয় না যে এমন দেশ আছে, যে-দেশ তার নিজের কাছে স্বদেশ বলে মনে হতো না।

আমরা যারা তাকে ভালভাবে জানতাম তাদের মধ্যে কয়েকজন তার জন্য একটি স্মারকলিপি লিখব ঠিক করি। যেসব কাগজ সে পড়ত এবং ভালবাসত তার ব্যক্তিগত কলামে অনেক কালো মোটা দাগ দেওয়া বাঁধানোর মতো লাইন ছিল। যে-নামেই সেগুলো থাকুক না কেন সবই ছিল ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর। এইভাবে আমরা যা জানি এবং যা মনে আছে, সবগুলো একজায়গায় করতে পেরেছি। যতই লিখি না কেন, যতই বলি না কেন সিডনী যে কী দিয়ে গড়া—সেটা আমরা তো বলতে পারলাম না। তাই অল্প কয়েকটি কথায় লিখলাম :

ফ্যাসীবিরোধী সিডনী গ্রীনসপ্যানের স্মৃতিতে, যে মানুষের
জন্য সংগ্রাম করে গেছে—তার কমরেডদের তরফে।

অনুবাদ ॥ সৌদামিনী দাস

১. সোয়েটসপ : আমেরিকার ছোট অস্বাস্থ্যকর কারখানাগুলিকে এ-নামে অভিহিত করা হয়।

২. ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড : স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬-৩৮) অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

৩. মুর : আরবীয় ও স্পেনীয় মিশ্রজাতি।

৪. ক্লান (Ku Klux Klan) : আমেরিকার কুখ্যাত বর্ণদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ গোষ্ঠী।

র শী দ জা হা ন

ইফতারী

'সারাদিন পেটে দানা নেই। গরীবকে এক টুকরো রুটি দেবে গো? আল্লাহ্ তোমার ভালই করবে।'

এই আর্তস্বর, কান্নার পুনরাবৃত্তি ডেপুটি কলেক্টর সাহেবের মকানের জেনানা-মহল বিদীর্ণ করে। ডেপুটি সাহেবের সহধর্মিণীর মেজাজ এমনিতেই সবসময় তিরিক্ষি, তদুপরি সারাদিনের উপোসে শরীর বেশ কাহিল। ফলে এই শোকার্তস্বরে তিনি বিরক্তিতে ফেটে পড়লেন—'সারাদিন এই হতচ্ছাড়া ভিখিরিগুলো যে কোন চুলোয় গিয়ে মরে থাকে আল্লাই জানেন। কিন্তু যেই তুমি দিনের শেষে একটু শান্তিতে রোজা ভাঙ্গতে বসবে অমনি সব একেবারে জ্যান্তো হয়ে উঠবে।'

'আল্লাহ্ তোমার মেহেরবানিতে দোয়া করবেন।' কাঁপা কাঁপা সেই স্বর আরো একটানা বাজতে থাকে।

'নসিবন! ও নসিবন! পরশু থেকে যে-মেঠাইগুলো পড়ে আছে ভিখিরিটাকে সেগুলো দিয়ে দে।'

নসিবন অর্থাৎ চাকরাণী-মেয়েটি উঠে পড়ল। ভেতরে যেতে যেতে মাথার ওপর উড়নিটা টেনে দিল।

বেগমসাহেবা বারান্দার একটি কাঠের ডিভানে বসে তাঁর দুই পুত্র এবং স্বামীর ফিরে আসার অপেক্ষা করছিলেন। তার সামনে একটি সাদা কাপড়ের ওপর বিস্তৃত ছিল সুস্বাদু খাদ্যসম্ভার। জায়গাটা এমন ভরে গেছিল যে হেঁসেল থেকে এখনো যেসব খাবার আসতে বাকি আছে, সেগুলোর জন্য প্রায় কোনো জায়গা আর ফাঁকা নেই। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন তিনি, প্রায় প্রতি সেকেণ্ড অন্তর। আর মনে মনে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন এই ভেবে যে সারাদিনের উপোস ভেঙ্গে কখন এক খিলি জর্দা-পান মুখে দেবেন।

এমনিতেই বেগমের বদমেজাজের ভয়ে চাকর-বাকরেরা তটস্থ থাকে। আর রমজানের সময় সেই মেজাজ তো একেবারে তুঙ্গে উঠে যায়। প্রায়শই যাবতীয়

ঝাল গিয়ে পড়ে বাঁদীর মতো মেয়ে নসিবনের ওপর। মেয়েটার তিনকুলে কেউ না থাকায় সে সম্পূর্ণ বেগমসাহেবার দয়ামায়ার ওপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে তিনি কদাপি বেচারা মেয়েটাকে মারধোর করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। বরং এই বিশেষ উদ্দেশ্যটির জন্যে শীত-গ্রীষ্ম বারোমাস একটা হাতপাখা মজুদ রাখতেন।

'ওরে নিষ্কর্মার ধাড়ী! ওখানে গিয়ে কি মরলি নাকি? বেরোচ্ছিস না কেন?'

নসিবন তাড়াতাড়ি মুখ মুছতে মুছতে বারান্দার দিকে এগোয়। হাতে কয়েকটা মেঠাই নিয়ে সে জলদী উঠোনের দিকে হাঁটা দিল।

'এদিকে আয়—দেখি ক'টা আছে?'

একান্ত অনিচ্ছায় নসিবন ফিরে এসে তার হাতটি মেলে দিল।

'ওমা! মাত্তর দু'টো!' বেগম চিৎকার করে উঠলেন, 'ওরে পেত্নি, অতগুলো মিষ্টি সব গেল কোথায়? নিশ্চয়ই গিলে ফেলেছিস? দেখি, এগিয়ে আয়।'

'না, না, আমি খাই নি,' নসিবন তোতলাতে থাকে। আর বেগমসাহেবার চোখ রঞ্জনরশ্মির মতো নসিবনের মুখগহ্বরে এককণা মিষ্টির ওপর গিয়ে পড়ে। বেগমসাহেবা তৎক্ষণাৎ হাতপাখাটা তুলে নিয়ে বেজায় রাগে হতভাগা মেয়েটাকে পিটতে শুরু করলেন।

'মুখপুড়ী, ঠগী, এমনি করে উপোস হচ্ছে! আর মাত্তর আধঘণ্টা তোর তর সইল না। যেমন লোভ তেমন দেখ এখন লাঠিপেটাই কেমন লাগে!'

'খোদাতাল্লা দোয়া করবেন। বুড়ো অন্ধ খঞ্জকে একটু ইফতারী[১] দাও গো'—রাস্তা হতে সেই আওয়াজ ক্রমাগত আসতে থাকে।

'ওরে বাবারে! আর করব না, পায়ে পড়ি বেগমসাহেবা। এবারকার মতো ছেড়ে দাও, আর কক্ষণো হবে না। এই দিব্যি গালছি।'

'দাঁড়া, তোকে হওয়াচ্ছি! ঠিক, আর কক্ষণো হবে না? না, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন!'

'আল্লাহ্ তোমার বাল-বাচ্চার ভালই করবে'—আবার সেই করুণ আর্তি।

একদম হাঁফিয়ে যাওয়ার পর বেগমসাহেবা নসিবনকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বললেন, 'যা মুখপুড়ী! মেঠাইগুলো ভিখিরিদের দিয়ে আয়। সেই কখন থেকে ভিখিরিটা দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে। আর এই যে এটুকুও দিয়ে দিস।' এই বলে একটা পাত্র থেকে একমুঠো ভাজা মুগের ডাল তুলে দিলেন।

উড়নির খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে নসিবন সদর দরজার দিকে এগলো।

নয়া রাস্তাটা নিশ্চয়ই কোনোকালে সত্যি সত্যিই নতুন ছিল। কিন্তু এখন রাস্তাটা একেবারে খন্দখোদালে ভরে গেছে। দু'পাশে সার সার বাড়িগুলোর হালও একেবারে ভাঙ্গাচোরা। মাত্র একটা বাড়ি এখনো মানুষ থাকবার যোগ্য। রাস্তাটা এত চওড়া যে একদিকে তা যেমন প্রশস্ত পথ—অন্যদিকে শালকর, তাঁতি, কামার এবং অন্যসব কারিগরেরা তাদের দোকানপত্র সেখানে সাজিয়ে বসে যেতে পারে। গরমকালের রাত্রিতে রাস্তাময় এত খাটিয়া পড়ে যে অঞ্চলের ঘুমন্ত জনসমষ্টিকে বিব্রত না করে কোনো গাড়ীঘোড়া সে-রাস্তা দিয়ে যেতেই পারে না।

আশপাশের লোকেরা এলাকায় তিন-তিনটে মসজিদ থাকায় খুবই গর্বিত। আর গরীব-গুর্বোর সংস্কার ও অন্ধত্বের সুযোগ নিয়ে কে বেশি মোটা হবে এই নিয়ে মোল্লাদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। বাচ্চাদের কোরান শেখানো থেকে শুরু করে মন্তর-তন্তর, মাদুলি-তাবিজ সব ব্যাপারেই তাদের ভেতর সবসময় প্রতিযোগিতা চলত। এককথায় বলতে গেলে লোকজনকে ধোঁকা দেওয়ার সব-রকম কৌশলই তারা কবজা করতে চাইত। তিনটে ফালতু অলস পরিবার সেখানে এইসব সৎ পরিশ্রমী জনসমষ্টির মধ্যে বাস করত, যেমন ঘন অরণ্যে সাদা পিঁপড়েরা থাকে এবং ক্রমশ সজীব গাছগুলো শেষ করে দেয়। মোল্লারা সাফ পোশাকে বিচরণ করে, অন্যদিকে যে-লোকগুলোর ঘাড়ে ভর দিয়ে তারা পেট চালায় তারা নোংরায় ডুবে থাকে। মোল্লারা হল যে ভদ্রজন আর মজুরেরা নিচু জগতের লোক।

প্রায় জনাকুড়ি সুদখোর খান সোজাসুজি এই অঞ্চলের জনসাধারণকে শিকার করে বেঁচে আছে। ভাঙ্গাচোরা একটা বাড়ির ওপরতলায় একটা দড়িদাড়া-রশির দোকানের ওপরে স্যাঁতসেতে নোংরা জায়গায় তারা থাকে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে আসা এই বুনো দঙ্গলের সবাই সুদখোর, সবাই এদের ভয় পেত। কোনো স্ত্রীলোক তাদের পাশ দিয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় যেতে পারত না। এই জন-সমষ্টির প্রায় সকলেই এদের কাছে ঋণে ডুবে ছিল। আর চড়া সুদের দাবী মেটাতে তাদের অবস্থা প্রাণান্তকর।

সারাদিন এদের ঘরদোর বন্ধ থাকত। তখন হিংস্র জানোয়ারের মতো তারা সারা সহর টহল দিয়ে বেড়াতো। সন্ধ্যেবেলা মাংস আর রুটি নিয়ে তারা ফিরত। ছোট কেটলিতে মাংস সিদ্ধ করত। সেই কেটলিটাই আবার পরে সকলের খাবার পাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো; সেখান হতো তুলে তুলে খাবারের কাজটা সারত। হাড়গুলো চুষতে চুষতে সাদা ক'রে ফেলে সেগুলো নিচে রাস্তায় ছুঁড়ে দিত। সেই

হাড়গুলোর ওপর হামলে পড়ার জন্যে রাস্তার কুকুরের দঙ্গল অপেক্ষা করে থাকত। শেষ রাত পর্যন্ত শোনা যেত কুকুরের চিৎকার আর হুজ্জোতির আওয়াজ।

খানেরা খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে শেষে হিসেবের খাতা নিয়ে বসত। প্রত্যেকটা পাই-পয়সার হিসেব রাখত তারা। তারপর কেউ কেউ হুকো নিয়ে নোংরা কম্বলের এক কোণে এলিয়ে পড়ত ধূমপান করতে। এরি মধ্যে যারা একটু ফুর্তিবাজ তারা সহরে একটু চক্কর মেরে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ত।

লোকজনের কাছ থেকে সুদ আদায় করে বেঁচে থাকাটা মুসলিম ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। কিন্তু নির্দয়ভাবে সুদ আদায় ক'রে পেট চালানো সত্ত্বেও এরা নমাজ পড়া, রোজা পালন করা—এসব ব্যাপারে দারুণ নিষ্ঠাবান, যেন খোদাতাল্লাকে ঘুষ দিয়ে খুশি রাখতে চায়! কাজে কাজেই রমজানের মাস বলে খিদে তেষ্টায় কাহিল হয়ে ব্যবসার কাজকর্মে বেশিক্ষণ লেগে থাকতে পারত না, সন্ধ্যে হতে না হতেই ফিরে আসত। সূর্যাস্তের ঠিক আগের একঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইত না। কেউ কেউ তখন রান্নার কাজে লেগে যেত, বাদবাকিরা বারান্দায় ঘুরে বেড়াতো; প্রতিবেশীদের কোনো স্ত্রীলোক একা থাকলে গলা বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখত; নিচে রাস্তার লোকজনদের উদ্দেশ্যে অশালীন মন্তব্য ছুড়ে দিত। কিন্তু সর্বক্ষণ তাদের কান সজাগ থাকত কখন কাছের মসজিদ থেকে আজানের আওয়াজ ওঠে—সূর্যাস্তের প্রার্থনার আহ্বান যা ঘোষণা করে সারাদিনের উপোসের সমাপ্তি।

এদের হাঙ্গামাবাজির জন্যে উল্টোদিকের বাড়িটা ফাঁকাই পড়ে থাকত। কিন্তু বাজারের এত কাছে এত বড় একটা বাড়ি মাত্র কুড়ি টাকা ভাড়ায় পাওয়ায় এতদ-অঞ্চলের নয়া বাসিন্দা, আসগর আলি ভেবেছিল যে সে যেন কিছু একটা আবিষ্কার করে বসে আছে। আর কোনোরকম খোঁজ-তালাশের মধ্যে না গিয়ে সে তার মা। বিবি আর ছেলেটাকে নিয়ে সোজা এই বাড়িটায় এসে উঠল।

বিবি নাসিমাও বেজায় খুশি। সে জিনিসপত্তর ঠিকঠাক, গোছগাছ করতে লেগে গেল। সেই প্রথম সন্ধ্যায় খানিক বিশ্রামের জন্যে ওপরের তলায় জানালা দিয়ে ঝুঁকে সে রাস্তায় বাচ্ছাদের খেলা দেখছিল। তার শাশুড়িও এসে পাশে দাঁড়ালেন, কিন্তু একটু পরেই তিনি নাসিমাকে হঠাৎ ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন।

'ওফ! দেখো, দামড়া খানগুলোকে দেখো। চোখগুলো যেন ফেটে যায়, দেখো, কিরকম তাকিয়ে মস্করা মারছে।'

নাসিমা তাড়াতাড়ি তাকাতে দেখতে পেল বারান্দায় খানেরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে ইসারা করছে, হাসাহাসি করছে। যেই তারা দেখল

যে সে ব্যাপারটা খেয়াল করেছে, অমনি তাদের হট্টগোল, হাসি-মজাক আরো চড়ে গেল। থানদের দিকে উদাসীনভাবে তাকিয়ে থেকে নাসিমা কোনো কথাই বলল না। আর তার শাশুড়ি গজগজ করতে লাগল, 'যদি মেয়েমানুষের একটু লজ্জাসরম না থাকে তো লোকে আর বেটাছেলেদের কী বলবে?'

আজকাল বেশ কয়েক বছর যাবত নাসিমা আর আসগরের মধ্যে এক দুর্বোধ্য ব্যবধান গড়ে উঠেছে। তারা পরস্পরের খুড়তুত ভাইবোন এবং ছোটবেলাতেই বাগ্‌দান হয়ে গেছিল। কিন্তু রীতি অনুসারে তারা পরস্পরের সাথে মেলামেশার সুযোগ পেত না। যাই হোক, কোনোরকমে বুড়োবুড়িদের ফাঁকি দিয়ে কখনো কখনো তারা পরস্পরের সাথে দেখা করত। যেখানে মেয়েদের অন্তঃপুর-বাসিন্দা ক'রে রাখা হয়, সেখানে এরকম চালাকি একান্তই সাধারণ ঘটনা। পরে তারা পরস্পরের প্রেমে পড়ে এবং শীঘ্রই চিঠি-বিনিময় শুরু হয়ে যায়। অতঃপর আসগর জোর করতে থাকে যে নাসিমাকে স্কুলে পাঠাতে হবে।

যৌবনদীপ্ত শক্তি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার কলেজ-জীবনের সেই প্রথমদিকের বছরগুলোয় আসগর সেইসব ছাত্রদের একজন ছিল যারা দেশের স্বাধীনতা ছাড়া কিছুই ভাবতে পারত না। কৃষকদের দারিদ্র্য এবং জমিদারদের দ্বারা তাদের শোষণ, দিনমজুরদের দুর্দশাগ্রস্থ করুণ অবস্থা আর পুঁজিপতিদের সর্বগ্রাসী লালসা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্বালাময়ী বক্তৃতার জন্য সে বেশ জনপ্রিয় ছিল। একদিকে যেমন সুবক্তা, অন্যদিকে বেশ পড়াশোনা-করা লোক হওয়াতে ছাত্ররা তাকে উদীয়মান রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই দেখত। নাসিমার কাছেও সে নায়কোচিত, ধর্মের দিক থেকে কিছুমাত্র খাটো ছিল না। তার কাছে সে তার কার্যাবলীর এক রঙ্গীন চিত্র উপস্থাপিত করত এবং যখন সে (নাসিমা) স্থানীয় খবরের কাগজে তার নাম পড়ে তখন গর্বে নাসিমার বুক ভরে ওঠে। তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বা তাদের পরিবারের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার স্বদেশপ্রেমের আকুতি আসগরের থেকে বেশি। ফলত নাসিমা তার সাথে এই নতুন জীবনের জন্য নিজেকে গড়ে তুলতে থাকে। অত্যন্ত সংবেদনশীল বুদ্ধিমতী এই মেয়েটির পক্ষে তার চিন্তাধারাকে এপথে চালনা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সামান্য ইঙ্গিতের। দ্রুত সে ভারতবর্ষের সমস্যাবলী বুঝতে শুরু করে এবং সম্ভাব্য সমাধান-বিষয়ে তার মন মগ্ন হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ক্রমাগত তার চিন্তায় স্থান পেতে থাকে এবং তার দেশের জন্য প্রাণত্যাগ করতেও সে এখন পুরোদস্তুর তৈরি।

আসগর কলেজ-জীবন শেষ ক'রে বিয়ে করে। তারপর শুরু হয় তার আইন

পড়া। নাসিমা অবাক হয়ে দেখল যে আসগরের তাবত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ঘনিষ্ঠ মহলে কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নাসিমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং মাঝে মধ্যে তুমুল উত্তপ্ত আলোচনা বা কখনো বক্তৃতা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল। তথাপি সে ভেবেছিল এই নতুন পাঠক্রমে নিজেকে নিমজ্জিত রাখায় বোধহয় এমনই ঘটছে। সে আশা করেছিল পাঠক্রম শেষ হওয়ার পর সে পরিপূর্ণভাবে রাজনীতিতে অংশ নেবে।

বস্তুত নাসিমার রাজনৈতিক উৎসাহ যেমন দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছিল, আসগরের রাজনৈতিক উদ্দীপনা ততই দিন দিন শীতল হতে থাকে। নাসিমার একাগ্র প্রশ্নাবলীর উত্তরে সে নানান অজুহাত দেখাতে থাকে। তখন সে বলত, 'কিন্তু খুব শীগ্‌গির আমাদের সন্তান হবে।' পরে যা বলত তা হল—'বাচ্ছাটা এখনো এত ছোট যে ওকে ফেলে রেখে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব।' বাচ্চার বয়স এক বছর হলে যখন নাসিমা রাজনৈতিক কাজের মধ্যে নিজেকে প্রায় তৈরি ক'রে ফেলেছে তখন আসগর বলল যে আইনের পরীক্ষার জন্য এখন তাকে সর্বতোভাবে চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। পরিশেষে সে চাকরির চেষ্টায় ডুবে গেল।

যাই হোক, সত্যিকারের ব্যাপারগুলো তো বেশিদিন আর স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে রাখা যায় না। আর বাইরের বন্ধুদের সাক্ষাতে সে বলত যে পরিবারের জন্য একদম সময় পাচ্ছে না যাতে রাজনৈতিক কাজকর্ম করা যায়। তাতে বন্ধুরা ভাবত যে বেচারী বিয়ে-সাদী করে একেবারে ফেঁসে গেছে।

কিন্তু বাড়তি কী অজুহাত সে খাড়া করবে? অবশেষে নাসিমা বুঝতে পারল যে আসগর কোনোদিন কিছু করার পাত্রই নয়—শুধু লম্বা লম্বা কথা ছাড়া তার কোনো সাহসই নেই।

ক্রমে ক্রমে আসগরের বন্ধুবান্ধবের চক্রটি পাতি উকিল আর মামুলি সরকারি চাকুরেদের ভেতর সীমিত থাকল, যারা কেবল টাকা রোজগারের ধান্ধায় সারাদিন ব্যস্ত থাকত। নাসিমাকে নিয়ে তার বেশ অস্বস্থি হতে থাকে কারণ সে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে নাসিমা তাকে এখন দলছুট বলে মনে ক'রে এবং এ-কারণে কিছুটা ঘেন্নাও করে। নাসিমার শীতল স্তব্ধতায় সে এত বিরক্ত হতো যে কখনো কখনো তার সুন্দর গালে চড় মারার ইচ্ছে হতো। যদি সে তার সাথে ঝগড়া করত কিংবা ব্যঙ্গ করত তা অনেক বেশি সহনীয় হতো।

ইফতারীর সময় এসে গেল! সমস্ত খানেরা একত্রিত হল, কয়েকজন ফুল-বারান্দায় ছিল বসে। বাকিরা এখন চা বানাতে ব্যস্ত। নাসিমা জানালার পাশে

দাঁড়িয়ে নিচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। আজ নিয়ে প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল সে আর আসগর এ-বাড়িতে উঠে এসেছে। খানেরাও তার মুখমণ্ডল দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর তার উদাসীনতার জন্য তারাও খুব একটা নজর করে না তাকে। আর ঠিক এই মুহূর্তে তাদের লক্ষ্যস্থল নিকটস্থ মসজিদ, কারণ যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসতে পারে।

পাশের গলি দিয়ে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক সারা পথ হাতড়াতে হাতড়াতে এসে হঠাৎ উদয় হল। হাতের লাঠিটায় ভর দিয়েও সে কোনোমতেই তার শরীরটিকে সোজা রাখতে পারছিল না, কারণ পঙ্গুত্বে তার সারা শরীর কাঁপছিল। তার খোলা হাতে কিছু একটা মুঠো ক'রে ধরা ছিল। নাসিমাদের বাড়ির দিকের রাস্তাটা পেরিয়ে সে থামল এবং একটা দেয়ালে ঝুঁকে ক্লান্তভাবে দাঁড়ালো।

নাসিমার ছোট্ট ছেলে, আসলামও জানালা দিয়ে দেখতে হাজির হয়েছে। সে বলে, 'দেখো মা, ভিখিরিটার হাতে কী ?'

'কী জানি সোনা, বোধহয় খাবার কিছু।'

'তাহলে খাচ্ছে না কেন, মা ?'

'হয়তো ও রোজা রাখছে, তাই আজানের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'তুমি কেন রোজা রাখো না, মা ?'

নাসিমা ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে মাথা নাড়ে।

'তাহলে বাবা কেন ইন্সপেক্টর সাহেবকে বলল যে সে উপোস করছে ? বাবা কি মিথ্যে কথা বলেছে ?'

নাসিমা একটু ভেবে জবাব দেয়, 'তুমি না হয় তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করো।'

'কিন্তু মা, তুমি কেন উপোস করো না ?'

নাসিমা ছেলেকে সস্নেহে রাগাতে থাকে। বলে, 'তুমি করো না বলে।'

'আমি তো ছোট্ট ! ঠাকুমা বলেছে আমরা রোজা না করলে বড় হয়ে নরকে যেতে হবে। আচ্ছা মা, নরক কেমন গো ?'

'নরক ? ঐ তো আমাদের সামনে, ঐ নিচে,' তীব্র ঘৃণায় নাসিমা বলতে থাকে।

আসলাম সাগ্রহে চারপাশে চোখ বোলায়। বলে, 'কোথায় ?'

'নিচে, ঐ যেখানে অন্ধ ভিখিরিটা দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে ঐসব মজুর, তাঁতি আর কামারেরা থাকে।'

'কিন্তু ঠাকুমা যে বলে, নরকে আগুন আছে ?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

'আর স্বর্গ কিরকম, মা ?'

'এই হল স্বর্গ—যেখানে তুমি, আমি আর ঠাকুমা থাকি। যেখানে বিরাট বিরাট ঘর—পরিষ্কার আর ঝকমকে। প্রচুর ভাল ভাল খাবার জিনিস—দুধ, মাখন, ফল, ডিম আর মাংস। আর ছোট্টরা সুন্দর সুন্দর জামাকাপড়, খেলনা আর আইসক্রীমও পায়।'

'সহরে তাহলে সবাই স্বর্গে থাকে না কেন ?'

'কারণ স্বর্গের বাসিন্দারা অন্য কাউকে স্বর্গে ঢুকতে দেয় না। তারা তাদের খুব খাটায় আর ধাক্কা দিয়ে নরকে ঠেলে দেয়।'

'আর তারা অন্ধও হয়ে যায় ?'

'হ্যাঁ, সোনা। নরক অন্ধ মানুষে ঠাসা।'

'তাহলে ওরা খায় কী ক'রে ?'

আর ঠিক এই সময়ে আজানের শব্দ শোনা গেল আর সাথে সাথে সমস্ত দিনের উপোসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে প্রজ্জ্বলিত হল আতসবাজি। খানেরা চা-পানের জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিল।

সেই বৃদ্ধ অশক্ত ভিক্ষুক হাতের মিষ্টিটা মুখে তোলার চেষ্টা করল। কিন্তু উত্তেজনায় সে কাঁপতে থাকে আর এক আকস্মিক ঝাঁকুনিতে মিষ্টিটা মাটিতে পড়ে গেল। হাঁটুর ওপর ভেঙ্গে পড়ে সে কাঁপতে কাঁপতে মিষ্টিটা তোলার জন্য ঝুঁকে পড়ল। আর যে-মুহূর্তে তার আঙুল মিষ্টির কাছাকাছি পৌঁছয়, একটা কুকুর হঠাৎ তা ছোঁ মেরে তুলে নিল। শীঘ্রই আরো অনেক কুকুর এসে জুটল। চিৎকার ক'রে কুকুরগুলো ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে আর সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক দুর্বলকণ্ঠে কুকুরগুলোকে দাবড়াতে গেল। কুকুরগুলো বীভৎস চিৎকার শুরু করে। ক্ষুধা এবং ব্যর্থতায় অসুস্থ সেই বৃদ্ধ মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে বাচ্চা ছেলের মতো হেঁচকি তুলতে লাগল। চেঁচামেচিতে দু'জন খান ঝুঁকে পড়ে সব দেখল, আর বেজায় মজা পেয়ে হাসির হররা তুলল।

'মা !' মার পিছনে মুখ লুকিয়ে ভীত আসলাম ফিসফিস করে আবেদন জানায়। আর এই প্রথম তার শিশু মন নরক শব্দের প্রকৃত ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে।

'শয়তান !'—খানদের দিকে তাকিয়ে নাসিমা অস্ফুট স্বরে বলে।

'মা ?'—আসলাম ধরা গলায় আবার ডাকে।

নাসিমা তাকে কোলে তুলে নেয়, চোখে চোখ রেখে আহত গলায় বলে, ‘সোনা, বড় হয়ে তোমার কাজ হবে যাতে কাউকে আর নরকে বাস করতে না হয়।’

‘আর তুমি, মা ? তুমিও তাই করবে তো ?’

‘আমি ? আমি কী করব, বলো ? আমি তো এই জেলখানাতেই বুড়ি হয়ে যাব !’

‘তুমি একটুও বুড়ী নও মা ! ঠাকুমার মতো নও। তুমি না এলে আমি তো একেবারে একা !’

‘আচ্ছা সোনা, আমি তো তোমার সাথে থাকবই।

অনুবাদ ॥ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

১. ইফতারী : সারাদিন রোজা রাখার পরে যে-খাদ্য গ্রহণ করা হয়

আলেহো কার্পেন্তিয়ের

পলাতকেরা

১

একটা গাছের তলায় এসে পথের রেখা শেষ হয়েছে। আর প্রতিবার হাওয়া নাড়া লাগায় পচা ফলের গায়ে লেপটে-থাকা মাছিদের আর স্পষ্ট জোরালো গন্ধ পাওয়া যায় এক কালো মানুষের। কিন্তু কুকুরটি—কুকুর ছাড়া আর কোনো নামেই তাকে কখনো ডাকা হয়নি—একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। ঘাসের উপর গড়াগড়ি খেল সে, পিঠ থেকে পোকাগুলো খশাবার জন্য, তাছাড়া টান-টান পেশিগুলোও ঢিলে ক'রে দেয়া যায়। অনেক দূরে, ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে, মানুষের দলটার শোরগোল হারিয়ে গেল। কালো লোকটির গায়ের গন্ধ কিন্তু তেমনি জোরালো রয়ে গেল। হয়তো কিমারন লুকিয়ে আছে কোথাও, কোনো ডালে বসে আছে, হয়তো চোখ দিয়ে খুঁজবার চেষ্টা করছে। অথচ তবু কুকুর আর শিকারি দলের কথা ভাবছে না। লিয়ানায়-ছাওয়া মাটিতে আরেকটা গন্ধ—যেটা হয়তো পরের জন তাতে গা ঘষছে বলে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। মেয়েলি গন্ধ—যে-গন্ধটা কুকুর তার পিঠ থেকে ঘষে তুলে দিতে চাইছে, চিৎ হয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে সে। দাঁতের ফাঁক দিয়ে হাসছে। জিভটা বড্ড ছোট; তার কাঁধের হাড়গুলো আলাদা ক'রে আছে যে-গর্তটা, জিভটা টেনে লম্বা করে দিতে চাইছে তার দিকে।

ছায়াগুলো ক্রমেই কেমন আরো ভেজা-ভেজা হয়ে এল। কুকুর উলটে গেল, লাফিয়ে উঠল। চিনিকলের ঘণ্টা আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছে। তার কান দু'টি খাড়া হয়ে উঠল। কুয়াশা আর ধোঁয়া মিশে গিয়ে উপত্যকায় একটা নীলচে নিশ্চলতা, আর তার ওপর ভাসছে ইটে-তৈরি একটা চিমনির ছায়া, মস্ত ডানাওলা এক ছাত, গির্জার গম্বুজ। প্রতি মুহূর্তে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে ছায়াগুলো, আর টুকরো-টুকরো আলো দেখে মনে হয় ছায়াগুলো বুঝি ঝিলের জলে ডুবে গেল। কুকুর খিদেয় কাতর। কিন্তু, ঐ যে ওখানে, মেয়েলি গন্ধটা—মাঝে মাঝে কালো লোকটার গন্ধ তাকে ছেয়ে ফেলছে। কিন্তু তার নিজের গরমের গন্ধ, অন্য গরমের গন্ধ যাকে দাবি

করছে, বাকি সবকিছুকেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। কুকুরের পেছনের পা-দু'টি আড় হয়ে উঠল, ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পেছনটা দেখবার চেষ্টা করল সে। তার বুকের খাঁচার তলায় পেটটা ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ছোট ছোট উৎকণ্ঠিত রুদ্ধশ্বাস হাঁফের ছন্দে। কড়া রৌদ্রে ভারি হয়ে ফল খসে পড়ছে এখানে-সেখানে, আওয়াজ হচ্ছে ভেজা-ভেজা, আর উষ্ণ শাঁসগুলো ছিটকে পড়ছে মাটিতে।

মাথা নুইয়ে ঝোপের দিকে ছুটে যেতে শুরু করল কুকুর। কোন দিকে যাওয়া উচিত এ-সম্বন্ধে তার নিজের যে-ধারণা, ঠিক তার উলটো দিকে ছুটছে সে, যেন ওভারসিয়ারের চাবুক তাকে তাড়া ক'রে আসছে। কিন্তু মেয়েলি গন্ধটি যে ওখানে! তার ঝোলা নাকটা এতক্ষণ একটা প্যাঁচালো পায়ে-চলার পথ অনুসরণ করে আসছিল। আর গন্ধটা মাঝে মাঝে এমনকি থমকে পেছিয়ে যাচ্ছিল, পথ ছেড়ে চলে যাচ্ছিল পাশে। মাঝে মাঝে প্রখর হয়ে উঠছিল লজ্জাবতী লতার ঝোপে, হারিয়ে যাচ্ছিল লাজুকলতার গোটানো পাতার মধ্যে। ভেজা পাতাগুলো যেন গোঁজিয়ে উঠেছে। তারপরেই গন্ধটা আবার লাফিয়ে উঠছিল অপ্রত্যাশিত জোরালোভাবে কোনো নোংরার ওপর, অন্য কারো লেজ যাকে একটু আগে ঝেঁটিয়ে গেছে। হঠাৎ কুকুর লাফিয়ে ফিরে এল সেই অদৃশ্য পথরেখা থেকে – সেই যে-সুতো যা বারে-বারে জট পাকাচ্ছে, আবার জট খুলে ছড়িয়ে পড়ছে – শুধু একটা বেজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য। ঝাঁকুনির আওয়াজ হল দু'বার, যেন কোনো দস্তানার ভেতর কাস্টানেট বাজনা বাজছে। তারপর সে বেজিটাকে ছুঁড়ে ফেলল এক গাছের গুঁড়ির গায়ে, শিরদাঁড়া ভেঙে ফেলবে বলে। আচমকা থমকে গেল কুকুর, একটা পা শূন্যে তোলা। অনেক দূরের পাহাড় থেকে ঘেউ ঘেউ আওয়াজ ভেসে এল।

এটা চিনিকলের ঝাঁকটার ডাক নয়। ডাকটার ধরন আলাদা, স্বরগ্রামে ভিন্নতা স্পষ্ট, আরো উগ্র আরো কর্কশ, একেবারে গলার গভীর থেকে উঠে আসছে, শুধু জোরালো চোয়াল আওয়াজকে একটু যা মোলায়েম ক'রে দিচ্ছে। কোথাও নিশ্চয়ই কুকুরের ঝাঁকের মধ্যে দারুণ লড়াই বেঁধেছে – আর কুকুরের মতো তাদের গলায় নিশ্চয়ই তামার দাঁতালো কলারে নম্বরওলা চাকতি বসানো নেই। এতদিন যে-ধরনের আওয়াজ শুনে সে অভ্যস্ত, তার চেয়ে একেবারেই আলাদা এইসব অচেনা গর্জনের সামনে, যা অনেকটা নেকড়ের গর্জনের মতো হিংস্র, কুকুর ভয় পেল!

অন্যদিকে ছুটল সে, যতক্ষণ না লতাপাতার গায়ে জ্যোৎস্নার ছোপ পড়ল। মেয়েলি গন্ধটা আর নেই সেখানে। বরং নাকে এল কালো মানুষের গন্ধ। আর ঐ

তো, নিভু́লভাবে, ঘুমন্ত কালো লোকটা—ডোরাকাটা প্যাণ্ট, উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কুকুর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল তার ওপর। সেই যে ভোরবেলায় শপাং শপাং চাবুকের মধ্যে তাকে হুকুম দেয়া হয়েছিল তা তামিল করতে। সেই যেখানে ছিল টগবগে-ফোটা ডেকচি আর খড়ের গাদার ওপর তার বিছানা। কিন্তু ঐ ওখানে, ঠিক জানে না কোথায়, পুরুষ-কুকুরদের মধ্যে লড়াই চলছে তখনো। কিমারনের পাশে কতগুলো চিবনো পাঁজরার হাড়। পিঁপড়ের ঝাঁকের কাছ থেকে মাংসের স্বাদ খানিকটা ছিনিয়ে নেবার জন্য আস্তে এগিয়ে এল কুকুর, সাবধানে, কান তার খাড়া। তাছাড়া, ঐ কুকুরগুলো এমন হিংস্রভাবে ডাকছে যে তার ভয় করছে। আপাতত খানিকক্ষণ না হয় মানুষের আশেপাশেই থাকুক আর কান খাড়া রাখুক। কিন্তু দক্ষিণের বাতাস শেষটায় বিপদের ভয় উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনবার ঘুরপাক খেল কুকুর, তারপর অবসন্ন হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। কোনো এক বেজায় খারাপ স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ছুটল তার পাগুলো। ভোরবেলায় ঘুমের ঘোরে কিমারন হাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল এমন একটা ভঙ্গিতে যাতে বোঝা যায় অনেক মেয়ের সঙ্গে শুয়ে সে অভ্যস্ত। উষ্ণতার আশায় কুকুর তার বুক ঘেঁষে কুঁকড়ে শুলো। দু'জনেই পালাচ্ছে পুরো দমে—একই দুঃস্বপ্নের তাড়ায় তাদের স্নায়ু যেন প্রায় ছিঁড়ে যাবে।

কাছ থেকে ভাল ক'রে তাদের দেখবে বলে বাদাম গাছ থেকে নেমে এসেছিল এক মাকড়সা। এবার সে তার সুতো গুটিয়ে আবার উধাও হয়ে গেল গাছের ডগায়। গাছের পাতাগুলো তখন রাত ভেদ ক'রে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে।

২

অভ্যাসবশেই কিমারন আর কুকুর চিনিকলের ঘণ্টার শব্দে জেগে উঠল। যেই আবিষ্কার করল তারা দু'জনে একসঙ্গে শুয়ে ছিল পরস্পরের গা ঘেঁষে, চমকে ধড়-মড় ক'রে তারা উঠে পড়ল। তারপরেই পেছিয়ে গেল দু'জনেই দুই গাছের গায়ে, আর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। কুকুর এখন একজন প্রভু পেতে চায়, আর কালো লোকটার প্রত্যাশা যদি কোনো বন্ধু জোটে আবার।

উপত্যকার তখন ঘুম ভাঙছে। ক্রীতদাসদের তাড়া দেবার জন্য উগ্র ঘণ্টার শব্দের উত্তরে এখন ক্ষীণভাবে ভেসে এল গির্জার ঘণ্টার ঢিমে তালের সুরেলা আওয়াজ – যদি শ্যামল অনুজ্জ্বলতা দুলছে ছায়া থেকে রৌদ্রে, ঘোড়ার চিঁহি, গরুর হাম্বা রবের মধ্যে দিয়ে। কিংবা যারা এখনো মেহগনি-খাটে শুয়ে আছে তাদের

উদ্দেশ্য ক'রে কেমন একটু প্রশ্রয়মেশানো ধমক দেবার ভঙ্গিতে। মোরগরা মুরগিদের আশে পাশে ঘুরঘুর করছে, ডিমগুলো তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলবার জন্য, যাতে ওভারসিয়ারের বউয়ের ছোটো আঙুল জানতে না পারে ডিমের উপস্থিতি। মূল বাড়িটার চারপাশে পাক খাচ্ছে এক ময়ূর—আলো ক'রে তুলছে, ডেকে উঠছে প্রত্যেক কোণে, প্রত্যেক দেয়ালের কাছে। আখপেষাই কলের ঘোড়াগুলো শুরু ক'রে দিয়েছে তাদের দীর্ঘ বর্তুল অভিযান। ক্রীতদাসেরা রুটিভরা মাটির শানকি আর গেঁজানো আখের রসের বাটির সামনে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করছে। কিমারন তার প্যান্টের বোতাম খুলল—এক রেশম গাছের গুঁড়িতে ফেনিল স্রোত ঝরে পড়ল। কুকুর তার ঠ্যাং তুলল এক কচি পেয়ারা গাছের গুঁড়িতে। কাটা আখ-গাছের গুঁড়িগুলোয় কাস্তের কোপের ঘা দেখা যাচ্ছে এখনো। কালো লোকদের খুঁজে বার করতে অভ্যস্ত ঝাঁকের ডালকুত্তাগুলো তাদের শেকল ঝনঝন ক'রে বাজাচ্ছে—চিনিকলে যাবার জন্য তারা অধীর।

'কীরে? আসবি আমার সঙ্গে?'—কিমারন জিজ্ঞেস করল।

কুকুর বাধ্যভাবে তাকে অনুসরণ করল। ঐ ওখানে চিনিকলে বড্ড বেশি চাবুক, বড্ড বেশি শেকল আর বেড়ি, বিশেষত যারা অনুতাপ ক'রে ফিরে যায় তাদের জন্য। কোনো মেয়েলি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না এখন। কিন্তু কালো লোকের গায়ের গন্ধও আর নেই। এখন কুকুর বরং সাদা মানুষের গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে বেশি সচেতন—যে-গন্ধের অর্থই হল বিপদ, বিভীষিকা! কারণ ওভারসিয়ারের গায়ের গন্ধ সাদা—তার কড়া ইস্ত্রি-করা ঝলমলে গুয়াচেরা কামিজের মাড়ের গন্ধ আর শুয়োরের চামড়ার জুতোর কালির কটু গন্ধ সত্ত্বেও। এই গন্ধটা বাড়ির তরুণীদেরও—তাদের লেসের কাজ-করা জামার সুগন্ধ তাকে ঢাকতে পারে না। গির্জার পুরুতের গন্ধও এটা—তার সঙ্গে গলন্ত মোম আর ধূপদানির গন্ধ মিশে গির্জার ছায়ার গন্ধ কেমন যেন দম আটকানো, অথচ এত ঠাণ্ডা! অরগ্যানবাদকও এই একই গন্ধ বয়ে বেড়ায়, যদিও অরগ্যানের হাপর তার পোকায়-কাটা উটের লোমের টুপির গায়ে এতবার ফুঁ দিয়েছে। এই সাদা গন্ধের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। কুকুর তাই তার দল পালটে ফেলেছে।

৩

প্রথম প্রথম কুকুর আর কিমারন তাদের বাঁধাধরা খাদ্যের অভাব অনুভব করত। কুকুরের মনে পড়ে যেত, চিনিকলে সন্ধ্যেবেলায় ভেকচি-ভেকচি হাড় বিলোনো

হতো। আর প্রার্থনার ঘণ্টার পরে, বা রোববারে পিপেগুলো সরিয়ে দেবার পরে, যে বালতি ভর্তি ভাত আর সীম পাওয়া যেত তার জন্য কিমারনের মন কেমন ক'রে উঠত। সেইজন্যেই গোড়ার দিকে লাথি-ঝাঁটা বা ঘণ্টার শব্দ না থাকা সকালগুলোয় বেশিক্ষণ ঘুমোবার পর, ক্রমে ক্রমে তারা দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। সিডার গাছের পাতার আড়ালে কোথাও বেজি-টেজি লুকিয়ে আছে, কুকুর তা শুঁকে বার করত। কিমারন তারপর ঢিল ছুঁড়ে তাকে খতম করত। যেদিন তারা আচমকাই এক বুনো শুয়োরের হদিশ পেয়েছিল, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের কাজ করতে হয়েছিল, যতক্ষণ না শুয়োরটা তখন তার কান ফালা-ফালা, কুকুরের সব ঘেউ-ঘেউতে ঘাবড়ে যাওয়া সত্ত্বেও—তখনো সে উলটে আক্রমণ করছিল। শেষকালে এক মস্ত পাথরের গায়ে কোণঠাসা হয়ে পড়ল আর শেষ পর্যন্ত লাঠির ঘায়ে সাবাড় হল। ধীরে-ধীরে কুকুর আর কিমারন ভুলেই গেল যে এককালে তারা বাঁধাধরা সময়ে খাবার খেত। যা-ই জোটাতে পারে তা-ই গোগ্রাসে গেলে তারা, যতটা পারে পেটে ঠাসে, কেননা কে জানে কাল হয়তো বৃষ্টি-বাদলা শুরু হবে, আর পাথরগুলোর মধ্যে উপর থেকে ধেয়ে আসবে জল; আর উপত্যকার ঢাল জলে থৈ থৈ করবে। ভাগ্যিস কেমন ক'রে ফল খেতে হয় কুকুর তা জানত। যখনই কিমারন কোনো আম ইত্যাদি আবিষ্কার করে, কুকুরের ভেজা-ভেজা নাকটাও হলদে বা লালে মাখামাখি হয়ে যায়। তাছাড়া কুকুর ছিল চিরকালই ডিমচোর; বাগদা চিংড়ির জন্য তার প্রভুর এই নাছোড় ভালবাসার ক্ষতিপূরণ করত সে তিতিরের বাসায় চড়াও হয়ে। বাগদা চিংড়িগুলো ঘুমোত মাটির তলার নদীতে, তাদের গর্তে, যার মুখে শুকনো মড়া শামুক গুগলির ঝকঝকে খোলাগুলো পড়ে আছে।

ফার্ন গাছের পর্দা দিয়ে ঢাকা এক গুহায় থাকত তারা। গুহার ছাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরাতে চুণের সরু সরু ঝিল্লি ঝুলত। মাঝে মাঝে অশ্রু ঝরায় তারা, বাঁধাধরা বিরতির পর, ঠাণ্ডা ছায়াকে ভরে দেয় যেন কোনো ঘড়ির শব্দে। একদিন কুকুর গুহার একদিকের দেয়ালের গুঁড়ি খুঁড়তে শুরু ক'রে দিল। একটু পরেই তার দাঁত আবিষ্কার করল এক উরুর হাড় আর কিছু পাঁজর—এত পুরনো যে মজ্জাতে কোনো স্বাদ নেই আর; তার মুখের মধ্যে ডেলা-ডেলা বিস্বাদ ধুলোর মতো গুঁড়িয়ে গেল। তারপর সে কিমারনের কাছে বয়ে নিয়ে এল এক নরকরোটি। কিমারন তখন মাহা সাপের চামড়া দিয়ে একটা কোমরবন্ধ তৈরি করছিল। যদিও গর্তের মধ্যে কতগুলো বাটি, রেকাবি আর হামানদিস্তা পড়েছিল, কিমারন তার

অস্থায়ী ডেরায় মরা মানুষের উপস্থিতিতে আঁতকে উঠে। বিড়বিড় ক'রে ভগবানের নাম জপ করতে করতে সেদিন বিকেলেই সে বৃষ্টির তোয়াক্কা না ক'রে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে এল। গাছের ঝুরি আর শেকড়বাকড়ের মধ্যে ঘুমোল তারা দু'জনে, ভেজা কুকুরের গায়ের গন্ধের চাদর গায়ে দিয়ে। সকালবেলায় তারা আরেকটা গুহা খুঁজে বার করল। তার ছাতটা আরো নিচু, মানুষটাকে যার মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। অন্তত এখানে তো আর সেই হাড়গোড় নেই—যা একেবারেই কাজে লাগে না, বরং আচমকা ঝাঁকুনি লাগায় স্নায়ুতে ডেকে নিয়ে আসে অলুক্ষণে যতসব ভূতপ্রেত।

যেহেতু অনেকদিন তারা কোনো শিকারি দলের সাড়াশব্দ পায়নি, এবার একটু একটু করে তারা সাহস ক'রে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে শুরু করল। কখনো রাস্তা দিয়ে যায় কোনো গরুর গাড়ির চালক, কিমারনের চেনা; কিংবা কোনো ভক্তিমতী স্ত্রীলোক, নাজারেনের আলখাল্লা গায়ে; কিংবা কোনো গিটারবাদক; কিংবা এমন কেউ সহরের সব মাতব্বরের সঙ্গে যার দহরম মহরম। আর তারা চুপচাপ দূর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে তাদের। সন্দেহ নেই যে কিমারন একটা কিছুর জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে। গিনি ঘাসের ওপর সে কয়েক ঘণ্টা একটানা উপুড় হয়ে শুয়ে থাকে, তাকিয়ে থাকে সেই ধুলিধূসর রাস্তার দিকে—ক্বচিৎ যে-পথ ব্যবহার করে লোকে, একটা কোলা ব্যাঙ যেটা মস্ত এক লাফে ডিঙিয়ে যেতে পারে। সেইসব প্রতীক্ষার সময় কুকুর তার আমোদ খোঁজে সাদা-সাদা প্রজাপতির ঝাঁককে ছত্রভঙ্গ ক'রে বা কোনো হলদে গায়কপাখিকে পাকড়াবার ব্যর্থ চেষ্টায় অনবরত লাফিয়ে।

একদিন যখন কিমারন ঐ ভাবে, কখনো যার পাত্তা নেই এমন কিছুর প্রতীক্ষায় উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, ঘোড়ার খুরের শব্দ তাকে কবজির ওপর ভর দিয়ে উঠিয়ে দিল। দুই চাকার এক ঘোড়ার গাড়ি ছুটে আসছে জোর কদমে—চিনিকলের ছাই রঙের টাট্টুতে টানা। ঘোড়াজোতা দাঁড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কোচোয়ান গ্রেগো-রিয়ো, শপাং শপাং ক'রে চাবুক চালাচ্ছে সে। আর তার পেছনে গির্জার পুরুতের ছোট্ট রুপোর ঘণ্টা বাজছে…টুং…টুং…! সে যে কতদিন হল কুকুর কোনো ঘোড়ার চেয়েও জোরে দৌড় লাগাবার আমোদ পায় নি, যে এখন সেসব সতর্কতা হাওয়ায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

টিলাটা থেকে পুরোদমে ছুটে নামতে লাগল সে। টান টান তার শরীর, রৌদ্রে নীল, আর ঘোড়ার গাড়ির নাগাল ধরে ফেলে টাট্টুর পায়ের মাঝখানে, একবার ডান পায়ের কাছে, একবার বাঁ পায়ের পাশে, কখনো সামনে, কখনো পেছনে ঘেউ

ঘেউ ক'রে ডাকতে শুরু করল। আর কোচোয়ান আর পুরুতের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার ক'রে চিৎকার করতে লাগল। টাট্টু এবার ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। লাগামে হ্যাঁচকা টান পড়ায় চোখের ঠুলিটা খুলে ফেলবার জন্য সজোরে ঝাঁকালো সে তার কাঁধ। হঠাৎ তার জোয়ালের একটা দাঁড় গেল ভেঙে, জিনের সঙ্গে জোড়াটা গেলো খুলে। পুতুলের মতো হাত-পা নেড়ে পুরুত আর কোচোয়ান সোজা ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল ছোট্ট পাথুরে সেতুর ওপর—ধুলো রক্তে সব মাখামাখি।

ছুটে এল কিমারন। হাতে বেত, কুকুরকে চাবকাবে বলে সেটা নাড়াচ্ছে সে। কুকুর ছুটছে পাশে পাশে, ভঙ্গিটা তার—'দোষ হয়ে গেছে, ক্ষমা চাই'। কিন্তু কালো লোকটা হঠাৎ চাবুক নাড়ানো বন্ধ ক'রে দিল। একটু অবাক হয় এই ভেবে যে দুর্ঘটনার ফলটা তো আসলে তেমন মন্দ নয়। পুরুতের জোব্বা আর পোশাক খুলে নিল সে। আর নিল কোচোয়ানের গায়ের জ্যাকেট আর বুটজোড়া। পকেটের পর পকেট, সব হাতড়ে মিলল প্রায় পাঁচ পেসো। তাছাড়া পেল ছোট্ট রুপোর ঘণ্টাটা। তারপর ডাকাতরা ঝোপে ফিরে এল। আলখাল্লায় নিজেকে আগাগোড়া মুড়ে কিমারন স্বপ্ন দেখল রাত্রের সব ভুলে-যাওয়া পুলকের। তার মনে হানা দিল মরা পতঙ্গে-ভরা কেরোসিনের কুপিজ্বলা সহরের শেষ প্রান্তের বাড়িগুলো। এত রাতেও সেখানে আলো জ্বলে—যেখানে দু'বার তাকে যেতে দিয়েছিল তারা বড়দিনের বোনাস হিসেবে, যেভাবে খুশি খরচ করার অনুমতি দিয়ে। কালো লোকটা, বলা বাহুল্য হবে যে, পছন্দ করেছিল মেয়েমানুষ।

৪

তাদের তাক লাগিয়ে দিয়ে বসন্ত এল, সকালবেলায়। কুকুর জেগে উঠল তার পেছনের পাদু'টোর মাঝখানে এক অসহ্য টান ভাব নিয়ে, আর তার চোখের মধ্যে কেমন একটা অসুখ-করা ভাব। গরম লাগছে না, তবু সে হাঁপাচ্ছে। তার দুই শ্বদন্তের মধ্যে ঝুলে বেরিয়ে এসেছে এক জিভ, শামুকের খোলার মতো ধারালো তার নরম প্রসার। কিমারন নিজের মনেই কীসব বিড়বিড় করছে। দু'জনেরই মেজাজ দারুণ তেরিয়া। রাস্তায় বেরিয়ে এল তারা সকাল সকাল, কিন্তু খাবারের কথা মনে ক'রে নয়। কুকুর ছুটছে এলোমেলো, ব্যস্তসমস্ত, উত্তেজিত, কোনো গন্ধ শুঁকে পাওয়া যায় কিনা তার ব্যর্থ চেষ্টায় উদ্ভ্রান্ত। পোকামাকড় মারল সে রাশি রাশি, চিরকালই এই পোকামাকড়গুলো তার বিশ্রী লাগে। কিন্তু এখন শুধু শুধুই মারল। কোনো কিছু মেরে ফেলবে বলেই, এমনি এমনি, শুধু মারার নেশায়।

গমের ছড়া দাঁতের ফাঁকে পিষে ফেলল, কচি অংকুরগুলো উপড়ে তুলল। যখন এক ব্যাঙ তার চোখে থুতু ছিটোল তার তিরিক্ষিভাব পৌঁছলো চরমে। আর কিমারন আছে তার প্রতীক্ষায় – কোনোদিনই এমনভাবে সে প্রতীক্ষা করে নি।

কিন্তু পথ দিয়ে কেউ গেল না সেদিন। যখন রাত বাড়ল আর প্রথম বাদুড়-গুলো উড়ো মাটির ঢেলার মতো অস্থির হয়ে বেরিয়ে এল ঝোপঝাড়ের ওপর, কিমারন আস্তে আস্তে চিনিকলের আশপাশের বাড়িগুলো লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করে দিল। কুকুর এল তার পিছু পিছু, তারই মতো বেড়ি আর চাবুকের কোনো পরোয়া না করে। শুকনো ঝরনার খাত অনুসরণ করে তারা একটু একটু ক'রে ক্রীতদাসদের ছাউনির দিকে এগোতে লাগল। চেনা গন্ধ নাকে আসছে এখন, যেন অতীত থেকে ভেসে এসেছে পোড়াকাঠ, ক্ষার, গুড়, ঘোড়ার অস্থির খুরের দাপটে উড়ে-আসা ধুলো। তারা বোধহয় পেয়ারা জারাচ্ছে, কারণ হাওয়ায় ভেসে আসছে জেলির মাতাল-করা অসহ্য মিষ্টি গন্ধ। কুকুর আর কিমারন এগোতেই লাগল পাশা-পাশি। মানুষটার মাথা এতটাই নোয়ানো যে তা যেন কুকুরের মাথার সমান উঁচু।

হঠাৎ আবাদের একজন কালো স্ত্রীলোক রাস্তা পেরিয়ে গেল কামারশালার দিকে। কিমারন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তাকে তুলসীপাতার ঝোপের ওপর এনে ফেলল। এক চওড়া হাতের চেটো মেয়েটির চিৎকার চাপা দিয়ে দিল। এক বিলিতি কুত্তি ছিল তার সাথে। প্যারিসের এক প্রদর্শনী থেকে তাকে কিনে এনে-ছিলেন ডন মারসিয়াল। সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করলে কুকুর তার পথ আটকালো। তার মাথা থেকে লেজ অবধি রোঁয়া ফুলে উঠেছে। তার পুরুষালি গন্ধ এমন তীব্র, এমন প্রখর আর এমন নেশা-ধরানো যে বিলিতি কুত্তি ভুলেই গেল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তাকে বিলিতি সাবানে স্নান করানো হয়েছে।

কুকুর যখন গুহায় ফিরে এল তখন দিনের আলো ফুটছে। কিমারন ঘুমোচ্ছে পুরুতের আলখাল্লা মুড়ি দিয়ে। নিচে – নদীতে স্রোতের মধ্যে খেলা করছে দুই শুশুক। স্রোত ঘোলা ক'রে দিচ্ছে তারা তাদের লাফঝাঁপে, আর কাদাজলের ওপর ফেনার মেঘ ভাসাচ্ছে।

৫

কিমারন ক্রমেই বড্ড অসাবধান হয়ে পড়েছে। এখন সে একেবারে গ্রাম অবধি চলে যায়। এলোমেলো ঘোরে, সময় নেই অসময় নেই দিনের যেকোনো সময় কোনো

একা ধোপানি বা দাইকে পেড়ে ফেলে মাটিতে—যারা হয়তো কোনো ক্যাকটাস বা ধনে পাতা বা অন্য কোনো লতাপাতা খুঁজতে বেরিয়েছিল—ভূত ঝাড়বার ওষুধ বানাবে বলে। আর যে-রাত্তির থেকে সে সাহস ক'রে রাস্তার ধারের সরাই থেকে মদ গিলতে গিয়েছিল, সেই থেকে সে টাকাকড়ির জন্যে একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। একাধিকবার সে কোনো ফাঁকা গলি থেকে কোনো চাষির টাকার গেঁজিয়া নিয়ে চম্পট দিয়েছে—প্রথমে তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়ে আর লাঠি দেখিয়ে তাকে চুপ রেখে। এসব হানার সময় কুকুরও যায় তার সঙ্গে, যতদূর পারে তাকে সাহায্য করে। তবু এখন তারা আগের চেয়ে অনেক খারাপ খায় ও এখন থেকে বেশির ভাগ সময়ই তাদের খুশি থাকতে হয় তিতির, সারস বা বন-মুরগির ডিম খেয়ে। তাছাড়া কিমারন এখন সবসময়েই আতঙ্কে থাকে, উৎকণ্ঠায় থাকে। কুকুর একবার ঘেউ করলেই সে আঁকড়ে ধরে তার চোরাই কাস্তে, কিংবা তরতর ক'রে বেয়ে ওঠে কোনো গাছে।

বসন্তের দারুণ কষ্টের দিনগুলো কেটে যেতেই কুকুরকে দেখা গেল আর মোটেই সহরের ধারে কাছে ঘেঁষতে চাইছে না। বড্ড বেশি বাচ্চা ছেলেমেয়ে ওখানে, তাকে দেখলেই ঢিল ছোঁড়ে, লোকেরা লাথি কষায়, আর তার গন্ধ পেলেই পাড়ার যত কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ওঠে। তাছাড়া ওসব রাতে কিমারন ফেরে টলতে টলতে, আর তার মুখ থেকে এমন এক গন্ধ বেরোয় যাকে কুকুর তামাকের গন্ধের মতোই দারুণ অপছন্দ করে। সেই জন্যেই তার প্রভু যখন কোনো আধো-আলোয় ভরা বাড়িতে ঢোকে, কুকুর তার জন্য অপেক্ষা করে বুদ্ধিমান দূরত্ব রেখে। আর এইভাবেই তাদের জীবন কাটছিল। তারপর এক রাতে কিমারন এক ঝি-র ঘরে বড্ড বেশি সময় কাটিয়ে ফেলল। কুঁড়ে ঘরটাকে চুপিসারে ঘিরে ফেলল অনেক লোক, হাতে তাদের খোলা কাস্তে। একটু পরেই কিমারনকে হিড়হিড় ক'রে টেনে আনা হল রাস্তায়—উলঙ্গ, আর্তভাবে সে চিৎকার করছে। কুকুর যেই চিনিকলের ওভারসিয়ারের গায়ের গন্ধ পেল, রাস্তা থেকে ছুটে পালিয়ে এল ঝোপে।

পরদিন সে দেখতে পেল কিমারন যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। তার গায়ের ঘাগুলোয় লবণ ছিটিয়ে শুকোন হয়েছে। তার গলায় বেড়ি, পায়ে বেড়ি, আর তাকে নিয়ে যাচ্ছে সান ফারনান্দোর চারজন পুলিশ। তার প্রত্যেক পদক্ষেপেই তারা তাকে গাদাবন্দুকে বারুদ ঠাসার লাঠি দিয়ে পেটাচ্ছে, আর অনবরত 'চোর', 'মাতাল', 'বেজন্মা', 'অকম্মার ধাড়ি' ইত্যাদি বলে গাল পাড়ছে।

উপত্যকার দিকে চোখ রাখা যায় এমন একটা উঁচু পাথরের ধার ঘেঁষে বসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠছিল কুকুর। মাঝে মাঝে তার ওপর নেমে আসে এক গভীর দুঃখ। যখন সেই মস্ত ঠাণ্ডা সূর্য পৌঁছোয় তার পুরো বর্তুল আকারে, লতাপাতার ওপর এমন একটা শুকনো ছায়া ছড়িয়ে দেয় যে কষ্ট হয়। আগে বৃষ্টিবাদলার রাতে গুহায় যে-আগুন জ্বলে উঠত, তা এখন অতীতের কাহিনী। আসন্ন শীতের সময় আর সে মানুষের উষ্ণতার স্পর্শ পাবে না, এমন কেউই কাছে থাকবে না যে ঐ দাঁতালো তামার কলারটা খুলে দেবে যেটা তার ঘুমকে ছিঁড়ে ফালা ফালা ক'রে দেয়, যদিও পুরুতের আলখাল্লাটা সে এখন উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছে। অন্যদিকে অবশ্য অনবরত শিকার ক'রে ক'রে অবশেষে সে যেসব প্রাণী খাদ্য হিসেবে মোটেই সুবিধের নয় তাদের সম্বন্ধে অনেকটা সহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। এখন সে মাহা সাপকে তপ্ত পাথরের আড়ালে লুকিয়ে যেতে দেয়, এক-বারও ঘেউ ক'রে ওঠে না, এখন কিমারন নেই যে তাকে তাড়া লাগাবে সাপটাকে পাকড়াতে। সে হয়তো বানাতে চাইছে কোনো কোমরবন্ধ বা তার চর্বি দিয়ে কোনো মলম। তাছাড়া সাপের গন্ধ পেলেই তার গা কেমন গুলিয়ে ওঠে। যদি বা সে কখনো কোনোটার লেজ পাকড়ায় তা শুধু এই জন্যেই যে প্রত্যেক প্রাণীই চায় অন্তত অন্য আরেকজনের সঙ্গ। এখন আর সে বুনো শুয়োর দেখলে আক্রমণ করতে সাহস পায় না – যদি না প্রচণ্ড ক্ষুধা তাকে উত্তেজিত করে। এখন সে জলের পাখি, বেজি, ইঁদুর কিংবা গাঁয়ের গোলাবাড়ি থেকে পালিয়ে-আসা মুরগি খেয়েই নিজেকে তুষ্ট রাখে। তবে চিনিকলকে সে ভুলে গেছে। তার ঘণ্টার শব্দ এখন সব অর্থই হারিয়ে বসেছে। কুকুর এখন এমন সব পাথরের আড়ালে আশ্রয় খোঁজে মানুষের কাছে যা প্রায় অনধিগম্য। ড্রাগন গাছের এক জগতে থাকে সে, হাওয়া যার ডালপালায় দোল দিলেই নতুন পালানের মতো শব্দ ওঠে; থাকে অর্কিডের জগতে; অন্যগাছে বেয়ে-ওঠা লতার জগতে – যেখানে ধূসর কানঢাকা সবুজ গিরগিটি বুকে হাঁটে, যেগুলোর স্বাদ এত বিশ্রী আর সেই জন্যেই থাকুক তারা যেখানে খুশি। তার শরীর শুকিয়ে গেছে – পাঁজরার ওপর মাংসের আস্তর নেই আর, হাড় বেরিয়ে এসেছে, গায়ে জড়িয়ে আছে বুনো লতাপাতা যাদের কাঁটা নেই।

ফিরে এল বসন্ত, তার জ্বর নিয়ে। একদিন বিকেলে যখন এক অদ্ভুত অস্বস্তি তাকে কিছুতেই ঘুমোতে দিচ্ছিল না, হঠাৎ কুকুরের নাকে এসে পৌঁছল এক রহস্য-

ময় গোপন মেয়েলি গন্ধ—এত জোরালো, এমন প্রখর যে সেটা ছিল ঝোপের মধ্যে ছুটে পালিয়ে যাবার প্রথম কারণ। পাহাড়গুলো থেকে অনেক কুকুরের ডাকও ভেসে আসছে। এবার কুকুর গন্ধটা আঁকড়ে ধরল সজোরে। এক ঝরনা সাঁতরে পেরিয়ে গিয়েও আবার সে শুঁকে পেল তাকে। এখন আর সে ভয়ে কাবু নয়। গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলল সে সারা রাত, নাকটা প্রায় মাটি ছুঁয়ে আছে, আর জিভ থেকে লালা ঝরে পড়ছে। দিন ফুটতেই আস্ত গিরিখাত গন্ধে ম ম করে উঠল। যে-গন্ধ শুঁকে পেয়েছে, তার পেছন পেছন অনুসরণ ক'রে এসেছে বুনো কুকুরের একটা ঝাঁক। তাদের মধ্যে এমন কতগুলো পুরুষ আছে যাদের মুখের ছাঁদ নেকড়ের মতো, তাদের চোখ চকচক ক'রে উঠছে, সটান খাড়া তারা পায়ের ওপর, চড়াও হবার জন্য উদ্যত। আর মেয়েলি গন্ধ গাঢ় হয়ে উঠেছে তাদেরই পেছনে।

কুকুরের লাফটা ছিল মস্ত। তাড়া ক'রে এল বুনো কুকুরের ঝাঁক। তাদের শরীরগুলো গাদাগাদি—একজনের গায়ে আরেকজন। হিংস্র গর্জনের এক দুরন্ত বিশৃঙ্খল ঘূর্নি হাওয়া। কিন্তু তামার কলারের দাঁত চট ক'রে তাদের মুখ থেকে বার ক'রে আনল আর্তনাদ। মুখগুলো রক্তে মাখামাখি। কানগুলো ফালা ফালা। যখন দলের সবচেয়ে বয়স্ক পাণ্ডাটার গলা কুকুর পেল তখন তা ক্ষতবিক্ষত আর দু'টুকরো। অন্যরা পেছিয়ে এল—অর্থহীন রোষে তারা হিংস্রভাবে গর্জন করছে। তখন কুকুর ছুটে গেল রণক্ষেত্রের ঠিক মাঝখানে, ছাইরঙা রোঁয়া-খাড়া কুত্তিটার সঙ্গে শেষ যুদ্ধ সাঙ্গ করার জন্য—যে তার জন্য দাঁত বার ক'রে অপেক্ষা করছিল। মেয়েলি গন্ধটা মিলিয়ে গেল তার তলপেটের ছায়ায়।

৭

বুনো কুকুররা শিকার করে দল বেঁধে। তার জোরেই তারা বড় বড় জন্তু শিকার করতে পারে, আর তার মানেই হল বেশি মাংস আর প্রচুর হাড়। যখন কোনো হরিণের খোঁজ পায়, শিকার চলে অনেক দিন ধরে। প্রথমে তাড়া করে যাওয়া, তারপর জন্তুটি যদি কোনো বড়ো খাদ কোনোক্রমে লাফিয়ে ডিঙিয়ে যেতে পারে, তবে সেখানেই ইতি। তারপর যদি কোনো গুহা পড়ে শিকারের সময় তখন আক্রমণ। চোখে ঘা লাগুক বা গায়ে ক্ষত পড়ুক জন্তুটিকে শেষ অবধি মরতেই হয় কুকুরের দলের দাঁতের কাছে। যারা এমনকি তখনো জ্যান্ত শরীরটা থেকে চাপ চাপ বাদামি লোম খাবলে নেয়, উষ্ণ কিন্তু টাটকা রক্ত খায়। কোনো গলার শিরা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত, কিংবা কানের গোড়া থেকে, যেটা ছিঁড়ে নিয়েছে

কোনো কুকুরের কামড়। এই হিংস্র কুকুরগুলোর অনেকেই কানা—কোনো শিং হয় তো উপড়ে নিয়েছে চোখ। সকলের গায়েই কাটা দাগ, পচা ঘা, দগদগে কাঁচা মাংস বেরিয়ে আছে এখানে সেখানে। যেসব দিনে শিকার জোটে না, কুকুররা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে আর কুত্তিরা অপেক্ষা করে শুয়ে শুয়ে যুদ্ধের ফলাফল কী হয় জানবার জন্য—তাদের ঔদাসীন্য চমকপ্রদ। চিনিকলের ঘণ্টা—যার রণন কখনো কখনো বয়ে নিয়ে আসে হাওয়া—কুকুরের মনের মধ্যে কোনো স্মৃতিই জাগায় না।

একদিন বুনো কুকুররা একটা গন্ধ খুঁজে পেল লিয়ানা কাঁটাটোপ, আর ঐসব নরকের লতাপাতার মধ্যে যারা কাঁচা ঘা-কে বিষিয়ে দেয়। গন্ধটা কোনো কালো মানুষের। কুকুররা সাবধানে এগোল শামুক গুগলি-ছাওয়া সরু পথটা দিয়ে—যেখানে একটা বহুদিনের বুড়ো পাথর দাঁড়িয়ে আছে এক মরা মানুষের মতো মুখ বাড়িয়ে। মানুষ সাধারণত হাড়গোড়, নাড়িভুঁড়ি, টুকরোটাকরা ছড়িয়ে রাখে তাদের আশপাশে। তবু মানুষ সম্বন্ধে সাবধানে থাকাই ভাল, কারণ মানুষ হল সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী। কারণ তারা হাঁটে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, আর তার ফলেই তারা দূর থেকে লাঠি দিয়ে মারতে পারে, কিংবা ঢিল ছুঁড়তে পারে। কুকুরের ঝাঁক ঘেউ ঘেউ থামিয়ে দিল।

হঠাৎ লোকটা এসে হাজির। কালো মানুষের গায়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে সে। তার কবজি থেকে ঝুলছে বেড়ির শেকল, আর তাল রাখছে তার চলার সঙ্গে। আর তার ডোরাকাটা প্যান্টের কানার তলায় মোটা বেড়ির ঝমঝম। কিমারনকে চিনতে পারল কুকুর।

'কুকুর!'—কালো লোকটার গলায় খুশি। সে আবার ডাকল, 'কুকুর!'

ধীরে তার কাছে এগিয়ে এল কুকুর। তার পা শুঁকল, কিন্তু নিজেকে ছুঁতে দিল না। লেজ নেড়ে নেড়ে তাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরল। যখনই লোকটা ডাক দেয়, সে পালিয়ে যায়। আর যখন কেউ তাকে ডাকে না, সে যেন খুঁজে বেড়ায় মানুষের গলা, এককালে যা সে একটু একটু বুঝতে পারত। কিন্তু শব্দটা এখন তার কাছে এতটাই অচেনা লাগছে, আশ্চর্য ঠেকছে, এত বিপজ্জনকভাবে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেইসব হুকুম এককালে যেসব সে তামিল করত। শেষটায় কিমারন এগিয়ে এল এক পা, ঝুঁকে আলতো নরম হাত বাড়িয়ে দিল কুকুরের মাথার দিকে। কেমন অদ্ভুত চেঁচিয়ে উঠল কুকুর, কেমন একটা চাপা গর্জন যাতে কর্কশ রোষ মেশানো। কালো লোকটার গলা তাক করে সে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেছে এক পুরনো হুকুম, চিনিকলের ওভারসিয়ার যে-হুকুম দিয়েছিল অনেকদিন আগে, যেদিন এক ক্রীতদাস পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলের ঝোপে।

৮

যেহেতু কোনো মেয়েলি গন্ধে ভারি হয়ে নেই হাওয়া, আর দিনকাল বেশ শান্তিতে ভরা, বুনো কুকুররা ঘুমিয়েই তাদের ভোজের তৃপ্তি কাটিয়ে দিল। মাথার ওপর গাছের ডালের ওপর পাক খাচ্ছে শকুনরা, অপেক্ষা করছে কখন কুকুররা কাজটা পুরো শেষ না করেই এখান থেকে চলে যাবে। সবচেয়ে বেশি ফুর্তি করল কুকুর আর সেই ছাইরঙা কুত্তিটা—কিমারনের ডোরাকাটা কামিজ নিয়ে খেলা করতে দারুণ আমোদ তাদের। দুই প্রান্ত ধরে টান লাগায় দু'জনে, দাঁতের জোর পরখ ক'রে দেখবার জন্য। যখনই একটা টুকরো ছিঁড়ে যায়, তারা দু'জনে ধুলোয় গড়াগড়ি খায়। আর তারপরেই আবার শুরু করে, এ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত এত কাছে দাঁড়ায় তারা যে পরস্পরের নাক ছোঁয়, কারণ ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো ক্রমেই ছোট হয়ে এসেছে। অবশেষে এখান থেকে চলে যাবার হুকুম হল। তাদের ডাক মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে, বনের মধ্যে।

অনেক বছর ধরে, রাত্তিরবেলা, শিকারিরা ও-পথটা এড়িয়েই যেত। শেকল আর হাড়গোড় পথটা তাদের জন্য নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

অনুবাদ ॥ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাঁ-পল সার্ত্র

দেওয়াল

ওরা আমাদের একটি বড় ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল। ঘরটার দেওয়ালের রঙ সাদা। আলোর তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে চোখ পিট পিট করতে লাগল। তারপর দেখতে পেলাম সামনে একটি টেবিল, যার পিছনে চারজন বেসামরিক লোক কাগজের উপর চোখ বোলাতে ব্যস্ত। একদল বন্দীকে ওরা পিছনের দিকে জড়ো করে রেখেছে এবং ওদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য সমস্ত ঘরটাই অতিক্রম করতে হল। বন্দীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমার পরিচিত এবং বাকিরা বিদেশী। আমার সামনের লোক দু'জনের গায়ের রঙ হালকা বাদামী, মাথা গোলাকার—বোধহয় ফরাসি। ওদের মধ্যে অল্পবয়স্কটি হয়েছে স্নায়বিক উত্তেজনার শিকার—পরনের প্যাণ্ট ধরে সে টানাটানি করছে।

এইভাবে প্রায় তিনঘণ্টা কাটল। খুব পরিশ্রান্ত বোধ করছি, মাথার ভিতরটা শূন্য বোধ হচ্ছে। কিন্তু ঘরটাকে বেশ ভালভাবেই গরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সেজন্য আমি খুব আরাম বোধ করছি। কারণ, গত চব্বিশ ঘণ্টা যাবত শীতে কেঁপেছি। সান্ত্রীরা বন্দীদের একে একে টেবিলের কাছে নিয়ে যাচ্ছে। সেই চারজন লোক প্রত্যেককেই জিজ্ঞাসা করল নাম আর পেশা। অধিক ক্ষেত্রেই তারা বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করছে। যেমন—'যুদ্ধোপকরণের অন্তর্ঘাত-কার্যে কি তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?' অথবা 'নয় তারিখের সকালবেলা তুমি কোথায় ছিলে এবং কী করছিলে?' ইত্যাদি। ওরা উত্তর শুনছে না, অন্তত ওদের দেখে তাই মনে হল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আবার ওরা লিখতে আরম্ভ করল। টমকে জিজ্ঞাসা করল, সে যে 'ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে'[১] ছিল একথা সত্যি কিনা। সে অন্যরকম জবাব দিতে পারল না, কারণ ইতিমধ্যেই তার পকেট হতে এ-জাতীয় কাগজপত্র ওদের হস্তগত হয়েছে। খুয়ানকে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হল না, কিন্তু সে নাম বলার পর অনেকক্ষণ ওরা কীসব লিখল।

খুয়ান বলল, 'আমার ভাই খোসে একজন সন্ত্রাসবাদী। আপনারা তো জানেন সে এখানে আর থাকে না। আমি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত নই। রাজনীতির সাথে আমার কখনো কোনো সম্পর্ক ছিল না।'

ওরা কোনো উত্তর দিল না। খুয়ান বলে চলল, 'আমি কিছুই করি নি। কারো জন্যই আমি কোনো মূল্য দিতে রাজী নই।'

খুয়ানের ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। একজন সান্ত্রী তাকে থামিয়ে বাইরে নিয়ে গেল। এবার আমার পালা।

'আপনার নাম পাবলো ইবিয়েতা?'

'হ্যাঁ।'

লোকটি কাগজপত্র দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'রামন গ্রীস কোথায়?'

'আমি জানি না।'

'তুমি তাকে ছয় তারিখ হতে উনিশ তারিখ পর্যন্ত বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলে।'

'একথা সত্যি নয়।'

কিছুক্ষণ যাবত ওরা কীসব লিখল। তারপর সান্ত্রীরা আমাকে বাইরে নিয়ে এল। করিডরে টম ও খুয়ানসহ দু'জন সান্ত্রী অপেক্ষা করছে। আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম। টম সান্ত্রীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে?'

'তাহলে কী?'

'এটা শুধুমাত্র জেরা না বিচার?'

'বিচার' — সান্ত্রীটির উত্তর।

'ওরা আমাদের কী শাস্তি দেবে?'

নীরস কণ্ঠে সান্ত্রীটি উত্তর দিল, 'সেলের মধ্যেই দণ্ডাদেশ জানানো হবে।'

প্রকৃতপক্ষে হাসপাতালের ভূগর্ভস্থ ভাঁড়ারঘরকেই সেলে পরিণত করা হয়েছে। বায়ুপ্রবাহের ফলে সেলটি অত্যন্ত শীতল। সারারাত আমরা শীতে কেঁপেছি, এমন কি দিনের বেলায়ও অবস্থা এর থেকে ভাল ছিল না। মঠের একটা কুঠুরীর সেলে গত পাঁচদিন কেটেছে। কুঠুরী ঠিক নয় — দেওয়ালের মধ্যে একটা গর্তের মতো, বোধহয় তৈরি হয়েছিল মধ্যযুগে! ঘরের তুলনায় বন্দীদের সংখ্যা বেশি হওয়াতে যেখানে-সেখানে আমাদের বন্দী ক'রে রেখেছিল। কিন্তু সেজন্য দুঃখ নেই। সেখানে শীতে কষ্ট না পেলেও ছিলাম খুব নিঃসঙ্গ, কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত কিছুই বিরক্তিকর মনে হতো। কিন্তু এখানে আমার সঙ্গী আছে। খুয়ান কদাচিৎ কথা বলে, কারণ সে কমবয়সী এবং সেজন্য জীবন সম্বন্ধে তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না

থাকাতে হয়তো মতামত ব্যক্ত করতে ভয় পায়। কিন্তু টম তুখোড় বাক্যবাগীশ এবং সত্যিই স্প্যানিশ খুব ভাল জানত।

ভূগর্ভস্থ এই সেলে একটি বেঞ্চি আর চারটি মাদুর রয়েছে। যখন ওরা আমাদের সেলে ফিরিয়ে নিয়ে এল, আমরা বসে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে অপেক্ষা করলাম। কিছুক্ষণ পর টম বলল, 'আমরা প্যাঁচে পড়ে গেছি।'

'আমারো তাই মনে হয়। তবে এই বাচ্চা ছেলেটাকে কিছু করবে বলে মনে হয় না।'

টম অভিমত ব্যক্ত করল, 'ওকে অভিযুক্ত করার মতো যথেষ্ট কারণও নেই। ওর ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা—এর বেশি কিছু নয়।'

খুয়ানের দিকে তাকালাম। মনে হল না আমাদের কথাবার্তায় তার কান আছে। টম বলে চলল, 'তুমি কি জানো সারাগোসা সহরে ওরা কী করেছে? মানুষকে রাস্তায় শুইয়ে তাদের ওপর দিয়ে ট্রাক চালিয়ে দিয়েছে। একজন পলাতক মরক্কোবাসী[২] আমাকে একথা বলেছে। এটা নাকি গোলাবারুদ বাঁচাবার পন্থা!

আমি উত্তর দিলাম, 'কিন্তু তাতে তো পেট্রোল বাঁচে নি।' টমের উপর বিরক্ত হলাম, তার এসব কথা বলা মোটেই উচিত হয় নি। কিন্তু তবু সে বলে চলল, 'তখন অফিসাররা পকেটে হাত দিয়ে ধূমপান করতে করতে হেঁটে সবকিছু পরিদর্শন করত। তুমি কি ভাবছ তাদের সঙ্গে সঙ্গে শেষ করে দেয়? কখনই নয়। অমানুষিক যন্ত্রণায় হতভাগ্যরা আর্তনাদ করতে থাকে যতক্ষণ না অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসে। মরক্কোবাসী লোকটা বলছিল যে প্রথমবার এসব দেখে সে প্রায় বমি করে ফেলেছিল।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস এখানে ওরা এসব কিছু করবে না। অবশ্য যদি না তাদের গোলাবারুদে টান না পড়ে।'

চারটে ঘুলঘুলি ও সিলিং-এর বাঁদিকে একটা গোলাকার ছিদ্র দিয়ে আলো এসে পড়েছে। ছিদ্রটির মধ্য দিয়ে আকাশ দেখা যায়, এই ছিদ্র দিয়ে সেলের মধ্যে কয়লা ঢালা হয়। ছিদ্রটি বন্ধ করার ব্যবস্থাও আছে। ঠিক নিচে কয়লার স্তূপ। আগে এই ঘরটি ব্যবহৃত হতো সারা হাসপাতালকে গরম রাখার জন্য। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর সব রুগীকে সরিয়ে ফেলা হয়। এখনো অব্যবহৃত কয়লা পড়ে আছে। ছিদ্রটি কখনো বন্ধ করতে ভুলে গেলে জলে সব ভেসে যায়।

টম শীতে কাঁপতে আরম্ভ করল। বলল, 'হায় প্রভু যিশু! আমি বড়ই শীতার্ত! আবার আরম্ভ হয়েছে।'

সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর ব্যায়াম করা আরম্ভ করল। প্রতিবার অঙ্গচালনায় জামার ফাঁক দিয়ে ওর সাদা রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। এবার সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে পা দু'টো উপরে তুলে কৃত্রিম সাইকেল-চালনার ভঙ্গী করল। দেখলাম ওর পুরুষ্ট ভারি নিতম্ব থর থর করে কাঁপছে। টমের বিশাল মেদবহুল চেহারা। ভাবছিলাম কি সহজেই রাইফেলের গুলি কিংবা বেয়নেটের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ওর নরম মাখনের মতো শরীরে ঢুকে যাবে! টম যদি রোগা হতো, এসব চিন্তা আমার মাথায় আসত না।

যদিও আমি সেরকম শীতার্ত নই, তবুও হাত-পাগুলো ঠাণ্ডায় কেমন অবশ বোধ হচ্ছে! কখনো কখনো কী যেন আমি হারিয়েছি বোধ হতেই এদিক-ওদিক তাকাতাম আর তখনই মনে পড়ত ওরা আমাকে একটা গরম জামা পর্যন্ত দেয় নি। সত্যিই কেমন অসহ্যকর অবস্থা! আমাদের পরনের জামা কাপড়গুলো নিয়ে ওদের সৈন্যদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। আমাদের আছে শুধুমাত্র জামা আর ক্যানভাসের প্যাণ্ট—যা প্রচণ্ড গরমের সময় রুগীদের পরতে দেওয়া হতো। কিছুক্ষণ পর টম উঠে আমার পাশে এসে বসল…ও হাঁফাচ্ছে!

জিজ্ঞাসা করলাম, 'গরম লাগছে?'

'যিশুর নামে বলছি—না। কিন্তু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সন্ধ্যা প্রায় আটটার সময় একজন মেজর ঢুকল আমাদের সেলে। সঙ্গে দু'জন ফালানখিস্টা[৩]। মেজরের হাতে এক টুকরো কাগজ। সে সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'এদের তিনজনের নাম?'

'স্টাইনবক, ইবিয়েতা এবং মিরবাল।'

মেজর তখন চশমা পরে কাগজটা পড়তে লাগল, 'স্টাইনবক…স্টাইনবক…ও হ্যাঁ…আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। কাল সকালে আপনাকে গুলি করা হবে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'বাকি দু'জনকেও একই দণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

খুয়ান আর্তনাদ করে উঠল, 'অসম্ভব…আমি নই…!'

মেজর অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'খুয়ান মিরবাল।'

'আপনার নাম তো তালিকায় আছে। আপনাকেও একই দণ্ড দেওয়া হয়েছে।'

'আমি কিছুই করি নি।'

মেজর উত্তরে শুধু কাঁধ ঝাঁকালো। তারপর টম আর আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা কি বাস্কের[৪] অধিবাসী?'

'না, আমরা কেউ নই।'

দেখে মনে হল মেজর বিরক্ত হয়েছে। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে বলা হয়েছিল এখানে তিনজন বাস্কের অধিবাসী আছে। আমি তাদের পিছনে ছুটে বৃথা সময় নষ্ট করতে চাই না। তাহলে স্বভাবতই আপনাদের পাদরির দরকার নেই?'

আমরা উত্তর দিলাম না।

মেজর আরো বলল, 'শীগগিরই একজন বেলজিয়ান চিকিৎসক আসছে। আপনাদের সাথে সারারাত কাটাবার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছে।' সামরিক কায়দায় সেলাম ঠুকে সে বিদায় নিল।

টম মন্তব্য করল, 'তোমাকে যা বলেছিলাম তাই হল তো!'

'হ্যাঁ, তাই বটে! কিন্তু এ-ছেলেটার পক্ষে সত্যিই তা বর্বরোচিত!'

ছেলেটির প্রতি সহানুভূতির স্বরে কথাটা বললেও ওকে কিন্তু আমার তেমন ভাল লাগে নি। তার রোগাটে মুখ ভয়ে ও মানসিক যন্ত্রণায় বিবর্ণ, বিকৃত আর বৈশিষ্ট্যহীন। তিনদিন আগেও দেখেছি তাকে — কেমন প্রাণপূর্ণ শিশুর মতো ছিল! এখন তাকে দেখাচ্ছে রূপকথার বৃদ্ধের মতো। আমার মনে হয় ও আর আগের জীবন কখনো ফিরে পাবে না, এমনকি ওকে মুক্তি দিলেও নয়। ওকে সমবেদনা জানানো কিংবা অনুকম্পা করা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু তা একেবারেই বিরক্তিকর এবং ভীতিকরও বটে। কোনো কথা না বললেও তার হাত-পা কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মাটিতে বসে পড়ে বিস্ফারিত চোখে নিচের দিকে ও তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু টম নরম মনের মানুষ। টম ছেলেটার হাত ধরতে গেলে সে জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে ফুটিয়ে তুলল কুৎসিত ভঙ্গি।

নিচু স্বরে বললাম, 'ওকে একা থাকতে দাও। শীগগির ও আবার কাঁদতে বসবে।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও টম সরে এল। সে চেয়েছিল ছেলেটিকে একটু সমবেদনা জানাতে। হয়তো এতে সে নিজের ভবিষ্যৎ ভুলে এরকম সংকটময় মুহূর্ত কাটাতে পারত। কিন্তু এসব ব্যাপার আমার কাছে বিরক্তিকর। মৃত্যুচিন্তা আমাকে কখনো বিচলিত করে নি এবং তার কারণও ঘটে নি। কিন্তু বর্তমানে এহেন পরিস্থিতিতে মৃত্যু ব্যতীত আর কোনোকিছু চিন্তা করার নেই।

টম আবার কথা বলা আরম্ভ করল। জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কখনো কাউকে খতম করেছ?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম। টম বলে চলেছে যে সে আগস্ট মাস হতে এ-পর্যন্ত

ছ'জনকে খতম করেছে। আমি কিন্তু হলফ ক'রে বলতে পারি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ও চাইছে না। আমি নিজেও ঠিক উপলব্ধি করতে পারছি না। কল্পনা করছি 'গুলি'র কথা, গুলিবিদ্ধ হলে শারীরিক যন্ত্রণার কথা। সমস্ত চিন্তাই মূল প্রশ্নের সাথে জড়িত, তবুও আমি যথেষ্ট ধীর, স্থির ও শান্ত। সারারাত সময় আছে পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য। কিছুক্ষণের মধ্যেই টম কথা বলা থামালো। আমি অপাঙ্গে ওকে লক্ষ করতে থাকলাম। টমও কেমন ফ্যাকাসে আর বিবর্ণ হয়ে গেছে। নিজের মনে বললাম, 'এবার আরম্ভ হল।' ঘরটা প্রায়ান্ধকার ; ঘুলঘুলি দিয়ে আলো এসে কয়লার স্তূপের উপর পড়ে আলো-আঁধারির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সিলিং-এর ছিদ্র দিয়ে আকাশের একটা তারা দেখা যাচ্ছে। সুন্দর হিমশীতল রাত !

দু'জন সান্ত্রী বেশ ঝকঝকে পোশাক-পরিহিত একজন সুন্দরমতো লোককে নিয়ে দরজা খুলে ঢুকল। সে আমাদের নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আমিই সেই চিকিৎসক। এই চরম মুহূর্তে আপনাদের সাহায্য করার জন্যই আমার আগমন।' লোকটার কথা বলার ধরন বেশ সুন্দর এবং মার্জিত।

বললাম, 'আপনি এখানে কী চান ?'

'আমি আপনাদের সেবার জন্যই এখানে এসেছি। আপনাদের জীবনের শেষমুহূর্ত যাতে বেশি কষ্টকর না হয় তার জন্য আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব।'

'কিন্তু ঠিক আমাদের কাছে কেন ? আরো তো কতজন রয়েছে। পুরো হাসপাতালই তো বন্দীতে ভর্তি।'

'আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে,' লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সে উত্তর দিল। তারপর হঠাৎই দ্রুত বলে উঠল, 'আ !···ধূমপানে অবশ্যই আপনাদের আপত্তি নেই। আমার কাছে সিগারেট আর সিগার দুই-ই আছে।' বলতে বলতে আমাদের দিকে এগিয়ে ধরল ইংল্যাণ্ডে তৈরি সিগারেট আর দেশী সিগার। কিন্তু আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে সে এতে বেশ রেগে গেছে। বললাম, 'নিশ্চয়ই সহানুভূতি জানাবার জন্য আপনি এখানে আসেন নি। তাছাড়া আমি আপনাকে চিনি। আমার গ্রেপ্তারের দিন আপনাকে ফ্যাসিস্তদের সাথে ব্যারাকের উঠানে দেখেছিলাম।'

আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু অদ্ভুত কিছু একটা আমার মধ্যে ঘটল, আমি চুপ ক'রে গেলাম। এ-চিকিৎসকের উপস্থিতি আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সাধারণত কাউকে আমি ছেড়ে কথা বলি না। কিন্তু আরো কিছু বলার

উৎসাহই একেবারে নিঃশেষ। কাঁধ ঝাঁকিয়ে অন্যদিকে মুখ সরিয়ে নিলাম। একটু পরে মাথা তুলে দেখি চিকিৎসকটি কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সান্ত্রী দু'জন মাদুরের উপর বসে। রোগা লম্বাটে চেহারার সান্ত্রীটি — পেদ্রো যার নাম — আঙুল নিয়ে খেলা করছে। অপর সান্ত্রীটি মাঝে মাঝে মাথা দোলাচ্ছে যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে।

পেদ্রো হঠাৎ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করল আলোর প্রয়োজন আছে কিনা। চিকিৎসকটি হ্যাঁ-সূচক ঘাড় নাড়ল। বেলজিয়ান চিকিৎসককে দেখে মনে হল ও একটা প্রচণ্ড নির্বোধ, কিন্তু নিঃসন্দেহে ও বদমাশ নয়। ওর ভাবলেশহীন নীল চোখের দৃষ্টিতে কল্পনাশক্তির বড়ই অভাব, যা ওর একমাত্র ত্রুটি। পেদ্রো বেরিয়ে গিয়ে ফিরে এল একটা তেলের লণ্ঠন সাথে নিয়ে। লণ্ঠনটিকে বেঞ্চির এক কোণায় রাখল। আলোটা কমজোরি, কিন্তু এও মন্দের ভাল। গত সারারাত কেটেছে পুরোপুরি অন্ধকারে। বৃত্তাকার আলোর সৃষ্টি হয়েছে সিলিং-এর উপর। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোহিত হয়ে গেলাম।···হঠাৎ আমার সম্বিত ফিরে এল। সিলিং-এর বৃত্তাকার আলো অপসারিত হয়েছে। মনে হল আমার সারা শরীর দুরূহ বোঝায় বিধ্বস্ত! এটাকে আমি ঠিক কী বলে অভিহিত করব? এটা তো মৃত্যুচিন্তা কিংবা ভয় নয়! আমার সারা গাল জ্বলছে, মাথা অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর!

নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঠিকভাবে বসলাম। তাকালাম সঙ্গী দু'জনের দিকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে টম বসে আছে, আমি তার ফর্সা মাংসল ঘাড় ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছি না। ছোট্ট খুয়ানের অবস্থা আরো সঙ্গীন। মুখটা হাঁ ক'রে রয়েছে সে, নাসারন্ধ্র থরথর ক'রে কাঁপছে। চিকিৎসকটি তার কাছে গেল, সান্ত্বনা দেবার মতো করে কাঁধে হাত রাখল, তবুও খুয়ানের চোখ নিথর, ভাষাহীন। তখন লক্ষ করলাম, চিকিৎসকটি হাতটা ওর কাঁধ হতে ধীরে ধীরে বাহুতে নামিয়ে আনল, শেষে ধরল কবজি। খুয়ান কিন্তু তখনো নীরব, ভ্রূক্ষেপহীন। বেলজিয়ানটি তখন আলতো ক'রে তিনটি আঙুল দিয়ে খুয়ানের কবজি ধরল। তারপর একটু সরে এসে আমার দিকে পিছন ফিরে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো। একটু পিছনে হেলে দেখতে পেলাম চিকিৎসকটি পকেট হতে একটা ঘড়ি বের ক'রে সময় দেখে নিল, অথচ কবজিটি সেইভাবে ধরা আছে। কিছুক্ষণ পর নির্জীব হাত ছেড়ে দিয়ে সরে এসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ পকেট থেকে বের করল ছোট্ট একটা খাতা — যেন কি-একটা মনে পড়েছে যা এই মুহূর্তে না লিখে রাখলেই নয়। কয়েকটা লাইন লিখলও। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে মনে মনে বললাম, 'বেজন্মা! আমার কাছে

একবার এসো নাড়ি পরীক্ষার জন্য, এক ঘুষিতে তোমার চোয়াল আমি থেঁতলে দেব!'

ও কিন্তু আমার কাছে এল না, কিন্তু বুঝতে পারলাম ও আমাকে লক্ষ করছে। মাথা তুলে আমিও তাকালাম তার দিকে। সরাসরি আমাকে উদ্দেশ্য না করেই বলল, 'এখানে বেশ ঠাণ্ডা, তাই না?' ও শীতার্ত—শীতে ওকে নীলাভ দেখাচ্ছে।

উত্তর দিলাম, 'না, আমার শীত করছে না।'

ওর চোখের কঠিন দৃষ্টি সবসময় আমার ওপর নিবদ্ধ। হঠাৎ আমি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই মুখে হাত দিলাম : আমি প্রচণ্ডভাবে ঘেমে গেছি। শীতকালে শীতল বায়ুপ্রবাহের ফলে এই ঘরটা যখন অত্যন্ত ঠাণ্ডা তখনো আমি ঘামছি। মাথায় হাত দিতেই দেখি মাথার চুল ঘামে জবজবে। তখনই চোখ পড়ল পরনের জামার দিকে —ঘামে ভিজে চামড়ার সাথে সেঁটে গেছে। আমি বোধহয় ঘণ্টাখানেক ধরে ঘামছি, কিন্তু একেবারেই তা বুঝতে পারি নি। কিন্তু এই বেলজিয়ান চিকিৎসক··· শুয়োরের বাচ্চাটা···সবকিছু লক্ষ রেখেছে। সে দেখছে ঘাম ঝরছে আমার সারা মুখ হতে। আর নিশ্চয়ই ভেবেছে এসবই সেই চরম মুহূর্তের ভয়ের বহিঃপ্রকাশ। সে যে স্বাভাবিক এবং শীতার্ত এ-ব্যাপারটাই ওকে গর্বিত করেছে। ইচ্ছে করছিল এক ঘুষিতে ওর মুখ থেঁতলে দিই। কিন্তু যে-মুহূর্তে আমি নড়বার চেষ্টা করলাম, তৎক্ষণাৎ আমার সমস্ত রাগ আর লজ্জা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। নিরাসক্তভাবে বেঞ্চির উপর বসে পড়লাম। নিজেকে সান্ত্বনা জানাবার জন্যই রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছলাম, কারণ চুল থেকে ঘাড়ে ঘাম চুইয়ে পড়ছে যা খুবই অস্বস্তিকর। নিরর্থক ভেবে মোছা বন্ধ করলাম, সমস্ত রুমালটাই ঘামে ভিজে জবজবে। তবু ঘামছি। নিতম্বদেশও ঘামছে, ন্যাতানো প্যাণ্ট বেঞ্চির সাথে সেঁটে গেছে।

হঠাৎ খুয়ান বলে উঠল, 'আপনি চিকিৎসক?'

'হ্যাঁ'—বেলজিয়ানটির উত্তর।

'খুব যন্ত্রণাদায়ক···আর অনেকক্ষণ স্থায়ী?'

'অ্যাঁ? কখন···ও···না···না,' বেলজিয়ানটি পিতার মতো সহানুভূতির স্বরে উত্তর দিল। 'একেবারেই নয়। ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যায়।' কথা বলার ধরনে মনে হল ও একজন বিক্রেতা, নগদ টাকার ক্রেতাকে আশ্বাস দিচ্ছে।

'আমি কিন্তু···ওরা আমায় বলেছিল···যে কখনো কখনো দু'বার গুলি চালাতে

হয় ?' বেলজিয়ানটি সমর্থনসূচক মাথা নেড়ে বলল, 'কখনো কখনো, যদি না প্রথম-বারেই গুলিটা দেহের ঠিক জায়গায় বিদ্ধ হয়।'

'তারপর ওরা আবার রাইফেলে গুলি ভরে নিয়ে গুলি করে ?' তারপর খুয়ান এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে কর্কশস্বরে বলল, 'তাতে সময়ও লাগে !'

মানসিক যন্ত্রণার কথা ভেবে খুয়ান প্রচণ্ড ভীত। এ-কথাই সে কেবল চিন্তা করছে, কেননা সে অল্পবয়স্ক। আমি নিজে এ-সম্বন্ধে বেশি কিছু চিন্তা করি নি এবং আমি যে ঘামছি তার কারণ অবশ্যই মানসিক যন্ত্রণার ভয়ে নয়।

উঠে কয়লার স্তূপের দিকে এগিয়ে গেলাম। টম লাফিয়ে উঠে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছে ও, কারণ কয়লার গুড়োর উপর দিয়ে হাঁটবার সময় কর্কশ শব্দ হচ্ছিল। দেখলাম টমও ঘামছে—মনে প্রশ্ন জাগল, আমার মুখও তার মতো পার্থিব কি না।

অসম্ভব সুন্দর আকাশ! অন্ধকারময় কোণে কোনো আলো এসে পৌঁছায় নি। ঘাড় তুলে তাকালাম সপ্তর্ষিমণ্ডলের সন্ধানে। কিন্তু তা আগের মতো মনে হল না। গতরাতেও মঠের সেলে আকাশের এক বৃহৎ অংশকে দেখতে পেতাম এবং সারা দিনের প্রতিটি প্রহরই বিভিন্ন স্মৃতি বহন ক'রে আনত। সকালবেলা: যখন আকাশের রঙ হালকা নীল ও বাইরের আবহাওয়া থমথমে, তখন মনে পড়ত আটলান্টিকের বেলাভূমির কথা। দুপুরবেলায় সূর্যকে যখন দেখতাম তখন সেভিল সহরের একটা বারের কথা মনে পড়ত যেখানে পান করেছিলাম মান্সানিলিয়া[৫] আর খেয়েছিলাম জলপাইয়ের আচারের সাথে আঞ্চোভি মাছের রান্না। বিকেলবেলা যখন ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসত তখন মনে পড়ত সে-মাঠটার কথা যেখানে ষাঁড়ের লড়াই হতো, বিশাল মাঠের অর্ধেক অংশে ছায়া নেমেছে, বাকি অংশ তখনো সূর্যালোকে ঝলমল করছে। এইভাবে সমস্ত জীবনকে আকাশে প্রতিবিম্বিত হতে দেখা খুবই কষ্টসাধ্য অভিজ্ঞতা। এখন আমি যতক্ষণ খুশি আকাশ দেখতে পারি, কিন্তু কোনো কল্পনাই আমার মনে আর অনুরণিত হয় না। এটাই ভাল। ফিরে এসে টমের কাছে বসলাম। দীর্ঘ সময় এইভাবেই অতিক্রান্ত হল।

নিচু স্বরে টম কথা বলা আরম্ভ করল। তাকে কথা বলতে হতোই, অন্যথায় তার ভাবনায় নিজস্ব মানসিকতাকে প্রত্যক্ষ করতে সে পারত না। মনে হল আমার দিকে না তাকিয়েই সে আমার সাথে কথা বলছে। নিঃসন্দেহে সে আমার এই ফ্যাকাসে ও ঘর্মাক্ত চেহারার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছে। আমাদের দু'জনেরই

অবস্থা একই রকমের—যেন উভয়ে উভয়ের দর্পণ। টম তাকিয়ে দেখছে বেলজিয়ানটিকে—যে একমাত্র প্রাণপূর্ণ ও জীবন্ত।

টম বলল, 'ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছ? আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না।'

আমিও নিচু স্বরে কথা আরম্ভ করলাম। বেলজিয়ানটির দিকে তাকিয়ে বললাম, 'কেন? কী হল?'

'আমাদের ভাগ্যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে যা আমি বুঝতে পারছি না।'

টমের চারিদিকে কেমন একটা অদ্ভুত গন্ধ পাচ্ছি। মনে হল অন্যদের তুলনায় গন্ধ-সম্পর্কে আমি একটু অতিরিক্ত অনুভূতিশীল। দাঁত বের ক'রে হেসে বললাম, 'একটু বাদেই সবকিছু বুঝতে পারবে।'

অনমনীয় মনোভাবের সাথে সে বলল, 'ব্যাপারটা পরিষ্কার হল না। আমি অবশ্যই সাহসী হব, কিন্তু আমাকে অন্তত জানতে হবে···। মন দিয়ে শোনো, ওরা আমাদের উঠানে নিয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওরা আমাদের সামনে সার বেধে দাঁড়াবে। কিন্তু কতজন?'

'ঠিক বলতে পারব না। পাঁচ কিংবা আটজন। এর বেশি বোধহয় নয়।'

'ঠিক আছে, আটজনই হবে। ওদেরই কেউ একজন চেঁচিয়ে বলবে: লক্ষ্য স্থির কর। ঠিক তখনই দেখতে পাব আটটি রাইফেলের লক্ষ্য আমার দিকে। আমি চেষ্টা করব কীভাবে দেওয়ালের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়া যায়। সমস্ত শক্তি জড় ক'রে পিঠ দিয়ে দেওয়াল ঠেলব আমি। কিন্তু রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো দেওয়ালটা অনড় হয়ে থাকবে। আমি সবই কল্পনা করতে পারছি। তুমি যদি জানতে কত সুন্দরভাবে আমি এসব কল্পনা করতে পারছি!

বললাম, 'বেশ! বেশ! আমিও এসব বেশ কল্পনা করতে পারি।'

'সমস্ত ব্যাপারটাই আমাদের নরকযন্ত্রণা দেবে। তুমি কি জানো, ওরা নাক আর চোখ লক্ষ্য করে গুলি করে যাতে সারা মুখটাই বিকৃত হয়ে যায়,' বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠে বলল টম। 'আমি এখনই গুলির যন্ত্রণা শরীরে উপলব্ধি করছি। অনেকক্ষণ যাবত মাথায় আর গলায় যন্ত্রণা অনুভব করছি। আসল যন্ত্রণার তুলনায় তা অনেক তীব্র আর কষ্টকর। কাল সকালেই আসল যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। কিন্তু তারপর?'

টম কী বলতে চাইছে আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু আমি তা প্রকাশ করলাম না। আমার শরীরেও যন্ত্রণা অনুভব করছি—যেন অসংখ্য ক্ষত সারা শরীর জুড়ে। আমি যেন সেরে উঠি নি, কিন্তু শরীরজোড়া এই যন্ত্রণাকে আমি প্রাধান্য দিই নি।

টমের মতো আমিও এসবে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করি নি। কঠিন স্বরে বললাম, 'তারপর ? ...তারপর তোমার কবরে ফুল ফুটবে !'

ও নিজের সাথে কথা বলা আরম্ভ করল। অথচ এরই মধ্যে বেলজিয়ানটিকে ক্রমাগত লক্ষ করছে। তাকে দেখে মনে হল না যে সে টমের কথা শুনছে। আমি জানি সে এখানে কী করতে এসেছে। আমরা কী ভাবছি সে-বিষয়ে সে বিন্দুমাত্র উৎসাহী নয়। জীবন্ত অবস্থায় মৃত্যুভয়ের যন্ত্রণায় জর্জরিত আমাদের এই মানসিক অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যই তার আগমন।

'ঠিক রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো', টম বলে চলল। 'কিছু চিন্তা করতে গেলেই মনে হবে সব ঠিক আছে, কিন্তু যে-মুহূর্তে তুমি উপলব্ধি করতে যাবে তখনই সবকিছু মনের পট হতে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে। আমি নিজেকেই বলি যে এরপর আর কিছুই থাকবে না। এর প্রকৃত অর্থ আমি বুঝতে পারি না। কখনো কখনো মনে হয় যেন অনেকটা বুঝতে পারছি...পরে তা মিলিয়ে যায় এবং অবশেষে আবার যন্ত্রণা, গুলি আর বিস্ফোরণের কথা চিন্তা করতে থাকি। শপথ ক'রে বলতে পারি আমি একজন বস্তুবাদী। স্থির জেনো আমি উন্মাদ হব না। তথাপি কিছু একটা আছে। স্বচক্ষে আমি আমার মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করি। এটা কঠিন ব্যাপার নয়, কিন্তু আমিই হলাম একমাত্র যে স্বচক্ষে নিজের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করি। ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়েছে...আর ভাবতে হতোই...ভেবেছি যে আর কোনো কিছু দেখতে পাব না এবং সময়ের তালে জীবন এগিয়ে যাবে নিজস্ব গতিতে। পাবলো, আমরা এ-বিষয়ে চিন্তা করার জন্য জন্মাই নি। বিশ্বাস করো, ইতিমধ্যেই সারারাত কিছু একটা ঘটবে বলে আশা করেছি। কিন্তু এটা ঠিক কী, বোঝাতে পারব না : এটা পিছন থেকে হামাগুড়ি দিয়ে চুপি চুপি আমাদের কাছে এগিয়ে আসবে এবং আমরা সেজন্য মোটেই প্রস্তুত হতে পারব না।'

'চুপ করো, তুমি কি চাও আমি পাদরি ডাকি ?'

টম চুপ ক'রে রইল। আমি লক্ষ করেছি ইতিমধ্যেই ও নির্বিকারচিত্তে ধর্মগুরুর মতো আমাকে পাবলো বলে ডাকতে শুরু করেছে, যা আমি একেবারেই পছন্দ করি না। মনে হয় আইরিশদের স্বভাবই এরকম। অস্পষ্ট ধারণা হল ও বুঝি প্রস্রাবের দুর্গন্ধ পেয়েছে। বস্তুত টমের জন্য আমার কোনো সহানুভূতি ছিল না। বুঝতে পারছি না, যেহেতু একই সঙ্গে আমরা মৃত্যুবরণ করতে চলেছি এইজন্যই কি ওর প্রতি আমাকে সহানুভূতিশীল হতে হবে। অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়তো বা অন্য-রকম কিছু হতো। উদাহরণস্বরূপ রামন গ্রীসের কথা বলা যেতে পারে। টম ও

খুয়ানকে পেয়েও আমি নিঃসঙ্গ বোধ করছি। রামন গ্রীস থাকলে হয়তো অনেক বেশি কোমল স্বভাবের হতাম। কিন্তু আমি এখন অস্বাভাবিকভাবে রুক্ষ ও কঠোর এবং এ-ভাবেই আমি থাকতে চেয়েছি।

অস্পষ্ট স্বরে টম কথা বলে চলেছে যা ওর বিক্ষিপ্ত মনের পরিচয়। চিন্তামুক্ত হবার জন্যই ও নিজেকে কথা বলায় ব্যস্ত রেখেছে। মনে হল টম বয়স্কদের মতো মূত্রাশয়ের রোগে ভুগছে। স্বভাবতই আমি ওর সঙ্গে একমত ছিলাম। ও যা বলেছে আমিও তা-ই বলতে পারতাম : মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। যেহেতু আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছি, কোনো কিছুই আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না—যেমন কয়লার এই স্তূপ, কাঠের বেঞ্চি বা পেদ্রোর কুৎসিত মুখ। টমের ও আমার চিন্তা যে একই পর্যায়ের এ-ভাবনাটা আমাকে অখুশি করল। আমি এও জানি সারারাত ধরে প্রতি পাঁচমিনিটে আমি আর টম একই সময় একই চিন্তা করেছি, একই সময়ে ঘেমেছি এবং একই সময়ে শীতে কেঁপেছি। পাশ থেকে ওর মুখের দিকে তাকাতেই এই প্রথম ওকে কেমন অদ্ভুত মনে হল : মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছায়া ওর মুখে। আমার সমস্ত গর্ব মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। গত দীর্ঘ চব্বিশ ঘণ্টা টমের সাথে কাটিয়েছি, তার কথা শুনেছি, আমার কথা শুনিয়েছি। কিন্তু আমি এও জানি আমাদের দু'জনের মানসিকতার কোনো মিলই নেই। এবং এখন আমাদের মনে হচ্ছে আমরা যেন যমজ ভাই। কারণটা খুবই সাধারণ : আমরা একই সাথে মৃত্যুবরণ করতে চলেছি। টম আমার দিকে না তাকিয়েই আমার হাত ধরে বলল, 'পাবলো, আমি ভেবে অবাক হচ্ছি…অবাক হচ্ছি যে সত্যিই সবকিছুরই পরিসমাপ্তি ঘটে।'

হাত সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'এই জানোয়ার…একবার পায়ের দিকে নজর দিয়ে দেখো।'

ওর দু'-পায়ের মাঝে ঘোলাটে জল জমা হয়েছে এবং ওর প্যান্ট থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে।

ভয়ার্ত কণ্ঠে টম বলল, 'এসব কী?'

বললাম, 'তুমি প্যান্টেই প্রস্রাব ক'রে ফেলেছ।'

প্রচণ্ড রেগে চিৎকার ক'রে সে উত্তর দিল, 'মিথ্যে কথা। আমি প্রস্রাব করি নি। আমার প্রস্রাবই পায় নি।'

বেলজিয়ান চিকিৎসকটি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে মিথ্যা সান্ত্বনার সুরে বলল, 'আপনি কি অসুস্থ বোধ করছেন?'

টম উত্তর দিল না। বেলজিয়ানটি ওর প্যাণ্টের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু বলল না।

হিংস্র স্বরে টম বলল, 'আমি জানি না এসব কী। আমি কিন্তু ভীত নই। শপথ করে বলছি আমি ভয় পাচ্ছি না।'

বেলজিয়ানটি কোনো কথা বলল না। টম উঠে ঘরের এক কোণায় প্রস্রাব করতে বসল। প্যাণ্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে ফিরে এসে কোনো কথা না বলে বসে পড়ল। বেলজিয়ানটি আবার কীসব লিখতে লাগল।

আমরা তিনজনই তাকে দেখছি কারণ এখানে তার অস্তিত্বই একমাত্র জীবন্ত। তার ব্যবহার ও অঙ্গসঞ্চালন একজন জীবন্ত মানুষের মতো। একজন রক্তমাংসের মানুষের মতোই তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মন। ভূগর্ভস্থ শীতল সেলে ও কাঁপছে একজন স্বাভাবিক মানুষের মতো। তার সুদেহ স্বাভাবিক মনের পরিচয় দিচ্ছে। আমরা নিজেদের কথা একেবারেই ভাবছি না, অন্তত আমাদের চিন্তাধারার তো কোনো মিলই নেই। আমার নিজের অবস্থা জানবার জন্য দুই উরুর মাঝখানে প্যাণ্টের দিকে তাকাবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। আমার চোখ বেলজিয়ানটির উপর – দু'-পায়ের উপর ভারসাম্য বজায় রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে, যে ইচ্ছামতো অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে এবং একমাত্র যে ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারে। আমরা তিনজন এখানে নিঃসাড় রক্তহীন ছায়াবিশেষ – রক্তশোষণকারী বাদুড়ের মতো আমাদের লক্ষ্য ওর প্রাণ।

শেষপর্যন্ত ও খুয়ানের কাছে এগিয়ে এল। সে যে খুয়ানের ঘাড়ে হাত বোলাচ্ছে, সেটা কি বৃত্তির তাগিদে, অথবা তার নরম কোমল মনের তাগিদে? যদি সে আপন মনের তাগিদে এ-কাজ করে তো সারারাতে এখন একবারই সে এটা করছে। সে খুয়ানের মাথা ও গলায় সোহাগভরে হাত বোলাতে লাগল। খুয়ানও এ-ব্যাপারে ভাবলেশহীন, কিন্তু তার নজর সবসময় বেলজিয়ানটির উপর। হঠাৎ খুয়ান ওর হাত জড়িয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল – অদ্ভুত তার চোখের দৃষ্টি। খুয়ান ওর হাত নিজের দু'হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে বটে, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে আন্তরিকতা নেই – মনে হচ্ছে সাঁড়াশির দুই দাঁড়ার মাঝে একটি মাংসল লালচে হাত। অনুমান করছি কিছু একটা ঘটতে চলেছে, বোধহয় টমও তাই ভাবছে। বেলজিয়ানটি কিন্তু খুয়ানের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি, তার মুখে তখনো পিতার মতো স্নেহের হাসি। কিছুক্ষণ পর খুয়ান ওর লালচে মাংসল হাতটা হঠাৎ মুখের কাছে এগিয়ে নিয়ে কামড়াবার চেষ্টা করল। বেলজিয়ানটি খুব তাড়া-

তাড়ি হাত ছাড়িয়ে এক লাফে দেওয়ালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এক মুহূর্তের জন্য সে আতঙ্কিতভাবে আমাদের দিকে তাকালো, বুঝতে পারল, আমরা দু'জনে খুয়ানের মতো অপ্রকৃতিস্থ নই। আমি হাসতে আরম্ভ করতেই একজন সান্ত্রী লাফ দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো। অপরজন তখনো ঘুমিয়ে—তার বিস্ফারিত চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

একই সময়ে অনুভব করলাম আরাম এবং তীব্র উত্তেজনা। কাল প্রত্যুষে আমার ভাগ্যে কী ঘটবে অথবা মৃত্যু-সম্পর্কে চিন্তা করতে ইচ্ছা করছে না, কেননা, তাতে কোনো ফল হবে না। একমাত্র কথা এবং বিশাল শূন্যতা ব্যতীত কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। যখনই অন্য কিছু সম্বন্ধে ভাবতে চেষ্টা করছি তখনই চোখের সামনে ভেসে উঠছে আমার দিকে লক্ষ্যস্থির করা রাইফেল। বোধহয় কুড়িবারের মতো আমি মৃত্যুদণ্ডের সম্মুখীন হয়েছিলাম। একবার তো প্রায় আমার মৃত্যুই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল দেওয়ালের দিকে, আর আমি প্রচণ্ডভাবে ওদের বাধা দিচ্ছিলাম, ক্ষমা ভিক্ষাও করছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়ে বেলজিয়ানটিকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। আশঙ্কা হল—বোধহয় ঘুমের মধ্যে আর্তনাদ ক'রে ফেলেছি। কিন্তু ও গোঁফে হাত বুলাচ্ছে, কোনোকিছু নজর করছে না। ইচ্ছা করলে অবশ্যই কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতে পারতাম। গত সুদীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা জেগে কাটিয়েছি—সংযমের প্রায় শেষসীমায় এসে উপস্থিত হয়েছি। কিন্তু জীবনের শেষসময়ে এসে দু'ঘণ্টাও আমি হারাতে রাজি নই। কাল প্রত্যুষেই ওরা আমাকে জাগাতে আসবে, তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আমি ওদের অনুসরণ করব। মৃত্যুর আগে হয়তো একবার চিৎকার ক'রে উঠতেও পারব না। এইভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে আমি রাজি নই। একটা ইতর প্রাণীর মতো মৃত্যু আমি চাইছি না—আমি সবকিছু উপলব্ধি করতে উন্মুখ। ভয় পাচ্ছি রাত্রির দুঃস্বপ্নের জন্য। উঠে দাঁড়ালাম। ভাবনা পাল্টাবার জন্য ইতস্তত পায়চারি করতে করতে অতীত জীবনের কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এক ঝাঁক পুরনো স্মৃতি মানসপটে ভিড় করছে—মন্দ ভাল দুই-ই। অন্তত আগে যা মনে হয়েছিল। অনেক মুখ, ফেলে আসা অতীতের অনেক স্মৃতি মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ছোট্ট নোভিলিয়েরোরঙ্কু মুখ—যে কি না ভালেনসিয়া সহরে ফেরিয়া উৎসবের ষাঁড়ের লড়াইয়ে রক্তাক্ত অবস্থাতেও লড়াই চালিয়েছিল। মনে পড়ছে রামন গ্রীসের মুখ, আমার কাকার মুখ। ফেলে-আসা অতীতের সব ঘটনা চোখের সামনে ভাসছিল—কীভাবে ১৯২৬ সালে তিনমাস বেকার থাকা অবস্থায় দারিদ্র্য

ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলাম। মনে পড়ছে গ্রেনাদে সহরে থাকাকালীন একটি বিশেষ রাতের কথা—প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পার্কের একটা বেঞ্চির উপর শুয়ে রাতটা অতিবাহিত করেছিলাম; তার আগে তিনদিন কেটেছিল অনাহারে। আমি উন্মত্তের মতো হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু মৃত্যু কামনা করি নি। এ-ব্যাপারটা সত্যিই আমাকে উপহাস করেছিল। কীভাবে আমি উন্মত্তের মতো সংগ্রাম করেছিলাম—স্বাধীনতার জন্য, শান্তির জন্য, নারীর জন্য! কিন্তু কেন? আমি স্পেনকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলাম। আমি পি ই মারগালকে[৭] শ্রদ্ধা করি—তিনিই আমার আদর্শ পুরুষ। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সবকিছুই ছিল আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, যেন আমি মৃত্যুহীন, অমর!

সেই সময় আমার ধারণা ছিল অবশিষ্ট জীবনটাই তো পড়ে রয়েছে এবং ভেবেছিলাম এসবই মিথ্যা। এখন এ-জীবনের কোনো মূল্যই নেই, কেননা এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে। নিজের প্রশ্নের কাছে উত্তর প্রত্যাশা করেছি, কেন আমার এতো পরিবর্তন ঘটেছে—আমি আগে কীভাবে মেয়েদের সাথে মিশতাম, তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা ক'রে সময় কাটাতাম। যদি বুঝতে পারতাম এভাবে আমি মৃত্যুবরণ করব তাহলে হয়তো এসব কিছুই করতাম না। সত্তা দিয়ে আমার জীবনকে বিচার করছি, এ-সুন্দর জীবনে প্রায় সবকিছুই এখনো অপূর্ণ। এক মুহূর্তের জন্য হিসাব করবার চেষ্টা করেছি। মনে হয়েছে, জীবনটা সত্যিই কী সুন্দর! কিন্তু কোনো উপসংহারে আসতে পারছি না, একটা খসড়া তৈরি করতে পেরেছি মাত্র! মরীচিকার পিছনে ছুটেছি যেন আমি অমর · শাশ্বত। কিছুই উপলব্ধি করতে সক্ষম হই নি। আমি কিছুই হারাই নি, অথচ হারাতে পারতাম, যেমন—মান্সানিলিয়ার অপূর্ব স্বাদ অথবা কাদিজ সহরের ধারে সমুদ্রতীরের ছোট্ট বেলাভূমিতে স্নানের আনন্দ। কিন্তু মৃত্যু আমাকে সবকিছু থেকে মোহমুক্ত ক'রে দিয়েছে।

হঠাৎ বেলিজিয়ানটির মাথায় এল অদ্ভুত চিন্তা। সে বলল, 'প্রিয় বন্ধুরা, আপনারা যদি প্রিয়জনের কাছে কোনো শুভেচ্ছাবাণী পাঠাতে চান, তবে আমি সেই দায়িত্ব নিতে রাজি আছি। অবশ্য সামরিক বিভাগ যদি এ-বিষয়ে অনুমতি দেয়।'

টম নিরুৎসাহ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'আমার কোনো প্রিয়জন নেই।' আমি উত্তর দিলাম না। একটু পরে টম কৌতূহলী হয়ে আমাকে বলল, 'কোঙ্কাকে বলার মতো কিছু নেই?'

'না।'

ওর এই কোমল প্রস্তাবে বিরক্ত হলাম। এটা অবশ্য আমারই ভুল। গতরাতে কোঞ্চার কথা ওকে বলেছিলাম। তখন আমার সংযমী হওয়া উচিত ছিল। গত এক বৎসর যাবত কোঞ্চা ছিল আমার বান্ধবী। গতরাতে মাত্র পাঁচমিনিটের জন্য ওকে দেখতে আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম, এজন্য আমি আমার একটা হাত বিসর্জন দিতে রাজি ছিলাম। সেই জন্যই আমি টমের কাছে কোঞ্চার কথা বলেছিলাম, ওই অনুভূতি তখন ছিল তীব্রতম। এখন টমকে কোঞ্চার কথা বলার কোনো বাসনাই নেই, এমন কি কোঞ্চাকে দেখবার কোনো বাসনাও আমার নেই। কোঞ্চাকে আলিঙ্গনে নিষ্পেশিত করতেও মন চাইছে না। আমার নিজের দেহ সম্বন্ধেই বেশি ভয়। ভয়ে আমার সারা শরীর হয়ে গেছে ফ্যাকাসে এবং ঘর্মাক্ত। হয়তো আমার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কোঞ্চা কাঁদবে, কয়েক মাস হয়তো জীবন সম্বন্ধে তীব্র অনীহা দেখা দেবে। যাই হোক, আমি তাদেরই একজন যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে। কোঞ্চার সুন্দর চোখদুটো কেমন মায়াবী! সে যখন আমার চোখের দিকে তাকাতো, তার চোখের দৃষ্টি আমার হৃদয়ে আলোড়ন তুলত। কিন্তু এখন সবকিছুর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন সে যদি আমার দিকে তাকায়, আমি কিছুই অনুভব করব না। আমি এখন একা।

টমও নিঃসঙ্গ। কিন্তু ওর এই একাকিত্বের বেদনা আমার মতো নয়। বেঞ্চির উপর ও বসে, দু'পাশে পা ঝুলিয়ে। মুখে স্মিত হাসি—একদৃষ্টিতে বেঞ্চির দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুটা যেন বিহ্বল ও। ধীরে ধীরে হাতটা বাড়িয়ে খুব সাবধানে বেঞ্চিটা স্পর্শ করল, যেন সাবধানী না হলে জিনিসটা ভেঙে যেতে পারে। পরক্ষণেই শিউরে উঠে হাতটা গুটিয়ে নিল। ওর হাতটা কাঁপছে। যদি টম হতাম, অবশ্যই আমি বেঞ্চি স্পর্শ ক'রে আত্মতৃপ্ত হতাম না। এটাও একধরনের আইরিশ স্বভাব! অবশ্য আমিও মাঝে মাঝে লক্ষ করেছি বস্তুর গঠন কেমন অদ্ভুত মজাদার হয়! সাধারণ বস্তুর অপেক্ষা সেগুলো অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ঘন। বেঞ্চি, লণ্ঠন, কয়লার স্তূপ ইত্যাদি লক্ষ করাই এখন যথেষ্ট, কারণ আমি উপলব্ধি করছি যে আমি মৃত্যুবরণ করতে চলেছি। স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যু সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু চিন্তা করতে পারছি না, কিন্তু চারিদিকে মৃত্যুর সুস্পষ্ট ছাপ প্রত্যক্ষ করছি—আমার চারপাশে যে-বস্তুগুলি এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে মানুষ যেরকম ধীরভাবে সান্ত্বনা দেয়। এইমাত্র যে টম বেঞ্চিটাকে স্পর্শ করল এটাই তার মৃত্যুর ইঙ্গিত।

এরকম মানসিক অবস্থায় কেউ যদি আমাকে জানাতো, স্বচ্ছন্দেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে পারি এবং ওরা আমাকে সমগ্র জীবন ফিরিয়ে দিচ্ছে তাহলে সেই সংবাদ আমার মনে কোনো সাড়াই জাগাতে পারবে না। মানুষ যে-মুহূর্তে অমরত্বের মোহমুক্ত হয়, সে-মুহূর্ত থেকেই কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক বৎসর তার কাছে সমান। আকাঙ্ক্ষিত কিছুই নেই, তাই আমি ধীর, স্থির, শান্ত। কিন্তু এই স্থিরতা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, কারণ আমার দেহ, চোখ দিয়ে দেখে ও কানে শুনে অনুভব করছি যেন এ-দেহের মালিক আমি নই। নিজের থেকেই শরীর ক্রমাগত ঘামছে ও কাঁপছে। অবশেষে এ-দেহকে আমি চিনতেই পারছি না। নিজের নয় অন্য কারো শরীর এবং কী হচ্ছে জানতে গিয়ে নিজেকে স্পর্শ করছি ও দেখছি। অবশেষে অনুভব করছি যেমন উড়োজাহাজে বসে হঠাৎ খুব নিচু হয়ে সরাসরি অবতরণ যেমন অনুভব করা যায়, তেমনি আমি তলিয়ে যাচ্ছি। কিংবা হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারছি, কিন্তু তাতে কোনো সান্ত্বনা নেই। শরীরের যে কোনো অভিব্যক্তিই বর্তমানে আমার কাছে অসহ্য। এ-অভিব্যক্তি আমার কাছে এক গুরুভার আবর্জনার মতো। মনে হয় আমি যেন এক বিশালাকায় কীটের আলিঙ্গনে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে আছি। হঠাৎ একসময় বুঝতে পারলাম পরনের প্যাণ্ট ভিজে গেছে—কারণটা প্রস্রাব না ঘাম বুঝতে পারলাম না। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রস্রাব করতে এগিয়ে গেলাম স্তূপীকৃত কয়লার দিকে।

বেলজিয়ানটি পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখল। তারপর বলল, 'এখন সাড়ে তিনটা বাজে।'

বেজন্মা! নিশ্চয়ই কোনো অভিসন্ধি নিয়েই সে সময়টা জানালো। টম লাফিয়ে উঠল। সময় যে এইভাবে অতিবাহিত হচ্ছে সে-ব্যাপারে আমাদের কোনো খেয়ালই নেই। রাত্রিটা নিরবয়ব বিষাদ স্তূপের মতো আমাদের গ্রাস করেছে। আমিও মনে করতে পারছি না যে এই রাত্রি আদৌ আরম্ভ হয়েছে কিনা!

ছোট্ট খুয়ান কাঁদতে আরম্ভ করল। প্রচণ্ড হাত নেড়ে ও আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে বলতে লাগল, 'আমি মরতে চাই না, আমি মরতে চাই না!'

এইভাবে সে হাত তুলে সেলের মধ্যে দৌড়াতে লাগল এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাদুরের উপর আছড়ে পড়ল। করুণভাবে টম তাকালো ওর দিকে—সান্ত্বনা দেবার কোনো অভিপ্রায়ই তার নেই। খুয়ানের আচরণ মোটেই যন্ত্রণার কারণে নয়। আমাদের তুলনায় সে অতিমাত্রায় সোরগোল শুরু করেছে—কিন্তু সে অনেক কম যন্ত্রণাবিদ্ধ। ঠিক যেমন একজন রোগগ্রস্ত মানুষ শুধুমাত্র

শারীরিক উত্তাপ দিয়ে নিজের অসুস্থতার বিরুদ্ধে সওয়াল করে। বিষয়টার গুরুত্ব অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়, যখন শরীরে উত্তাপই থাকে না।

খুয়ান কেঁদেই চলেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে সে নিজেকেই করুণা করছে। মৃত্যুচিন্তা তার নেই। এক মুহূর্তের জন্য···মাত্র এক মুহূর্তের জন্য কাঁদবার ইচ্ছা হল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত—এক পলকের জন্য খুয়ানের ক্রন্দনরত অবয়বের দিকে চোখ পড়ল, ওর অপুষ্ট কাঁধ কাঁপছে। নিজেকে অমানুষ মনে হল, কারণ পারছি না অনুকম্পা দেখাতে নিজেকে বা অন্য কাউকে। নিজের মনে বললাম, 'আমি পরিচ্ছন্নভাবে মৃত্যুবরণ পছন্দ করি।'

টম উঠে দাঁড়ালো, গোল ছিদ্রের নিচে দাঁড়িয়ে দিনের আলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। আমার সংকল্প স্থির : পরিচ্ছন্নভাবেই আমি মৃত্যুবরণ করব। আমি কেবল এ-চিন্তাই করছিলাম। কিন্তু যে-মুহূর্তে চিকিৎসকটি সময় ঘোষণা করল, তখনি মনে হল, সময় খুব সন্তর্পণে পলে পলে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছে।

টম যখন আবার কথা বলা আরম্ভ করল তখনো অন্ধকার কাটে নি।

'তুমি কি ওদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

উঠানে লোকদের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

'ওরা মাথামুণ্ডু কী করছে? এই অন্ধকারে গুলি করা ওদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

কিছুক্ষণ সব নিশ্চুপ।

টমকে বললাম, 'সকাল হয়েছে।'

পেদ্রো হাই তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়ালো। তারপর লণ্ঠন নিভিয়ে সঙ্গী সান্ত্রীর উদ্দেশ্যে মন্তব্য করল, 'অসম্ভব শীত!'

সমস্ত সেলটা কিরকম বিবর্ণ মনে হল। দূর থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ।'

টমকে বললাম, 'আবার শুরু হয়েছে। পিছনের চত্বরেই ওরা কাজটা সমাধা করবে।'

চিকিৎসকটির কাছে টম সিগারেট খুঁজল। সিগারেট অথবা মদ—কোনোটারই আমার দরকার নেই। এরপরই ভেসে এল ক্রমাগত গুলির শব্দ।

টম বলল, 'ব্যাপারটা কী, বুঝতে পারছ?'

আরো কিছু বলতে গিয়ে দরজা লক্ষ ক'রে টম থেমে গেল। দরজা খুলে একজন লেফটেনান্ট ঢুকল, সঙ্গে চারজন সৈন্য। টম সিগারেট ফেলে দিল।

'স্টাইনবক ?'

টম উত্তর দিল না। পেদ্রো আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

'খুয়ান মিরবাল ?'

'ঐ যে—মাদুরের উপর পড়ে আছে।'

লেফটেনাণ্ট আদেশ দিল, 'উঠে আসুন।'

খুয়ান কিন্তু নড়ল না। দু'জন সৈন্য ওকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। কিন্তু হাত ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও লুটিয়ে পড়ল। সৈন্য দু'জন ইতস্তত করতে লাগল।

লেফটেনাণ্ট বলল, 'এরকম অসুস্থ অনেকেই হয়। আপনারা ওকে তুলে নিয়ে আসুন। ওখানেই ও ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর টমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাহলে আসুন।'

দু'জন সৈন্যের সাথে টম বেরিয়ে গেল। বাকি দু'জন ছোট্ট খুয়ানকে পাঁজাকোলা ক'রে কোলে তুলে ওদের অনুসরণ করল। খুয়ান কিন্তু জ্ঞান হারায় নি—ওর চোখ দু'টো বিস্ফারিত এবং গাল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে। যাবার জন্য পা বাড়াতেই লেফটেনাণ্ট আমার পথ রোধ করল।

'আপনিই কি ইবিয়েতা ?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণ বাদেই আপনাকে নিতে আসবে ওরা।'

সকলে চলে গেল। বেলজিয়ানটি ও সান্ত্রী দু'জনও বেরিয়ে গেল। এখন আমি একা। কী ঘটছে ধারণা করতে পারছি না, কিন্তু আরো খুশি হতাম যদি ওরা আমার ব্যাপারটাও তক্ষুনি মিটিয়ে দিত। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর যথারীতি গুলির শব্দ ভেসে আসছে এবং প্রতিবারই কেঁপে উঠছি। খুব জোরে চিৎকার করতে আর চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হল। অথচ পকেটে হাত দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, কেননা আমাকে এই মুহূর্তে স্থির হয়ে থাকতে হবে।

প্রায় একঘণ্টা পরে ওরা আমায় খুঁজতে এল এবং দোতলায় একটা ছোট্ট ঘরে আমাকে নিয়ে এল। সিগারের পোড়া গন্ধে ঘরটা ভর্তি, গরম পরিবেশে দম বন্ধ হয়ে আসছে। দু'জন সামরিক অফিসার আরামকেদারায় বসে আছে, হাঁটুর উপর কাগজপত্র রেখে ওরা ধূমপান করছে।

'তোমার নাম ইবিয়েতা ?'

'হ্যাঁ।'

'রামন গ্রীস কোথায় ?'

'আমি জানি না।'

আমার প্রশ্নকর্তা খর্বকায়, কিন্তু মোটা। চশমার মধ্য দিয়ে ওর চোখ দু'টোকে রুক্ষ ও কঠোর মনে হচ্ছে। আমাকে আবার প্রশ্ন করল সে, 'সামনে এস।'

কাছে এগিয়ে গেলাম। সে উঠে এসে আমার বাহুদু'টো ধরে এমনভাবে আমার দিকে তাকালো যেন মনে হল এক্ষুণি আমাকে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে দেবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শক্তি দিয়ে আমাকে চেপে ধরল। এতে আমি মোটেই কাবু হলাম না, উপরন্তু মনে হল এটা নিছকই খেলা! এইভাবেই ও আমার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। ও চাইছে ধোঁয়াভর্তি প্রশ্বাস আমার মুখের উপর ফেলতে। এইভাবে কয়েক মুহূর্ত থাকার পর আমার হাসি পেল। যে-মানুষ মৃত্যুবরণ করতে চলেছে তাকে ভয় দেখাতে অনেক ধকল করতে হয়। কিন্তু এতে কোনো কাজ হল না। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ও আবার বসে পড়ল। তারপর বলল, 'রামন গ্রীসের বদলে তোমাকে মরতে হচ্ছে। সে কোথায়, একথা বললে তুমি মুক্তি পাবে।'

সামরিক-পোশাকে সজ্জিত এই দু'জন অফিসার—এদের পায়ে বুট ও হাতে চাবুক—এরাও অবশ্য মরতে চলছে! তবে, আমার কিছু সময় পরে, খুব বেশিক্ষণ পরে অবশ্য নয়! খুব ব্যস্তসমস্ত ভাব নিয়ে ওরা কাগজের স্তূপের মধ্যে নামগুলোকে খুঁজছে; যাদের ওরা বন্দী ক'রে উপযুক্ত শাস্তি দিতে চায়। স্পেনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও ওরা আলোচনা করছে। ওদের এসব গুরুত্বহীন কর্ম-তৎপরতা আমার কাছে প্রহসন ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না। ওদের মতো নিজেকে কিছুতেই মনে করতে পারছি না। ওদের হাবভাবে মনে হচ্ছে ওরা যেন অপ্রকৃতিস্থ।

সেই খর্বকায় অফিসার সবসময় আমাকে লক্ষ করছিল—মাঝেমাঝেই চাবুক মারছিল তার জুতোর উপর। ওর এসব পরিকল্পিত আচার-ব্যবহার হিংস্র পশুর মতো।

'তাহলে? বুঝতে পারছেন?'

'আমি জানি না গ্রীস কোথায়। আমার মনে হয় ও এখন মাদ্রিদে।'

অন্য অফিসারটি তার ফ্যাকাসে হাত অলসভাবে উপরের দিকে তুলল। তার এই আলস্যও পরিকল্পিত। ওদের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যবহারে আমি বিশ্লেষণ করছি এবং এই ভেবে হতভম্ব হচ্ছি যে কিছু মানুষও আছে যারা এভাবে সন্তোষ লাভ করে।

সে ধীরে ধীরে বলল, 'এ-ব্যাপারে ভাববার জন্য আপনাকে পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হল।' তারপর নির্দেশ দিল, 'একে নিয়ে যাও। পনেরো মিনিট পর আবার ওকে এখানে নিয়ে এস। যদি তখনো গররাজি হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে এখানেই ওকে শেষ করা হবে।'

কী করতে যাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে ওরা ওয়াকিবহাল। সারারাত আমি অপেক্ষা ক'রে কাটিয়েছি। তারপরও সেলে আমাকে একঘণ্টা বন্দী ক'রে রেখেছিল, ইতিমধ্যে টম ও জুয়ানকে গুলি ক'রে মারল। এখনো আমি বন্দী। অবশ্য করণীয় কাজ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ওরা গতরাতেই নিয়ে ফেলেছে। ওরা আলোচনা করছে যে আমার স্নায়ু নিশ্চয়ই নিস্তেজ হয়ে পড়বে। ওরা আমার দুর্বলতার সুযোগ খুঁজছে।

ওরা ভীষণভাবে ভুল করেছে। খুব ক্লান্ত আমি, একটা টুলের উপর বসলাম। একটু চিন্তা করতে হবে—কিন্তু ওদের প্রস্তাব সম্বন্ধে নয়। অবশ্যই আমি জানতাম গ্রীস এখন কোথায়। সহর থেকে চার কিলোমিটার দূরে সে ওর খুড়তুত ভাইয়ের বাড়িতে লুকিয়ে আছে। আমি আরো জানি যে আমার উপর অত্যাচার না চালানো পর্যন্ত আমি ওর আশ্রয়স্থল প্রকাশ করব না (কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে অত্যাচারের কথা ওদের চিন্তায় নেই)। সবকিছুই সুনিয়ন্ত্রিত এবং হিসাবমতো ঘটছে, শুধুমাত্র আমার এই আচরণের কারন খোঁজা ব্যতীত। কিন্তু কিছুই আমাকে উৎসাহিত করছে না। গ্রীসকে ধরিয়ে দেওয়া অপেক্ষা মৃত্যুবরণই আমার কাছে অধিক কাম্য। কেন? রামন গ্রীসকে তো আমি আর পছন্দ করি না। আজ প্রত্যুষের কিছু আগেই তার সাথে আমার বন্ধুত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোঞ্চার সাথে আমার ভালবাসারও পরিসমাপ্তি ঘটেছে, এমন কি বেঁচে থাকার আগ্রহ পর্যন্ত। অবশ্যই গ্রীসকে আমি শ্রদ্ধা করি, সত্যিই সে দৃঢ়চেতা। কিন্তু তার স্থলে যে আমি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে চলেছি—এটাই কারণ নয়। তার জীবন আমার জীবন অপেক্ষা কোনো অংশেই অধিক মূল্যবান নয়। জীবনেরই কোনো মূল্য নেই। ওরা একটা লোককে জোর ক'রে দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করবে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। সে আমিই হই বা গ্রীসই হোক অথবা অন্য কেউ হোক—ব্যাপারটা একই। আমি ভালভাবেই জানি যে স্বাধীন স্পেনের জন্য আমি অপেক্ষা রামন গ্রীসের বেঁচে থাকার প্রয়োজন বেশি, কিন্তু এ-মুহূর্তে সবকিছুই আমার কাছে গুরুত্বহীন—স্পেন বা [illegible]—সবকিছুই। তথাপি আমি এখনো বন্দী। গ্রীসকে ধরিয়ে দিয়ে আমি নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারি। কিন্তু আমি তা করতে

রাজি নই। এ-ব্যাপারটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হল—আমার এই অনমনীয়তা। মনে মনে স্থির করলাম, আমাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। একটা অদ্ভুত উল্লাসে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

ওরা আবার সেই অফিসার দু'জনের কাছে আমাকে নিয়ে গেল। একটা ছোট্ট ইঁদুর আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড় মারল—ব্যাপারটা বেশ লাগল। ঘুরে একজন ফালানখিস্টাকে বললাম, 'ইঁদুর দেখতে পেয়েছ?'

ও উত্তর দিল না। ও খুব মার্জিত এবং যথাযোগ্য গাম্ভীর্য বজায় রেখেছে। আমার হাসি পাচ্ছে কিন্তু সংযত থাকলাম, কারণ আমার ভয় হচ্ছে যে একবার হাসতে আরম্ভ করলে আর থামতে পারব না। তার গোঁফের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলাম, 'তোমার গোঁফ ছেঁটে ফেলা উচিত, বুঝলে নির্বোধ।' ব্যাপারটা মজাদার লাগল যে ওর এই জীবন্ত সত্তার গোঁফ সারা মুখের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। কোনোরকম চিন্তা না ক'রে আমাকে সে লাথি মারতেই চুপ ক'রে গেলাম।

এবার সেই খর্বকায় অফিসারটি বলল, 'তারপর, কী চিন্তা করলে?'

কৌতূহলী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম যেন কোনো এক অজানা গ্রহের অচেনা কোনো দুর্লভ কীটকে পর্যবেক্ষণ করছি। বললাম, 'আমি জানি, রামন গ্রীস কোথায় আছে। ও কবরখানায় আশ্রয় নিয়েছে—ভল্টের[৮] ভিতরে অথবা কবরখননকারীদের বস্তিতে।'

এসবই ছিল রসিকতা। বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা মুহূর্তের মধ্যে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বেল্ট বাঁধবে এবং কবরখানায় যাবার জন্য দ্রুত আদেশ দেবে—এসবই দেখার জন্য এসব বললাম।

শুনেই ওরা লাফিয়ে উঠল। খর্বকায় অফিসারটি দ্রুত আদেশ দিল, 'মোলেস, শীগগির তৈরি হন। লেফটেনান্ট লোপেজকে বলুন, পনেরোজন লোককে পাঠাতে।' তারপর আমাকে বলল, 'সত্যি হলে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে রসিকতা করলে, তার সমুচিত ফল পাবে।'

হুড়মুড় ক'রে ওরা বেরিয়ে গেল। ফালানখিস্টাদের প্রহরায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। যে-দৃশ্য ওরা সৃষ্টি করবে, তা চিন্তা ক'রে মাঝে মাঝে হেসে ফেলছি। আমি খুব উত্তেজিত আর বিদ্বেষী হয়ে পড়েছি। আমি কল্পনা করতে পারছি যে কীভাবে ওরা একের পর এক ভল্টের দরজা খুলে পাথর উলটেপালটে সবকিছু খুঁজছে। এ-দৃশ্যাবলীর আমিই নায়ক, যেন আমি ইবিয়েতা নই অন্য কেউ। এই মৃত জেদী ব্যক্তিটি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছে। গোঁফওয়ালা রুক্ষ ফালানখিস্টা

আর মিলিটারি পোশাক পরিহিত লোকগুলো কবরখানার সমাধিপ্রস্তরের চারদিকে ব্যস্তসমস্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে : সমস্তই আমার কাছে অসম্ভব হাস্যকর!

আধঘণ্টা পরে খর্বকায় অফিসারটি একা ফিরে এল। ভাবলাম, বোধহয় আমার মৃত্যুদণ্ডের ঘোষণা শোনাতে এসেছে। বাকিরা নিশ্চয়ই এখনো কবরখানাতেই রয়ে গেছে। সে কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল, 'অন্য সকলের সাথে একেও ওই বড় উঠোনটায় নিয়ে যাও। সামরিক ব্যবস্থার পর সাধারণ আদালতই ওর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।'

মনে হল, বোধহয় তার কথা আমি বুঝতে পারি নি। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমাকে···আমাকে কি তাহলে···গুলি ক'রে মারা হবে না?'

'যাই হোক, এখন নয়। পরে কী হবে, সেটা আমার জানার কথা নয়।'

তখনো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'কিন্তু কেন?'

উত্তর না দিয়ে সে শুধু কাঁধ ঝাঁকালো। একজন সৈন্য আমায় বাইরে নিয়ে এল। বড় উঠোনে শতাধিক বন্দী—স্ত্রীলোক, শিশু এবং কিছু বৃদ্ধও আছে। মাঝখানে ঘাসের উপর হাঁটছি হতভম্ব হয়ে। দুপুরবেলা ওরা খাবারঘরে আমাদের খেতে দিল। সেখানে দু-তিনজন এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করল। তারা অবশ্যই আমার পরিচিত। কিন্তু কোনো উত্তর দিলাম না—এমন কি আমি যেন জানি না, এতদিন কোথায় ছিলাম।

বিকালের দিকে আরো দশজন বন্দীকে ওরা উঠোনে ঠেলে জড়ো করল। ওদের মধ্যে রুটি-বিক্রেতা গার্থিয়াকে চিনতে পারলাম। সে বলল, 'খুব ভাগ্যবান তুমি, আশাই করতে পারি নি যে তোমাকে আবার দেখতে পাব।'

'ওরা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেটা ওরা পরিবর্তন করেছে, কী কারণে জানি না।'

গার্থিয়া বলল, 'বেলা দু'টোর সময় গ্রেপ্তার হয়েছি।'

'কেন?'

রাজনীতির সাথে গার্থিয়ার কোনো সংস্রব নেই।

সে উত্তর দিল, 'আমি জানি না। যাদের সাথে ওদের মতের কোনো মিল নেই, তারাই গ্রেপ্তার হচ্ছে।' তারপর নিচু গলায় বলল, 'গ্রীসও ধরা পড়েছে।'

গার্থিয়ার কথা শোনামাত্রই থর থর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কখন?'

'আজ সকালে। ও ভুল করেছে। খুড়তুত ভাইয়ের সাথে মতবিরোধ হওয়ায় ও

সেই আশ্রয় ত্যাগ করেছিল। আশ্রয় দেওয়ার মতো অনেকেই ছিল, কিন্তু কারো কাছে ও ঋণী থাকতে রাজি নয়। ও বলেছে : একমাত্র ইবিয়েতার কাছেই আশ্রয় দেওয়া যেত, কিন্তু সে গ্রেপ্তার হয়েছে বলেই আমি কবরখানাতে আশ্রয় নেব।'

'কবরখানায় ?'

'হ্যাঁ। এত বড় মূর্খও হয়। অবশ্যই ওরা আজ সকালে সেখানে গেছিল। ওরা কবরখানার বস্তিতে গ্রীসকে দেখতে পায়। সে ওদের দিকে গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু পরে ধরা পড়ে।'

'কবরখানায় ?'

আমার চারদিকের সবকিছু ঘুরতে লাগল এবং দেখলাম আমি মাটিতে বসে পড়েছি। চিৎকার ক'রে হাসতে গিয়ে গলা থেকে বেরলো তীব্র আর্তনাদ : আমি কেঁদে ফেললাম।

অনুবাদ। সত্যপ্রিয় বড়ুয়া

১. ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড : ১৯৩৬-৩৮ সালে স্পেন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক বামপন্থী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী।

২. গৃহযুদ্ধের সময় রাজতন্ত্রের পক্ষে যুদ্ধের জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কো মরক্কো থেকে অনেক স্পেনীয় মরক্কোবাসীকে আনিয়েছিলেন।

৩. ফালানখিস্টা (Falangista) : ১৯৩৩ সালে জার্মান-ফ্যাসিস্তের অনুকরণে খোসে আন্তোনিও প্রিমো দে রিভেরা স্পেনে যে-কুখ্যাত রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলে তার সভ্য। গৃহযুদ্ধের পর এই সংস্থাই স্পেনে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়।

৪. বাস্ক (Basque) : বিস্কে উপসাগরের তীরে উত্তর স্পেনের একটি অঞ্চল। তৎকালীন স্পেনের বহু অঞ্চলের অধিবাসীরা ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তীব্র বিরোধী। কিন্তু বাস্কের অধিবাসীরা ছিল প্রচণ্ড ধর্মভীরু।

৫. মান্সানিলিয়া (Manzanilla) : আপেলজাত স্পেনীয় পানীয়।

৬. নোভিলিয়েরো (Novillero) : স্পেনে ষাঁড়ের লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী দিনের প্রথম খেলোয়াড়।

৭. পি ই মারগাল : উনবিংশ শতাব্দীর রিপাবলিকান রাষ্ট্রনেতা।

৮. কবরখানায় মাটির তলায় যে-ঘরে কফিন রাখা হয়।

প্রে ম চ ন্দ

কফন

বাপবেটায় চুপচাপ বসে। কুঁড়েঘরের সামনে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে। ছেলের জোয়ান বউটা তখন প্রসববেদনায় ঘরের ভেতর কাতরাচ্ছে। সেই কাতরানির শব্দে বাপবেটার বুক পোড়ায়। শীত জাগার রাত, চারদিকে স্তব্ধতা। পুরো গ্রামটা তখন তলিয়েছে অন্ধকারের ভেতর। ঘীসু বলল, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে আর বাঁচবে না। দিনভর তো ছুটোছুটিতেই কাবার হয়ে গেল, একবার ভেতরে যা না! যা, গিয়ে দেখে আয়।'

মাধব চটে উঠে বলল, 'দেখবটা কী! মরতে হলে তাড়াতাড়ি মরে না কেন?'

'তুই তো বড় নিষ্ঠুর! পুরো একটা বছর যার সাথে শখ-আহ্লাদ করলি, তার দিকে একটু মায়াটান নেই?'

'ওরকম চেঁচানি আর হাত-পা ছোঁড়া আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।'

এরা জাতে চামার। সারা গাঁ জুড়ে এদের বদনাম। ঘীসু যদি একদিন কাজ করে তো তিনদিন আরাম করত বাড়ি বসে। মাধব এত বেশি কাজে ফাঁকি দিত যে আধ ঘণ্টা কাজ করার পর ঘণ্টাখানেক বসে বসে তামাক খেত। তাই কোথাও কাজও জুটত না। ঘরে যতক্ষণ একমুঠো খাবার আছে ততক্ষণ ওদের কাজ না করার যেন দিব্যি ছিল। শেষে যখন দু-চারদিন না খেয়ে থাকতে হতো, তখন ঘীসু গাছে উঠে কাঠ কেটে আনত আর মাধব সেগুলো নিয়ে বাজারে যেত বিক্রি করতে। যতক্ষণ পর্যন্ত কাছে টাকা থাকত, ততক্ষণ দু'জনে বেকার হয়ে ঘুরত। অথচ গ্রামে কাজের অভাব ছিল না। কৃষকপ্রধান গ্রাম। মেহনতী মানুষের জন্যে হাজার রকমের কাজ। কিন্তু এই দু'জনকে লোকে তখনই ডাকত যখন দু'জনের কাছ থেকে একজনের কাজ পেয়েও তারা সন্তুষ্ট হতে পারত। যদি দু'জনেই সাধু হতো তাহলে আর সন্তুষ্টি ও ধৈর্যের জন্যে তাদের কোনো সংযম ও নিয়মপালনের দরকার হতো না।

এমনিধারা ছিল এদের প্রকৃতি। বিচিত্র জীবন। ঘরে মাটির দু-একটা ঘটিবাটি

ছাড়া আর কোনো সম্পত্তির বালাই নেই। শতচ্ছিন্ন কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করত। সংসারের চিন্তা থেকে একেবারে মুক্ত। ঋণের বোঝা আকণ্ঠ। লোকের কাছে গালাগালি মারধোর খেয়েও নির্বিকার। এত দরিদ্রের কাছে টাকা ফেরত নেওয়ার আশা বিসর্জন দিয়েও কিন্তু লোকে আবার কিছু কিছু ধার দিত। অন্যের ক্ষেত থেকে মটর আলু ইত্যাদি চুরি ক'রে নিয়ে আসত চাষের সময়। এই বৃত্তি নিয়েই ঘীসু ষাট বছর কাটিয়ে দিল। মাধবও বাবার সুযোগ্য পুত্রের মতো বাপের সুনাম আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে।

এখন তারা দু'জনে আগুনের সামনে বসে আলু পোড়াচ্ছিল। ঘীসুর বউ মারা গেছে বহুদিন আগে। মাধবের বিয়ে হয়েছে গতবছর। যখন থেকে এই বউ ঘরে এসেছে, তখন থেকেই এদের পরিবারে এই ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে গেছে : গম ভাঙিয়ে আর ঘাস কেটে সে কিছু আটার বন্দোবস্ত করে নিত, আর এই দুই নিষ্কর্মার খিদে মেটাতো। বউটা আসার পর থেকে এরা আরো বেশি আলস্য ও আরামের মতলবী হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, কিছুটা নির্ভয়ও হয়ে গেছে। কেউ কাজ করতে ডাকলে বেশি মজুরি চাইত। সেই বউ আজ প্রসববেদনায় কাতর আর এরা দু'জনে বোধহয় অপেক্ষা করছিল যদি বউটা মরে যায়, তাহলে দু'জনে একটু আরামে ঘুমিয়ে নেবে।

ঘীসু আলুটা বার ক'রে এনে বলল, 'গিয়ে দেখ একবার অবস্থাটা। হয়তো ভূতে ধরেছে। এখানে তো আবার ওঝারাও একটাকা চায়।'

মাধব ভয় পাচ্ছিল, পাছে ভেতরে গেলে ঘীসু যদি বেশি আলু খেয়ে ফেলে। তাই সে বলল, 'আমার যেতে ভয় করছে।'

'ভয় কিসের? আমি তো এখানে আছি।'

'তাহলে তুমিই গিয়ে দেখে এস না!'

'আমার বউ যখন মারা যায়, তখন তিনদিন তার কাছ থেকে সরি নি। আর তোর বউ আমায় দেখে লজ্জা পাবে না? যার কখনো মুখ দেখি নি আজ তার নগ্ন দেহ দেখব? তার দেহের অবস্থা তো নিজের কাছেই অজানা। আমাকে দেখলে সে ভাল ক'রে হাত-পাও নাড়াতে পারবে না।'

'আমি ভাবছি, যদি ছেলে হয় তাহলে কী হবে? গুড়, তেল, আদা—কিছুই তো ঘরে নেই।'

'সব হবে। ভগবান যদি দেয়, তাহলে যারা এখনো পর্যন্ত একটা পয়সাও দিচ্ছে

না, তারাই কাল থেকে ডেকে ডেকে টাকা দেবে। আমার ন'টি ছেলে হয়েছে, ঘরে কখনো কিছু থাকে নি, কিন্তু যা হোক ক'রে ভগবান নৌকা পার ক'রে দিয়েছেন।'

দিনরাত মেহনত-করা লোকেদের অবস্থা তখন এদের দু'জনের চেয়ে এমন কিছু ভাল ছিল না। আর কৃষকদের মোকাবিলায় যারা কৃষকদের দুর্বলতার মুনাফা গ্রহণ করেছিল, তারাই নিজেদের অবস্থা ফিরিয়েছিল। তখন এ-ধরনের মনোবৃত্তির জন্ম হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। আমি তো বলব, ঘীসু কৃষকদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল। সে কৃষকদের বুদ্ধিহীন সমাজে মিলিত হওয়ার পরিবর্তে বৈঠক-বাজদের কুৎসিত আড্ডায় মিলিত হয়েছিল। হ্যাঁ, ওর মধ্যে বৈঠকবাজদের নিয়ম কানুন পালন করার মতো সাহস ছিল না। তাই যেখানে ওর সমাজের বিভিন্ন লোকেরা গ্রামপ্রধান হিসাবে ছিলেন, ঘীসু তাদের দিকে আঙুল তুলে অভিযোগ করতে পারত। তাই তার সন্তুষ্টি ছিল যে সে গরীব, কিন্তু কৃষকদের মতো তাকে মেহনত করতে হয় না, তার সরল ও নিরীহ প্রকৃতির সুযোগ নিয়ে কেউ তাকে ঠকাতে পারে না।

আগুন থেকে আলু বের ক'রে বাপবেটায় খেতে শুরু করল। আগুনের মতো গরম আলুটা ঠাণ্ডা হওয়ার জন্যে আর অপেক্ষা করতে পারে নি। কতবার তাদের জিভ পুড়ল। আলুর খোসা ছাড়ানোর পর আলুর ওপরটা বেশি গরম মনে হয় না, কিন্তু মুখে দেওয়ার পর ভেতরটা বেশি গরম লাগে। তাই তারা তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে। এই প্রচেষ্টায় তাদের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল।

এই সময়ে ঘীসুর মনে পড়ে যায় ঠাকুরের বিয়ের কথা। তার মনে পড়ল যাতে বিশ বছর আগে সে বরযাত্রী গেছিল। সেই প্রীতিভোজে তার যে-তৃপ্তি হয়েছিল, তার স্মৃতি একটা মনে রাখার মতো জিনিস। আর এখনো সে-স্মৃতি তার মনে নতুন হয়ে আছে। বলল, 'সেই ভোজের কথা ভুলতে পারছি না, সেরকম খাবার পেট-ভরে আর খেতে পাই নি। কন্যাপক্ষের লোকেরা সবাইকে পেট ভরে লুচি খাইয়েছিল। ছেলে বুড়ো সবাই আসল ঘিয়ের লুচি পেয়েছিল। চাটনি, দই, তিনরকমের তরকারি আর মিষ্টি। কী বলব, কী স্বাদ! কোনো বাধা ছিল না। এত বেশি খেয়েছিলাম যে পেটে জল রাখার জায়গা ছিল না। যে কোনো জিনিস —যত চাও তত খাও। আর পরিবেশন করা? জোর ক'রে গরম গরম গোল গোল সুবাসিত কচুরি সামনের শালপাতায় রেখে দিচ্ছে। বারণ করছি যে আর দিও না, ওদের হাত ধরছি, তবুও তারা শুধু দিয়েই যাচ্ছে। হাতমুখ ধোওয়ার পরে পান

আর এলাচ দিল। কিন্তু আমার পান নেওয়ার জন্যে সময় ছিল না, দাঁড়াতে পারছিলাম না। চট ক'রে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এই রকম উদার মেজাজ ছিল সে-ঠাকুরের।'

মাধব মনে মনে এই সব খাবার জিনিসের কথা ভেবে মজা পাচ্ছে। বলল, 'এখন আর কেউ সেরকম নেমন্তন্ন করে না।'

'এখন আর কে খাওয়াবে? তখন ছিল অন্য যুগ। এখন তো সবাই কিপটে। বিয়েতে খরচ করবে না, শ্রাদ্ধে খরচ করবে না। এদের জিজ্ঞেস করা উচিত, গরীবদের মালকড়ি লুট ক'রে এরা কোথায় রাখবে? লুঠের অভাব নেই, কিন্তু খরচ করতে কঞ্জুস।'

'তুমি বোধহয় খান কুড়ি লুচি খেয়েছিলে?'

'কুড়িরও বেশি।'

'আমি পঞ্চাশটা খেতাম।'

'আমিও বোধহয় পঞ্চাশটার কম খাই নি। তখন আমি খুব জোয়ান ছিলাম, তুই তো আমার আদ্দেকও নস্।'

আলু খেয়ে দু'জনে জল খেল আর সেই আগুনের সামনেই কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে হচ্ছিল যেন রাস্তায় দু'টো সাপ শুয়ে আছে। আর বুধিয়া এখনো যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

সকালবেলায় মাধব ঘরে ঢুকে দেখল তার বউ মরে ঠাণ্ডা হয়ে আছে। তার মুখের ওপর মাছি ভনভন করছে। পাথরের মতো চোখদু'টো ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটের বাচ্চা মরে গেছে।

মাধব দৌড়ে ঘীসুর কাছে এল। তারপর দু'জনে হায় হায় ক'রে বুক চাপড়াতে লাগল। আশেপাশের লোকেরা তাদের কান্না শুনে দৌড়ে এল। আর চিরাচরিত প্রথায় ওদের বোঝাতে লাগল।

কিন্তু কান্নাকাটি করার মতো অত সময় নেই। কাপড় ও কাঠের ব্যবস্থা করা দরকার। চিলের বাসায় যেমন কখনো মাংস থাকে না, ঠিক তেমন এদের ঘরেও পয়সা থাকে না।

বাপবেটায় কাঁদতে কাঁদতে গ্রামের জমিদারের কাছে গেল। তিনি তো এদের মুখদর্শন করতেন না। চুরি করার জন্যে, কাজের সময় না আসার জন্যে তিনি কতবার এদের মারধোর করেছেন। জমিদারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কিরে ঘিসুয়া, কাঁদছিস কেন? তোর তো আর দেখাই পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে গ্রামে বাস

করার তোর আর ইচ্ছে নেই।' ঘীসু মাটিতে মাথা রেখে জলভরা চোখে বলল, 'সরকার, বড় বিপদে পড়ে গেছি। মাধবের বউ গেল রাতে মারা গেছে। সারারাত ছটফট করছিল। আমরা দু'জনে তার মাথার কাছে বসেছিলাম। ওষুধ-টষুধ যা কিছু পেলাম দিলাম, কিন্তু সে আমাদের ঠকিয়ে চলে গেল। আর কেউ একটা রুটি দেওয়ার মতো নেই। বরবাদ হয়ে গেলাম, গোটা ঘরটাই নষ্ট হয়ে গেল! আমি আপনারই গোলাম। আপনি ছাড়া ওর মাটি দেওয়ার বন্দোবস্ত কে-ই বা করবে? আমাদের হাতে যা ছিল, সেসব ওষুধে খরচ হয়ে গেছে। সরকারের দয়া হলে তবেই মাটি উঠবে। আপনাকে ছেড়ে আর কার দরজায় যাব?'

এমনিতে জমিদারবাবুর হৃদয়ে একটু দয়ামায়া ছিল। কিন্তু ঘীসুকে দয়া দেখানো আর কালো কাপড়ে রঙ দেওয়া সমান। ইচ্ছে হল বলেন; 'যা, পালিয়ে যা এখান থেকে। এমনিতে ডাকলেও আসবে না, আর দরকার পড়লে খোসামোদ করবে। হারামী, বদমাইস কোথাকার!' কিন্তু এতো আর মেজাজ দেখানোর সময় নয়। জোর ক'রে দু'টি টাকা ওর সামনে ফেলে দিলেন। সান্ত্বনার একটি শব্দও বেরোয় নি। ওর দিকে তাকালেনও না। যেন মাথা থেকে বোঝা নেমেছে!

জমিদার স্বয়ং যখন দু'টি টাকা দিয়েছেন তখন গ্রামের মহাজন আর কোন সাহসে ফেরাবে? দু'আনা, চারআনা ক'রে সকলেই কিছু কিছু দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই চার-পাঁচ টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কেউ চাল-ডাল দিল, কেউ বা বাঁশ, কাঠ কাটতে লাগল। গ্রামের অন্য বৃদ্ধারা এসে লাশ দেখে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে চলে গেল।

বাজারে পৌঁছে ঘীসু বলল, 'কিরে মাধব, পোড়াবার কাঠ তো হয়ে গেছে।'

মাধব বলল, 'হ্যাঁ, কাঠ তো হয়ে গেছে, এখন কাপড় চাই।'

'চল একটা ছোটখাটো কাপড় কিনে নিই।'

'হ্যাঁ, আর কী? লাশ ওঠাতে ওঠাতে তো রাত হয়ে যাবে। রাতে আর কে কাপড় দেখছে?'

'অদ্ভুত নিয়ম! বেঁচে থাকতে পরনের ছেঁড়া কাপড়ও পেল না, মরার পর তার জন্যে নতুন কাপড় চাই!'

'আচ্ছা, লাশের সাথেই কাপড় পুড়ে যায় – তাই না?'

'না হলে কি রেখে দেওয়া যায়? এই টাকা পাঁচটা যদি আগে পেতাম, তাহলে কিছু ওষুধ কিনতে পারতাম।'

দু'জনেই পরস্পরের মনের কথা ভাবছিল। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কখনো এ-দোকানে, কখনো ও-দোকানে। নানা রকমের রেশমি, সুতীর কাপড় দেখল, কিন্তু পছন্দ হল না। হঠাৎ কোন অজানা দৈব প্রেরণায় তারা দু'জন একটা ভাঁটিখানার সামনে পৌঁছলো আর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ভেতরে ঢুকল। কিছুক্ষণ কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পরে ঘীসু গদির সামনে গিয়ে বলল, 'শাহজী, এক বোতল আমাদেরও দেবেন।'

এরপর এল কিছু চাট, আর এল ভাজা মাছ। আর দু'জনেই বারান্দায় বসে শান্তভাবে খেতে লাগল।

কয়েক ভাঁড় তাড়াতাড়ি খাবার পর দু'জনেরই বেশ নেশা হল। ঘীসু বলল, 'কফন দিলে কী হতো? শেষে পুড়ে যেত। বউ-এর সাথে তো আর যেত না।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে মাধব বলল, 'দুনিয়ার এই নিয়ম! নাহলে লোকেরা ব্রাহ্মণদের হাজার হাজার টাকা কেন দেয়? কে দেখছে, সে পরলোকে গেছে কিনা!'

'বড়লোকের টাকা আছে—নষ্ট করুক। আমাদের নষ্ট করার কী আছে?'

'কিন্তু লোকজনকে কী জবাব দেবে? নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে: কিরে কাপড় কোথায়?'

ঘীসু হেসে বলল, 'বলব, কোমর থেকে টাকা পড়ে গেছে। কত খুঁজলাম, পাই নি। তারা তো বিশ্বাস করবে না, কিন্তু তারাই আবার দেবে।'

মাধবও হাসল আর অযাচিত সৌভাগ্যের কথা ভেবে বলল, 'বেচারি বড় ভাল ছিল, মরে গিয়েও আমাদের খাইয়ে গেল।'

অর্ধেক বোতল শেষ হয়ে গেল। ঘীসু লুচি, চাটনি আর আচারের ফরমাস দিল। ভাঁটিখানার সামনেই দোকান। মাধব তাড়াতাড়ি সব নিয়ে এল। আরো দেড় টাকা খরচ হল। খুচরো কয়েকটা পয়সা পড়ে থাকল।

দু'জনেই খুব মজা ক'রে লুচি খাচ্ছিল—বনে বাঘ যে-ভাবে শিকার খায়। না ছিল পরবর্তী দায়িত্বের চিন্তা, আর না ছিল বদনামের ভয়। এইসব ভাবনা তারা অনেক আগেই জয় করেছে।

ঘীসু দার্শনিকের মতো মন্তব্য করল, 'আমাদের আত্মার আনন্দ হচ্ছে, তাহলে কি তার স্বর্গলাভ হবে না?'

মাধব হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি নিয়ে মাথা নামিয়ে স্বীকার করল, 'অবশ্যই হবে। ভগবান, তুমি অন্তর্যামী। তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে, আমার অন্তর থেকে আশীর্বাদ করছি। আজকে যা খাবার খেয়েছি তা জীবনে কোনোদিন খাই নি।'

খানিক পরে মাধবের মনে একটা সন্দেহ জাগল। বলল, 'কেন বাবা, একদিন আমরাও তো ওখানে যাব।'

ঘীসু এরকম সরল কথায় কোনো উত্তর দিল না। স্বর্গের কথা ভেবে জমাটি নেশা মাটি করার ইচ্ছে নেই তার।

'যদি ওখানে বউ আমাদের জিজ্ঞেস করে যে তোমরা আমাকে কফন দিলে না কেন, তাহলে কী বলবে?'

'বলব তোমার মাথা।'

'জিজ্ঞেস তো করবেই।'

'তুই কী ক'রে জানলি যে সে কফন পাবে না? আমাকে তুই গাধা ঠাউরেছিস নাকি? ষাট বছর কি ঘাস কেটেছি? ও কফন পাবে আর এর চেয়ে অনেক ভাল কফন পাবে।

মাধবের বিশ্বাস হয় নি। বলল, 'কে দেবে? টাকা তো তুমি চোট ক'রে দিলে, সে তো আমাকে জিজ্ঞেস করবে। আমি ওর · '

ঘীসু একটু রেগে বলল, 'আমি বলছি ও কফন পাবে, তুই তো মানছিস না সে-কথা?'

'তাহলে বলো, কে দেবে?'

'সেই লোকেরাই দেবে যারা এবার দিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, এবার টাকা আমাদের হাতে আসবে না।'

যেভাবে অন্ধকার বাড়ছিল, তারার আলোও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেভাবে ভাঁটিখানার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাচ্ছিল—কেউ গাইছে, কেউ বুকনি মারছে, আর কেউ বন্ধুর মুখে ভাঁড় তুলে দিচ্ছে।

সেখানকার পরিবেশে একটা বেহুঁশ ভাব, হাওয়ায় নেশা। কেউ কেউ এখানে এসে এক গ্লাস খেয়েই মত্ত, মদের চেয়ে বেশি নেশা আনে এখানকার হাওয়া। জীবনের ব্যর্থতা তাদের এখানে টেনে আনে। আর কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যেত তারা জীবিত না মৃত।

এখনো বাপবেটা দু'জনেই মজা ক'রে খেয়ে যাচ্ছে। সবার চোখ এদের দিকেই স্থির। দু'জনের ভাগ্য কত ভাল। পুরো বোতলই দু'জনের মাঝখানে।

পেটভরে খাওয়ার পরে বাকি লুচিগুলো উঠিয়ে মাধব একটা ভিখিরিকে দিল যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার নিজের জীবনে এবারই প্রথম দানের গৌরব, চূড়ান্ত আনন্দ আর উল্লাস অনুভব করল মাধব।

ঘীসু বলল, 'নিয়ে যা, খুব খাবি আর আশীর্বাদ করবি। যার আমদানি ছিল সে তো মারা গেছে, কিন্তু তোর আশীর্বাদ নিশ্চয়ই ওর কাছে পৌঁছবে। বড় মেহনতের পয়সা!'

মাধব আবার আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবা, বউ স্বর্গে যাবে, স্বর্গের রাণী হবে।'

ঘীসু উঠে দাঁড়ালো, যেন আনন্দের স্রোতে সাঁতার কাটছে। আর বলল, 'হ্যাঁরে, স্বর্গে যাবে। কাউকে দুঃখকষ্ট দেয় নি। মারা যাওয়ার পরেও আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ইচ্ছা পুরণ ক'রে গেল। সে যদি স্বর্গে না যায়, তাহলে কি ঐ মোটা লোকগুলো যাবে—যারা দু'হাতে গরীবদের লুট করে আর নিজের পাপকে ধোয়ার জন্য গঙ্গায় চান করে, মন্দিরে পুজো দেয়?'

শ্রদ্ধার এই পরিবেশ দ্রুত পালটে গেল। নেশার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অস্থিরতা। দুঃখ ও নৈরাশ্য একসাথে এল।

মাধব বলল, 'কিন্তু বাবা, বেচারি জীবনে বেজায় কষ্ট ভোগ করেছে। কত কষ্ট সহ্য ক'রে মারা গেল!'

চোখের ওপর হাত দিয়ে মাধব খুব জোরে কাঁদতে লাগল।

ঘীসু ওকে বোঝালো, 'কাঁদছিস কেন? আনন্দ কর। বেচারি এই মায়াজাল থেকে মুক্তি পেয়েছে, ঝামেলা থেকে সরে পড়েছে। বড্ড ভাগ্যবান ছিলরে, এত শীগগির মায়ার বন্ধন ভেঙে দিল।'

তারপর দু'জনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান গাইতে ও নাচতে শুরু করল।

সব মাতালদের চোখ ওদের দিকে। আর ওরা মত্ত হয়ে গান গেয়েই যাচ্ছে। তারপর নাচতে লাগল, লাফাতে লাগল, পড়তে লাগল। নানান কায়দা-কেতায় অভিনয় করার পর, শেষে নেশায় মত্ত হয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

অনুবাদ : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ও সদাশিব দ্বিবেদী

হা সা ন আ জি জু ল হ ক

আমৃত্যু আজীবন

আকাশে হাওয়া ছিল তখন। করমালি দেখছিল, চারদিক অন্ধকার ক'রে কালো মেঘ উঠে আসছে। সে চিৎকার ক'রে ছেলেকে ডাকল, 'বিষম মেঘ আসতিছে, বাজান। দেরি করিস নি আর।' এই বলে সে উঠে গোয়ালঘরে গিয়ে বলদদু'টোর দিকে একটু মন দিল। ধলা গরুটার লেজ নাচছিল চঞ্চলভাবে। একপাশে খোঁড়া গাইটা শুয়ে খড়ের গাদার ওপর—বিশাল কালো চোখে চেয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। ছাইগাদা থেকে উঠে গা ঝাড়ল কুকুরটা এবং আকাশের দিকে মুখ তুলে জলো বাতাস শুঁকল।

করমালি বেরিয়ে এল এখন। উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ বিলের দিকে তাকালো। বিল রূপোর মতো ঝকঝক করছে। করমালির কটা চোখ মিইয়ে এল। ক্যানভাসে আঁকা ছবির মতো বিল স্থির—বহু দূরের গ্রামের সবুজ ফ্রেমে আটকানো। সেখান থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে করমালি এদিক ওদিক খুঁজতেই নিজের পঁচাত্তর বছরের মাকে দেখতে পেল। সে এক মনে ঝাঁটা বাঁধছে।

এইটুকু সময়মাত্র গেছে। যে-সুর্মা রঙের মেঘবাহিনী উঠে আসছিল তারা এখন আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। করমালি শুনতে পেল গর্জন গড়িয়ে বেড়াচ্ছে পিপের মতো এবং দেখল কালো মেঘ ধোঁয়াটে হয়ে টগবগ ক'রে ফুটছে। এ-ব্যাপারে অগুনতি বর্ষাকাল এবং সহচর স্বাভাবিক দৃশ্যপটগুলি অর্থাৎ সাঁতলা বাতাসের ঝড়ো উন্মত্ততা, অতি বলশালী কৃষ্ণকায় মেঘ, পৃথিবীর মতো পুরনো বিল এবং গাবভেজানো পানির মতো অতল জলরাশি, হাঁসেরা, বাড়ন্ত লতাপাতা এবং দ্বিপ্রহরের দানবীয় খিদে—এইসব ছবি তার পিঙ্গল চোখের তারায় নেচে উঠল। এইসব থেকে নিজেকে বিস্মৃত করতে করমালি আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে উঠোনটাকে জরীপ করতে শুরু করে। মায়ের বেতো বাহাত্তুরে পায়ের বেগুনে হাঁটুটা তখন সেঁটে থাকে চোখের ওপর। করমালি বিব্রত হয়ে কাঁচাপাকা দাড়িতে আঙুল চালায়। এই সময় গোপনতম এবং সূক্ষ্মতম সমস্ত অস্তি

প্রকাশ ক'রে অবিশ্বাস্য সাদা আলো ঝলকে উঠল এবং বিকট গর্জন ক'রে কেঁপে উঠল আগাগোড়া আকাশ।

বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণিক অথচ বিদারণকারী স্মৃতি মনে পড়ল। করমালির সামনে তার শৈশব ভেসে উঠল মুহূর্তের জন্যে। সে এই ঢালু ভিটের গড়ানো দিকটায় যেখানে ভেঙে পড়ো পড়ো বৃষ্টিচ্ছিন্ন মায়ের ঘরটা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে চেয়ে, পুরনো ভেজা গোলপাতা থেকে চুঁইয়ে-পড়া কালো পানির পরিচিত শব্দ শুনে এবং আশ্চর্য এক নিরাসক্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে বিচ্ছিন্ন ভিটে, গোয়ালে জাবরকাটা গরু, ছলছলে বিলের ওপর ছবির মতো গ্রাম দেখতে দেখতে শৈশবের দ্যুতিহীন দিনে ডুবে গেল। এক নিষ্ঠুর বৃদ্ধের সঙ্গে বিলে যাওয়া, অচেনা মানুষের জমিতে সকাল, বিকেল, দুপুর সন্ধ্যে আর অসহ্য খিদে—এইসব স্মৃতিতে ডুবে গিয়ে সে যখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন ফুটন্ত আকাশ থেকে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি এল। বিলের ওপারটা ধোঁয়াটে এবং শুধুই বৃষ্টির শব্দ।

মা মাজা টানতে টানতে ঘরের মধ্যে চলে গেল এবং এতক্ষণে ছেলে রহমালি পেটের ওপর শিরা পরিস্ফুট ক'রে উদ্গার তুলতে তুলতে বেরিয়ে এল। 'এই বিষ্টিটা থামলে যাবানে,' বলে সে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। আম আর জাম গাছের মাঝখান দিয়ে, উল্লসিত নৃত্যরত সুপারিবনের ভেতর দিয়ে এতক্ষণে রহমালির মা বেরিয়ে আসে। তার হাতে কাদার মতো গলে যাওয়া একতাল গোবর এবং সে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় তুলে মাথা ঢেকে পরম আদরে গোবরপিণ্ড নিয়ে ছপ ছপ শব্দে শিয়ালের মতো এগিয়ে আসছে। হঠাৎ গরুর জন্যে কাটা হলুদ ঘাসের স্তূপের কাছে এসে সে পা পিছলে পড়ে গিয়ে গোবর মুখে মেখে ভিজে এবং অনবরত বৃষ্টিতে আরো বেশি ভিজে অদ্ভুত হয়ে উঠল। এই পতনে করমালির যখন কিছুই করার নেই, সে বলল, 'আহারে গোবরটা ফালালি।' এবং সম্ভবত সহানুভূতির জন্যেই জ্বালানি রাখার আড়ালটা থেকে উঠোনে বেরিয়ে এসে নিজেও ভিজতে লাগল। তারপর ছেলের উদ্দেশ্যে বলল, 'আর দেরি করিস নি দিনি, বাজান।' বিশ বছরের ছেলেটা এরপর আর কোনো উপায় না দেখে লাফ দিয়ে উঠোনে নামল এবং চারপাশ খোলা হোগলায় ছাওয়া চাতালে এসে পুরনো টিন, ছেঁড়া মাদুর ইত্যাদির মধ্য থেকে কোদাল দু'টো নিয়ে বাপের দিকে এগিয়ে গেল। তার কালো শক্ত শরীরের ওপর এখন বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে এবং সে যতক্ষণে লম্বা লম্বা পা ফেলে বৃষ্টির মধ্যে ধীরেসুস্থে করমালির কাছে হেঁটে এল, ততক্ষণে দুরূহ দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার মতো বৃষ্টি শরীরের আবরণে ঢাকা তার দেহ বেয়ে

এই বাংলা—কঠোর কোমল এই বাংলা দেশ এবং পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীর তেতো, পোড়া, ভিজে হাজার বছরের পুরনো জীবন গানের মতো ঝরে পড়তে থাকে।

হাওয়াটা প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে। এত জোরে বৃষ্টি আসে যে বিলের মধ্যেকার গ্রামগুলো আর নজরেই পড়ে না। রহমালির মা গোবরের আশা পরিত্যাগ ক'রে হাত ধুয়ে একটু আড়ালে গিয়ে উধ্বাঙ্গের কাপড় খুলে নিয়ে নিংড়ে পানি বের করছে। করমালি আড় চোখে সেই শীর্ণ কোঁচকানো শরীরের দিকে নজর ফেলে আরো বিব্রত বোধ করল—যেজন্যে সে বউকে খুঁজছিল তাও মনে পড়ল না। তখন ছেলেই মাকে তামাকের কথাটা মনে করিয়ে দিল। রহমালির মনে নেই কখন মায়ের বুকের দুধ খেয়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতি তার সংস্কারের অন্ধকারে মানিকের মতো জ্বলছিল বলে মায়ের খোলা বুক দেখে তার লজ্জা করে না। সে এখন বিলের কালো পানির হিমে ডুব দেয় এবং যেন হেমন্তের শীত শীত রাতে ঘর থেকে বেরিয়ে বৃষ্টির ফোঁটার মতো আতার পাতায়, বাতাবির পাতায় শিশিরের শব্দ শোনে। কিন্তু করমালি গোয়ালঘরের হতাশ অন্ধকারের দিকে চোখ ফেরায়, যেখানে তার আহত বৃদ্ধ গাইটা মৃত্যুর অপেক্ষা করছে।

তারা বেরিয়ে আসার পর বৃষ্টি সোজাসুজি অন্ধকার হয়। ধূমল আকাশ গম্ভীর আওয়াজ তোলে এবং গ্রামের নির্জন হিম পথ সামান্য কেঁপে ওঠে। পথে বৃষ্টি নেই—সেখানে শরীরহীন অন্ধকার নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে এবং দু'পাশের কালো আম জাম হিজল সজনে মাঠাম থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরছে এবং ভুষো কালো কাদা পিঠ বের ক'রে আছে। হাঁটতে গিয়ে ভিজে লতা জড়িয়ে ধরছে পায়ে পায়ে এবং কখনো চাবুকের মতো আঘাত করছে। এইভাবে পাড়াটা পার হতে হল। দূরে দূরে ঘরগুলো হেঁট হয়ে নমিত হয়ে আছে, চালগুলো নেমে এসে বুক সমান মাটির দাওয়ায় এসে ঠেকেছে এবং যেহেতু চারদিকেই দাওয়া—অতএব ঘরগুলোকে বিশালকায় পিঠ-উঁচু কচ্ছপের মতো দেখায়। বিলে পৌঁছনোর তাড়নায় পথ ছেড়ে করমালি বেড়া পার হয়ে বাগানে ঢুকছে। এইসব বাগান, সুদেহী সুপারিগাছ, খোলা জমি, বিমর্ষ ঘাস এবং গ্রামের কালো-সবুজ আবেষ্টনী পেরিয়ে একেবারে হঠাৎই বিলে এসে পড়ল করমালি ছেলে সঙ্গে নিয়ে। তখন ওদের চোখের সামনে আকাশ, বিল, গোটাদশেক পাতিহাঁস এবং বর্ষার বিলের আরো অজস্র খুঁটিনাটি নিয়ে ভয়ংকর রকম সবুজ একটা দৃশ্য ফুটে উঠল।

করমালি এখন তার পতিত জমিটাকে পরীক্ষা করছে। যে-অংশটা পরিষ্কার করা হয়ে গেছে গতকাল, সেখানে আশশ্যাওড়া, আগাছা, দাঁতনগাছের সবুজ পাতা

এখন ফিকে হয়ে এসেছে এবং পিটিয়ে বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্যে মাটি কালো হয়ে বসে গেছে। গোটা জমিটা আধখানা কামানো ভেড়ার মতো লাগছে। নিবিষ্টমনে এইসব দেখছে করমালি। বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় এবং হাওয়া একদম বন্ধ হওয়ায় বিল থেকে ভয়াবহ স্তব্ধতা উঠে উঠে আসছিল এবং শ্লেটের মতো কালো আকাশের নিচে অতল বিলের জলরাশি এখন সম্ভবত সাদা কালো মেটে হাঁস দশটিকে আহ্বান করছিল না। ফলে তারা স্থির ভেসে বেড়াচ্ছিল এবং আয়নার মতো পরিষ্কার পানিতে শুধু আকাশের ছায়াই পড়ে নি—সেখানে কিছু জলপিপি এবং অন্যান্য কিছু কিছু জলপ্রিয় পাখির চলাচলও ছিল। আর এই ঝকঝকে আয়নাকে ঘিরে বিভিন্ন আকারের জমিতে কচি ধান থেকে তরল সবুজ গলে গলে পড়ছিল। এরই মধ্যে পানির রঙ পালটাচ্ছিল, কারণ হাওয়া থেমে যাওয়ায় আকাশে কালো মেঘ স্থির হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল এবং সেজন্যে আকাশ প্রতীক্ষায় গভীর হয়ে এল ও স্থির স্ফটিকের মতো পানিতে অদ্ভুত শব্দ ক'রে জলপোকাগুলো চলাচল শুরু করল। এই আশ্চর্য শান্তি করমালিকে এমন মোহিত করে, সে স্বপ্ন দেখতে পারে যে তার জমিটা পরিষ্কার হয়ে গেছে—তুলে-ফেলা জঙ্গলগুলো থেকে সোঁদা গন্ধ আসছে এবং জমিটা বিলের সামিল হয়েছে। জমির তকতকে মেঝে কোদাল দিয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে দেওয়া হয়েছে এবং নতুন মাটির চাঙরগুলোকে আকাশের দিকে মুখ ক'রে চিৎ ক'রে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। তারপর বৃষ্টি শুষে চাঙরগুলো ভরপুর এবং সামান্য চেষ্টাতেই নরম মিষ্টি মেদুর মাটিতে পরিণত হয়। এইভাবে করমালি প্রায় বিনা চেষ্টায় দেখতে পায় বিলের সঙ্গে লাগোয়া তার নিজের, একেবারে নিজের রক্তের থেকে জন্ম দেওয়া আত্মজের মতো এক খণ্ড জমি, কচি ধানে সেজে চোখের ওপর লাফিয়ে উঠল হাওয়ায়। করমালির বুক থেকে তাই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল—বিল থেকে অনেক উঁচুতে পগারের মতো আধ-পরিষ্কার জমিটার দিকে চেয়ে। স্বপ্নকে কাজেই মুলতুবি রেখে করমালি গতকালের কাটা আগাছাগুলোকে তুলে জমির কিনারে সাজিয়ে রাখতে বলল রহমালিকে এবং নিজে কোদাল তুলে নিয়ে একমাত্র নারকেল গাছটাকে কেন্দ্র ক'রে যে-দুর্ভেদ্য লতাপাতার জালে একটি জটিল ঝোপের সৃষ্টি হয়েছিল তার বিনাশে এগিয়ে গেল। গলা পর্যন্ত উঁচু ঝোপটায় সে প্রায় আগাগোড়া ঢেকে গেল এবং প্রথম কোদাল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ উঠল—হিস-স্-স্!

ব্যাপারটা ঘটল ঠিক এই মুহূর্তে। অন্তত এই তার ধারণা। অবশ্য সে এখন কিছুতেই বলতে পারবে না শব্দটা—যা নাকি কোদাল বা এ-ধরনের অন্য কিছু

চালানোর সময় অজান্তেই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—এই তীব্র শব্দটা আসলে তারই মুখ থেকে বেরিয়েছিল কিনা। কারণ কোদালের চোটটা মাটিতে পড়বার সাথে সাথে, কোপানো চাঙরটা উলটে চিৎ ক'রে দেবার আগেই করমালি একটা গম্ভীর তীক্ষ্ণ মর্যাদাব্যঞ্জক শিস দেওয়ার মতো শব্দ শুনতে পেয়েছিল এবং প্রায় একই সময়ে সোনালী রঙের সাবলীল লতার একটা কুণ্ডলীকে বিদ্যুতের মতো উলটোদিকে খুলে যেতে দেখেছিল। তারপরেই নিবিড় কালো রঙের বিশাল আকাশের পটভূমিকায়, রসপূর্ণ উথলানো সবুজ, ছলোছলো সজল বিল, এক কথায় তার বর্তমান পৃথিবীর সামনে জ্বলন্ত উজ্জ্বল সাপটাকে সে দুলতে দেখল। তার অতীত জীবনের ওপর জন্মপূর্বের অন্ধকার নামে। পূর্বস্মৃতির সুতো খুলতে থাকে এবং জীবন টাল খেতে থাকে দুরন্ত হাওয়ায়, অভাব দুঃখ দারিদ্র্য পরিশ্রমের ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হয়। বর্তমান দৃশ্যপটও আবছা হয়ে আসে এবং সে তার চাষী-জীবনের সঞ্চিত সমস্ত মনোযোগ দিয়ে দোদুল্যমান সাপটিকে পাঁচ হাত দূর থেকে দেখতেই থাকে। বিরাট একটা ছাতার মতো তার ফণা আর ফণার ওপর যে-গোক্ষুর ধপ ধপ করছে তা যেন শরতের সকালের সূর্যের মতো উজ্জ্বল। করমালি তার চোখের দিকে চোখ রাখার চেষ্টা করল—কিন্তু সাপটার ধূসর ম্লান ঠাণ্ডা বিষণ্ণ চোখদু'টি সম্পূর্ণ বিনাচেষ্টায় দৃষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাস্ত করে। ফলে দ্বিতীয়বার করমালি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। সে কি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে? কণ্ঠরোধ করা শঙ্কা? বুক ভেঙে দেওয়া উদ্বেগ? কিন্তু আশঙ্কা ঘৃণা বিবমিষা ভীতি স্নেহ বা ভালোবাসা—কোনো পরিচিত মনোভাবই জন্ম নিল না তার মধ্যে। কেবল সে তার ভাগ্যকে নিয়তিকে এবং তার সংগ্রামকে—যে-সংগ্রামের শেষ নেই, উত্তেজনা নেই এবং যে-সংগ্রামে বার বার পরাজয় এসে করমালির সাহস দেখে লজ্জা পায় সেই সংগ্রামকে প্রত্যক্ষ করল। কারণ যে-গোক্ষুরটি দুলুনির সঙ্গে সঙ্গে করমালির চোখের ওপর নাগরদোলার মতো উঠছে পড়ছে তাতে যেন অসংখ্য জটিল সাদা সুতো জট পাকিয়ে পাকিয়ে করমালির ভাগ্যকে এবং তার বর্তমানকে কেবলই বাঁধছে। অথচ তার গায়ের উজ্জ্বল সোনার রঙ হেমন্তের হলুদ রোদের মতো আকাশ ভরে রয়েছে। এই সময় চিৎকার ক'রে একবার হাঁসগুলো ডেকে উঠল, বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং ভিজে সবুজ গাছপালা আগাগোড়া উজ্জ্বল হল, বিলটার সুদূর প্রান্ত দেখা গেল, সুদৃশ্য জলরাশি দেখা গেল, কাৎ হয়ে যাওয়া দু'টি ডিঙি চোখে পড়ল, গ্রাম থেকে অস্পষ্ট অজস্র চিৎকার ভেসে এল—পাখির, মানুষের এবং কুকুরের। কানে

শোনার ও চোখে দেখার এই সমস্ত শব্দ ও দৃশ্য মুহূর্তকালের জন্যে অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েই অতলে তলিয়ে গেল। একটি মাত্র বোধ তীক্ষ্ণ হুলের মতো করমালির চেতনায় বিঁধে আছে, যে-বোধের কোনো নাম নেই। তখন, তখনো সুললিত ভঙ্গিতে সে দুলে চলেছে এবং তার অতি চকচকে ধারালো জিভ একটা সকৌতুক ধরনে বার বার বেরিয়ে আসছে। করমালি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে দুলতে দুলতেই দূরে চলে যাচ্ছে। তারপরে তার বিস্ফারিত চোখের সামনে আশেপাশের বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেল ওর মাথা ; একটা বড় পুকুরের মতো বিরাট হল তার উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক ফণা—যেন তার জীবনের সমস্ত কামনার রূপ নিয়ে দেখা দিল তার মাথায় আঁকা গোক্ষুরটি। এইভাবে করমালি নিমেষে আবৃত হল তার সংসার সাধ বাসনাসহ। তার ফণার নিচে বলশালী অন্ধকারের দাঁত কড়মড় ক'রে ওঠে এবং হাঙ্গরের মতো সেই দন্তপংক্তি গ্রামের মানুষের—ভেঙে-পড়া, ঘুণ-ধরা অথচ ঈশ্বরের মতো অমোঘ মানুষের সংগ্রামকে গ্রহণ করে এবং মুহূর্তে চিবিয়ে যেন গুঁড়ো ক'রে ফেলে। গোখরো তারপর হঠাৎ কাছে এল। করমালি কোদালের হাতলে হাত রেখে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু সে ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে গম্ভীর নির্ভয় রাজকীয় শালীনতার সঙ্গে চষা জমির ওপর দিয়ে আলটার কোল ঘেঁষে, সামান্য পানিতে অঙ্গ ডুবিয়ে নিষ্প্রভ আকাশের আলোয় অদৃশ্য হল।

করমালি যখন ফেরার কথা ভাবল, তখন হাঁসগুলো বিল থেকে উঠে এসে ডাঙায় দাঁড়িয়ে গা ঝাড়ছিল। শুধু ছোট একটা বাচ্চা তখনো ডুবে ডুবে গুগলি তুলছিল পরমানন্দে। করমালি ওদের দিকে তাকাতে আরো দেখল, বিরাট মেটে হাঁসটা এখন পালকের মধ্যে ঠোঁট গুঁজে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই দেখে সে বিলের দিকে তাকালো আর এক প্রচণ্ড বিশালতার চাপে ভীষণ ভয় পেয়ে রহমালিকে ডাকল তক্ষুণি বাড়ি ফেরার জন্য। রহমালি আপন মনে কাজ করছিল তার দিকে পিছন ফিরে, কাজেই করমালির ক্ষীণ শুকনো আওয়াজ তার কানে যায় নি। ইতিমধ্যে বিলটা তার বুকের ভিতর থেকে ভয়াল রহস্য আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেয়। তাই করমালির আহ্বান রহমালির কানে এখন বাজতেই থাকে, 'বাজান, শরীরডা বড় খারাপ লাগতিছে। কাজডা এ্যাহন থাক, বিকেল বেলায় করবানে।' রহমালি বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকায়। কাজ শুরু করার আগেই করমালির কী হয়েছে সে ভেবে পায় না। কিন্তু করমালির মুখের আতঙ্কের ভাষা পড়ে ফেলে রহমালি। 'তানাকে দেহিছিস রহম!'—করমালি জিজ্ঞেস করে।

'কার কথা কচ্ছ?'

উত্তরে করমালি মন্ত্রের মতো বার বার আওড়ায়, 'তানারে দেহিসনি—উরে কপাল ! তানারে দেখলিনে—আমার জমিতি রধিষ্ঠান করিছে। কনে ছিলি তুই ?'

রহমালি এখন বাপকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইছে। কারণ করমালি দুর্বোধ্য হয়ে উঠল তার কাছে। আকাশ অন্ধকারে গর্জন করলে, বাতাস বন্ধ হয়ে নিঃসীম অথৈ পানি কালো হয়ে উঠলে যখন অচেনা মাছ পিঠ উঁচিয়ে রেলগাড়ির মতো দৌড় লাগায়—সেইসব মুহূর্তে সবকিছু প্রচণ্ড ভয় আনে রহমালির মনে। করমালিকে এখন ওর ভয় করছে। কাজেই ওরা এখন কোদাল ঘাড়ে নিয়ে জমি থেকে উঠে আসছে। অল্প পানিতে পায়ের পাতা জাগিয়ে পানি ছিটোতে ছিটোতে বাড়ির পথ ধরেছে। তারপর আবার সেই ছায়াময় অন্ধকার পথ, বিশাল সিক্ত বাগান, বড় বড় ফোঁটায় টপ টপ বৃষ্টির শব্দ এবং কচ্ছপের মতো পিঠ-জাগানো বাড়িগুলো পেরিয়ে করমালির উঁচু ভিটে নজরে আসে এবং শুকনো কলাপাতা-ঝোলানো বেড়ার ফাঁক দিয়ে মায়ের ভেঙে-পড়া চালাটা দেখা যায়। সেইখানে দাঁড়িয়ে আকাশে দু'হাত তুলে হাস্যকর অঙ্গভঙ্গ করছিল বুড়ি, তাও দেখতে পায় করমালি। মায়ের হাঁটুদু'টো ফুলে ওলকপির মতো হয়ে আছে—কাজেই চেষ্টা করলেও এতটুকু হাঁটবার শক্তি নেই তার। সেজন্যে অতদূর থেকে যেহেতু তার ক্ষীণ চিৎকার করমালির কানে আসার কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা ছোঁড়ায় তাকে একটা বদখত ডাইনীর মতো মনে হয়। এই সময় অনেক মানুষকে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। বিশেষ ক'রে করমালির গোয়ালের সামনে একটা ভিড়ই বুঝি জমে উঠেছে। ঠিক তখুনি চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে শুকনো আমসির মতো বুক উন্মুক্ত ক'রে প্রায় বিবস্ত্র রহমালির মা চিলের মতো তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে আসে, 'উরে আল্লারে, আমার কী সব্বোনাশ হইছে রে !'

'আই'—কর্কশ ধমক দিল করমালি। 'কী হইছে, আঁ ? হইছে কী'—এই কথা বলতে বলতেই করমালি গোয়ালঘরে পৌঁছয় এবং মানুষ তাকে পথ ক'রে দেয় পরম সহানুভূতিতে। সে ভিতরে ঢুকে দেখল, প্রায় সমস্ত গোয়াল জুড়ে দীঘল তরুণ পুরুষ্টু ধলা বলদটা চার-পা মেলে নিথর শুয়ে আছে। সে তার সজল কালো চোখ মেলে আছে এবং তা থেকে পানি গড়িয়ে চোয়াল পর্যন্ত এসেছে আর ধপধপে ফেনা জমে আছে তার মুখের একপাশে। সামনের একটা পা হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে টান টান হয়ে করুণভাবে সে শুয়ে আছে। করমালি সেদিকে অর্থহীন চোখে চেয়ে থাকে। বুড়ো খোঁড়া গাইটা সর সর শব্দে লেজ নাড়ে। নীল রঙের বিরাট একটা মাছি

এসে ধলা গরুটার নিষ্প্রাণতার ওপরে বসে বসে পা ঘষে। করমালির কাঁধের ওপর দিয়ে, বগলের ফাঁকে, তার সামনে, পিছনে, আশেপাশে, উঠোনে অনেক মানুষ বিনা শব্দে নিঃশ্বাস ফেলে। তাদের চোখের তারা কাঁপে, পাঁজর জির জির করে। ক্ষেতে খামারের কাজ ফেলে কেউ কোদাল কাঁধে বা নিড়ুনি হাতে—অন্যের ক্ষেতে দিন-মজুরী থেকে এইমাত্র ফিরে এখন ক্লান্ত—বড় ক্লান্ত, বড় বেশি সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন এবং চোখ অন্ধকার-করা খিদের তাড়না! পিটুলি গাছে বর্ষার হাওয়া দোলে, ভেসে বেড়ায় এবং নিঃশব্দে অসহ্য হয়ে ওঠে। যেন কেউ ঘোষকের মতো আবেগহীন গলায় উচ্চারণ করে, 'সাপে কাটিছে!' এই কথায় সমস্ত বন্ধ দুয়ার খুলে যায় এবং শত সহস্র কণ্ঠে যেন অনবরত কথার ঢেউ বইতে থাকে। 'হ্যাহো তো, লোম টানলি উঠে আসে নাহি?' করমালি এখন একজনের হাতে সুন্দর সাদা ঘাসের মতো একগুচ্ছ লোমের দিকে চেয়ে থাকে। 'দেহিছ—ঠিক কইছি, সাপেই কাটিছে। আহারে—কী বলবানে, কী করবানে কও দিনি!' তারপর মানুষটা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আর যেহেতু কান্না জিনিসটা ভয়ংকর সংক্রামক—কাজেই যাদের সঙ্গে করমালির সম্পর্কমাত্র নেই শুধু এইছাড়া যে সকালে উঠে কাস্তে হাতে কাজের খোঁজে একসঙ্গে বের হতে হয় এবং কাজ পেলে 'চাচা,' 'ভাইপো' ইত্যাদি সম্বোধনে একসঙ্গে বেড়া বাঁধার বা জমি তৈরির কাজ চালিয়ে যেতে হয় বা নিজেদের একছটাক জমি নেই বলে অন্যের জমি ভাগে করার জন্যে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়, এককথায় বেঁচে থাকার তিক্ত সংগ্রাম ছাড়া অন্য কোনো ঐক্যসূত্র নেই যাদের সঙ্গে সেই তারাও করমালির দূর সম্পর্কের ভাইকে কাঁদতে দেখে চোখ মুছতে থাকে।

এইখানে হঠাৎ কেউ করমালির হৃদয়ের গভীরে আঘাত করে। সে প্রায় ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু পাশের মানুষটা আঁকড়ে ধরে ফেলল তাকে এবং তখন তার সামনে অন্ধকার শূন্য দিনগুলো ক্রমাগত পাক দিতে থাকল। কারণ এইকথা তার মনে এল, 'আমার তো জমি নেই একছডাক—মোডে জমি নেই আমার। যেটুন আছে, তাতে একটা মাসও চলে না। দামড়া দু'ডো ছিল তাই পরের জমি আবাদ ক'রে দু'ডো ধান পাই। এ্যাহন, এ্যাহন আমার ধলা গেল। আমি কী করবানে—উরে আমি করবানেটা কী? আমি কী করবানে?' এইভাবে প্রশ্নটা জলো বাতাসের মতো ঘুরে ঘুরে আসে, হাতুড়ির মতো আঘাত করে এবং তার হৃৎপিণ্ড কখনো গুঁড়িয়ে যায় হামানদিস্তার নিচে চরকের মতো—কখনো উলটোদিকে ধক ধক ক'রে লাফাতে থাকে। বাইরে রহমালির মা আরো বেশি বিলাপ করে, 'কী কাল-

সাপে খাইছে রে—ওরে আমারে ক্যান নেলো না।' এমন সব কথা সে বলতে থাকে যার কোনো অর্থ নেই এবং এই ঘটনার আবেগের দ্বারা স্পর্শিত না হলে যে-সব কথায় হাস্যোদ্রেক হতে পারে। শুধু দেখা যায় করমালি—যে এখন ধাতস্থ হয়ে পিঁচুটিঅলা চোখে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে। কিন্তু এই দৃশ্যটাকে হঠাৎ অতিমাত্রায় নাটকীয় ক'রে ফেলে রহমালি। উৎকটকণ্ঠে দু'হাতে পাঁজর চেপে প্রাণপণ শক্তিতে সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, ওর ভিতরটা যেন বোঝাই হয়ে ছিল—বোঝার ভারে তার মুখে রক্ত এসে গিয়েছিল, যেন শিরা ছিঁড়ে পড়ছে আর এখন সে নিজেকে ভারমুক্ত করছে, খালাস ক'রে দিচ্ছে সমস্ত বোঝা। ওর কান্নাটা শুধুই চিৎকার—কারণ যন্ত্রণার বোধ্য কোনো ভাষা নেই এবং এজন্যই সম্ভবত রহমালির অবোধ চিৎকার সবকিছুকে যন্ত্রণালিপ্ত করে, সমস্ত বিকেলের আকাশ ভারি হয়ে মানুষগুলোকে চেপে ধরে। মৃত গরুটাও এই যন্ত্রণার সহানুভূতিতে আর একটু হাঁ ক'রে একপাশে তার কালো জিভ এলিয়ে দেয়।

করমালি উঠোনে দাঁড়িয়ে বিলের দিকে তাকিয়েছিল। খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার নেমে আসছিল বলে বিলের রঙ কালো হয়ে যাচ্ছিল আর ধানভর্তি জমিগুলো কেবলই ছায়াময় ছিল এবং সেগুলোকে আকাশের গায়ে অযত্নে লাগানো বাড়তি রঙের মতো মনে হচ্ছিল। এক মুহূর্ত পরেই বৃষ্টি নামল। করমালি দাওয়ায় উঠে আসতে আসতেই বিল অন্ধকারে ডুবে যায়। খুঁটিতে ঠেস দিয়ে করমালি ভাবে হাওয়া যেমন বেড়ে উঠল তাতে বৃষ্টি বোধহয় সারারাত চলবে এবং তাতে মায়ের চালাটা কিছুতেই টিকে থাকতে পারে না। সে-ঘর থেকে এখন মিটমিটে আলো আসছে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে করমালি দেখল মা আপন মনে বকছে, আল্লার কাছে কিছু একটা নিবেদন করছে আর ফাঁকে ফাঁকে এটা-ওটা নাড়াচাড়া করছে—টেনে নিয়ে আনছে মোটা কাঁথা, মাটির সরা বসাচ্ছে পানি ঠেকানোর জন্যে। এসব করতে বড় কষ্ট হচ্ছে তার। হাঁটু সোজা ক'রে কিছুতেই দাঁড়াতে পারছে না মা।

রহমালি কি এতক্ষণ ঘরে ছিল? এই অন্ধকারের মধ্যে! রহমালির কথা মনে ছিল না করমালির। সে ধলা বলদটার বদলে রহমালিকে হারাতে প্রস্তুত ছিল। এই জন্যেই যখন সমস্ত ভবিষ্যৎকে সবলে রুদ্ধ ক'রে দিয়ে, অনশন উপবাস এবং উলঙ্গ মৃত্যুকে এক মুহূর্তে হাজির করে করমালির বুকের ধন অন্ধকার গোয়ালে শুয়ে আছে তখন আর রহমালির কথা মনে নেই। এখন দেখা গেল সে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসেছে এবং সম্ভবত অনেকক্ষণ পরে অন্ধকার আরো ঘন হলে, বাতাসের বেগ আরো বাড়লে আস্তে আস্তে ডাকছে করমালিকে, 'বাজান!'

করমালি শুনতেই পেল না। ছেলেটা তাই আবার একটা প্রচণ্ড হৃদয়ভার অনুভব করে। সেজন্যে সে উঠে আসে। করমালির কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায় এবং ফিস ফিস ক'রে বলে, 'তোমার তো ট্যাহা নেই বাজান। ধলা দামড়াটা মরিছে, আরতো গরু কিনতি পারবা না। এবারের ভাগচাষডা কী ক'রে করবা?'

'আমরা এবার মারা যাবানেরে বাজান'—আচমকা চিৎকার করে করমালি। ছিলাছেঁড়া ধনুকের মতো উঠে দাঁড়ায় আর আকণ্ঠ পিপাসার্তের মতো ঠাণ্ডা পানির লোভেই যেন দু'হাত বাড়িয়ে রহমালিকে বুকে টানে। 'মোড়ে মারা যাচ্ছি এবার। বর্ষাডা ক্যাবল শুরু হইছে, মালিক শোনবে যে গরু মরিছে, জমিগুলোন সব কেড়ে নেবেনে। কাল একবার মালিকের বাড়ি যাতাম, ধান চাতাম কিছু। এ্যাহন জমি নিয়ে নেবেনে, ধান পাবনানে এক ছডাক। কাল যে কিষেন দিতি হবে গেলি। কিষেনের ট্যাহায় চাল কিনি কোনো পেরকারে বাঁচতি হবেনে।'

'গরুটোরে সাপে কাটিল কহন, বাজান? মোড়ে জানতি পারলাম না। এট্টু ওষুধ দিতি পারলাম না। কেউ তো দেহেনি সাপডারে।'

করমালি অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে আছে জোনাকির দিকে, বৃষ্টির দিকে। হাওয়ায় গাছের মাথা দুলছে। সেইসব অন্ধকার, গাছ, আকাশ, হাওয়া ইত্যাদি পেরিয়ে বিশাল দুর্জ্ঞেয় বিল পড়ে আছে। সে এখন জীবনকে ছুঁড়ে দিল আকাশে এবং তারপরে আবার লুফে নিল এবং মৃত্যুকে ছুঁড়ে দিল। জীবন বিলের অপার অন্ধকার তলদেশে গিয়ে স্থির হয়, বৈদূর্যমণির মতো জলতে থাকে। সে তার বিশাল অতীতকে পর্যবেক্ষণ করে এবং মায়ার মতো মাটিতে, ঘাসে, বাতাসে, ধানে তার সারা দেহ জড়িয়ে থাকে। এই দেশের অনাদি প্রাণ তাকে ঘিরে স্পন্দিত হয়, কাঁপতে থাকে, নাচতে থাকে আর এই ভয়াবহ জীবনাচরণকে কেন্দ্র ক'রে অনন্তের প্রতীক বিলটা স্তব্ধ হয়ে থাকে। বিল জীবনকে পাকে পাকে বাঁধে—ব্যক্তিকে এবং মানুষ নামের ধারণাকে, করমালির সংগ্রামকে এবং জীবনসংগ্রামকে। সে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংগ্রামের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়ায়। তাকে ব্যর্থ করে, তছনছ করে, ধ্বংস এবং মৃত্যুকে পাঠায়, আবার গভীর মায়ায় মানুষকে জড়ায়, তাকে ভালবাসে। এইজন্যে অবয়বহীন কালো পাহাড়ের মতো কখনো তাকে দেখা যায় দিগন্তের কাছে, কখনো প্রায় বুকের ওপর, কখনো সে উৎক্ষিপ্ত হয় আকাশে ঘূর্ণির মতো এবং ঘর্ঘর শব্দে মন্থনদণ্ডের মতো গ্রামগুলোর ওপর নেমে আসে।

রহমালির গরম নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে করমালি। তার গা ঘেঁষে সে বসে আছে

এবং করমালি সেইখানে বসে আবার অনন্ত গোখরোটিকে দুলতে দেখতে পায়। যখন রহমালি সাপের কথা বলে, যে-সাপ তার বলদটিকে বিনষ্ট ক'রে দিয়ে গেছে এবং যাকে কেউ দেখতে পায় নি, সে-ই তার ফণা তুলতেই বিলের অভ্যন্তরে মানিকের মতো জ্বলতে থাকা জীবন হঠাৎ নিভে যায়।

করমালি দুর্ভেদ্য রহস্যের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়—যা বিনাশ এবং ধ্বংসের কাছে শপথ নিয়েছে। কাজেই সে দেখতে পায় বিলের পানি থেকে তার কুচকুচে কালো ঠোঁটদু'টি জেগে উঠল, তারপর স্বচ্ছ বিমর্ষ চোখদু'টি এবং ধারালো তলোয়ারের মতো লিকলিকে জিভ এবং সে থুথুর মতো নীল বিষ ছিটোলো। তারপরেই অকস্মাৎ বিস্তৃত ফণার মাথাটা শূন্যে লাফিয়ে উঠল। বিশাল একটা পুকুরের মতো ফণা—সেখানে গোক্ষুরটি ধপধপ করছে এবং সে ঈশ্বরের মতো অনন্ত হয়ে দুলছে। এখন সে ধীরে ধীরে হাঁ করল এবং একটা বীভৎস অতল গুহার জন্ম হল। সেখানে প্রথমে ধলা গরুটা, তারপরে করমালির কামনার রঙে রঙিন নতুন জমিটা এবং তার যা কিছু আছে—রহমালি এবং তার মা এবং করমালির ভিটে-বাড়ি সবকিছু সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল। এখন ফণাটা হারিয়ে গেছে, গোক্ষুরটি নেই, তার কালো জিভটাও চোখে পড়ছে না—শুধু বিকট একটা গুহার মতো অন্ধকারটা জীবন্ত হয়ে আছে। করমালি দেখছিল কত ধীরে এবং নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে অন্ধকার গাছপালা মাটি এবং অজস্র সাহসী মানুষসহ গ্রামটি ছোট হচ্ছে, আরো ছোট হচ্ছে এবং অন্ধকারে প্রবিষ্ট হচ্ছে। সমস্ত কিছু এইভাবে অন্ধকারে হারিয়ে গেল। অজস্র দাঁতের সারি ঝকঝকিয়ে ওঠে এবং বজ্রগর্জের মতো আওয়াজ ওঠে। তারপর উপর নিচু দু'সারি দাঁত আঁটো হয়ে বসে যায়।

আকাশের রঙ এখন পালটাচ্ছে। পৃথিবীতে একটা বিবর্ণ আলো আসছিল। হাওয়া ধরে গিয়েছিল বলে বৃষ্টিও নেই, আর সেজন্যেই আবহাওয়া বিশ্রী গুমোট। তখুনি বাইরে থেকে কে করমালিকে ডাকছিল। সে কিছুতেই বুঝতে পারছিল না যে কেউ তাকে ডাকছে। কিন্তু বাইরে থেকে একটি কর্কশ গলা তাকে ডেকেই চলেছিল, 'করমালি আছিস নাহি? ও করমালি!' এখন বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল বলে বাইরের মানুষটার চিৎকার গভীর শোনাচ্ছিল। তার হাতের টর্চের আলো ইতস্তত দৌড়ে বেড়াচ্ছিল কখনো বৃষ্টিধোয়া গাছের মাথায়, কখনো এমনি আকাশে উদ্দেশ্যহীন, কখনো বা করমালির বাড়ির ভিতরে উঠোনে। করমালি এজন্যে উঠল, উঠন পেরিয়ে বেড়ার কাছে গিয়ে সারসের মতো গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেডা?' সে মানুষটাকে আবছা দেখতে না দেখতেই গ্রামের মানুষের বদভ্যাস

মাফিক লোকটা তার মুখের ওপর টর্চের আলো ফেলে। করমালি চোখ কুঁচকে আবার জিজ্ঞেস করে, 'কেডা—কেডা ডাকতিছেন?' পরিচয় দেবার প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে গম্ভীর গলায় লোকটা বলে, 'এ্যাট্টা খবর শুনে আসতি হল তোর কাছে।' এইবারে তাকে চিনতে পারে করমালি। ঠাণ্ডা ভারি গলায় আহ্বান করে, 'আসেন।' তারা দাওয়ার কাছে আসতেই রহমালি একটা জলচৌকি এবং কালি-পড়া হারিকেন নিয়ে আসে। তখন লোকটার চেক লুঙ্গি, দামী ময়লা জামা, রবারের জুতো, পোড়া কালো রঙ এবং মোটা ঘাড়ের ওপর কাঁচাপাকা চুল ইত্যাদি চোখে পড়ে। সে জলচৌকিতে চেপে বসতে করমালি সোজা দাওয়ায় বসে পড়ে এবং হঠাৎ অসহ্য গরম লাগাতে গামছা দিয়ে বাতাস খেতে থাকে। তখন লোকটা ভ্রূ কুঁচকে চোখ একেবারে বন্ধ ক'রে ফেলে একজন চিন্তানায়কের মতো কথা শুরু করে, 'কী আপসোসের কথা! গরুটো তোর আপনাতে মরে গেল। তা আবার এই সময়ে। এ্যাট্টা কাঠা জমিও তো আবাদ করতি পারলি নে। কি গজব যে নামিছে মানুষের উফর!'

করমালি শোনে।

'তা কী আর করা যাচ্ছে কও। গরুতো আর বাঁচাতি পারতিছ না!'

'কী ক'রে পারতিছি আর'—করমালি কথা বলে।

'তা এ্যাহন কী করবি? গরু কি কিনতিছিস?'

'আমারে বেচলিও গরুর এ্যাট্টা ঠ্যাং কিনতি পারবনানে।'

'তাহলি? ঠ্যাং কিনলিও তো আর কাজ হচ্ছে না।'

করমালি কাজেই আবার শোনে।

'আমি তো আর জোতদার নই, কী কও করমালি। দক্ষিণি জমিও নেই এক ছডাক। বছর শেষ ধানকডা পালি সোংসারডা চলে। তা তুমি তো আর আবাদ করতি পারতিছ না এবার। তাহলি আমার জমিগুলোর কী হচ্ছে ক।'

'কী কবানে কন দিনি?'

'আমি কই কি জমিগুলো এবার ছেড়ে দেও। আসছে বছর গরুটরু হলি আবার নিও, ক্যানে? তোমারে ছাড়া জমিতো আর কারে দিচ্ছিনে।'

উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ খড়্গটি ঠিক এই সময়েই থামে। ঐখানে জলচৌকিতে বসে লোকটা করমালির মাথাটা হাড়িকাঠে ঠেসে ধরে। তার চোখে শীর্ণ মৃত্যু কাঁপে। অন্ধকার পাথরের মতো বুকে চেপে বসে এবং যখন সে বিলের অথৈ পানিতে নেমে যাচ্ছে, তখন সে বাতাসের জন্যে শেষ চেষ্টায় বলছে, 'জমিগুলো নিলি আমি

বাঁচপোনানে – উপোস ক'রে শুকিয়ে মরে যাবানে।'

'আরে বিপদ! আবাদ করতিছ কী ক'রে আমারে কও দিনি?'

'আবাদ আমি করবানে। ছাহেন ঠিক আবাদ করবানে।' করমালি উঠে এসে লোকটার কাছে দাঁড়ায়। লাঙল কেনবানে আমি। ট্যাহা জোগাড় ক'রে লাঙল কিনি আপনের জমি আমি আবাদ করতিছি।' এই বলে সে মিনতি চালিয়ে যায়, 'বর্ষাডা শুরু হইছে ক্যাবল, আর কয়টা দিন ছাহেন। তহন না হলি জমি ছেড়ে দেবানে কচ্ছি।'

'এই হপ্তার মধ্যি আবাদ শুরু না হলি জমি আমি তোমার কাছে রাখতি পারব না, করমালি। আমাকেও তো বাঁচতি হবে।' এই বলে লোকটা উঠে দাঁড়ায় এবং টর্চ জ্বালিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে সাবধানে উঠনে নামে ও একটু পরেই অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

করমালি ফিকে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখল, বিল দিগন্তের কাছে এখন স্থির হয়ে ঝুলছে। তারপর তার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের নিচের দিকটা সামান্য কাঁপল এবং রঙহীন, অবয়বহীন বিকট একটা অস্তিত্ব এখন দ্রুত আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কখনো সেটা সমস্ত আকারহীনতাকে অতিক্রম ক'রে সূক্ষ্ম দ্যুতিময় তীরের ফলার মতো শূন্যতায় বিঁধছিল, কখনো বেঢপ কল্পনাতীত বৃহৎ হাতির শুঁড়ের মতো অস্পষ্ট নড়েচড়ে বেড়াচ্ছিল। নিচে পৃথিবীতে নিশ্চলতার মধ্যে মাছের খোলা চোখে অন্ধকার ডুবেছিল, ধান বেড়ে উঠছিল, কোথাও হয়তো কুমুদ ফুটেছিল আর এই আদিম অফুরন্ত আয়োজনের ভাঁজে ভাঁজে বিশালতা সাজানো ছিল ও অনিঃশেষ প্রাণ ছিল, অমর মৃত্যু ছিল, শ্রেণীবদ্ধ হাতিয়ার হাতে মানুষেরা ছিল এবং মুখোমুখি তাদের শত্রুরাও ছিল।

করমালিকে ডাকল রহমালি, 'বাজান। বাজান এ্যাহন কী করবা?' সে তখন একেবারে শিশু হয়ে গেছিল বলে এই একটা প্রশ্নই বার বার করছিল বোকার মতো।

করমালি কোনো জবাব দিচ্ছিল না। তখন ছেলেটা চুপি চুপি বলল গ্রীষ্মের দুপুরের চাতকের ফটিকজল চাওয়ার মতো, 'বাজান, এ্যাট্টা কাজ করলি হয় না? ধলার বদলে আমি – আমি লাঙল টানতি পারিনে? একদিকি বুড়ো দামড়াডা আর একদিকি আমি। পারিনে বাজান! জমির মাটি তো মাখনের মতো। পারব না আমি কও!' আকাশ হাউই-এর মতো জ্বলে উঠল এবং মুহূর্তে কেন যেন টকটকে লাল হয়ে এল। করমালি এইবার দীর্ঘ তপ্ত নিঃশব্দ কাঁদছে। দু'হাত মুখের ওপর

চাপা দিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে, একটা কান্নাই ফিরিয়ে ফিরিয়ে কাঁদছে। সঙ্গীতের সুরের মতো বার বার শুরুতে ফিরে আসছে : 'কী কস তুই বাজান, কী কস।'

প্রস্তাবটা ক'রে ফেলার পর রহমালি তীব্র উত্তেজনায় জ্বলে এবং নিজের অজান্তেই করমালির জনকে রূপান্তরিত হয়। 'তালি মরবা নাহি? ট্যাহা আছে তাই গরু কেনবা? জমিগুলো ছেড়ে দিলি কি কলাডা খাবা সারাবছর। জমি আবাদ করতি হবে আর বিলির ধারের আমাদের পগারডায় এবছরই ধান রুতি হবে। বুজিচো?'

একটু পরেই রান্নাঘরের কালো ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে করমালি দু'হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বসে আছে। রহমালি বাইরে হাতমুখ ধুচ্ছে। কুপির পাশে বসে নতুন বউ-এর মতো গাঢ় নীল শাড়ির ঘোমটা দিয়ে অনেক পুরনো তরুণী রহমালির মা ভাত বাড়ছে। মাটির শানকিতে মোটা মোটা লাল ভাত এবং দু'টো টুকটুকে লাল লংকা করমালির নাড়িতে ঘূর্ণির মতো মোচড় দিতে থাকে এবং সে তখন আর কিছুই মনে রাখতে পারে না।

'মা কনে? ঘুমাইছে নাহি?'—করমালি জিজ্ঞেস করে।

'হ, ঘুমাইছে।'

'ভাত খাইছে?'

'না। খাবে এ্যাহন। তোমাদের হলি খাবেনে।'

রহমালি হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এলে করমালি খেতে শুরু করে। খেয়ে উঠে রহমালির ঘুম পাচ্ছে। এখন তার ঘোর কেটে গেছে। কাজেই খিদের অবসান হয়েছে বলে আর মেঘ কেটে যাওয়া রাত্রির আকাশ থেকে ঝরঝরে ঠাণ্ডা বাতাস বওয়ায় রহমালি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। সে উত্তরের পোতার ঘরে গিয়ে চাটাই পেতে শুয়ে পড়ল। প্রায় তখুনি তার নাক ডাকার শব্দ আসছে। তাই শুনতে শুনতে করমালি উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছে এবং তারো চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে থাকে। সে আর দেরি করতে পারবে না বলে শেষ খবরদারিটুকু ক'রে নিতে চাইল। অতএব বাড়ির বাইরে এসে সে ফাঁকা ভিটেটায় দাঁড়ায় এবং হাঁটতে হাঁটতে পড়ো পড়ো ঘরগুলোর পিছনে এসে খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে। তখন গভীর অরণ্যের স্তব্ধতা গ্রামের পথে পথে, বাগানে এবং বড় বড় গাছের ডালপালায় ছড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছিল এবং কালো শ্লেটের মতো আকাশে অজস্র তারাও ফুটেছিল। করমালি দেখল সে তার গোয়ালঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিমধ্যে হাঁড়িকুঁড়ি, থালাবাসন ইত্যাদির শব্দ বন্ধ হয়ে গেছিল।

করমালি পায়ে পায়ে গোয়ালঘরে ঢুকেছিল কিন্তু সেখানে অপরিমিত অন্ধকার ছাড়া প্রথমে আর কিছুই ছিল না। তারপরে মুমূর্ষু গাইটা ফোঁস ফোঁস ক'রে নিঃশ্বাস ফেলে অন্ধকারকে সচকিত ক'রে দিল। এবং করমালির চোখে তারারা কেঁপে উঠলে সে অন্ধকারকে ফিকে হতে দেখল। একটু দেরি করতেই তার মধ্যে বিশাল ছায়ার মতো মৃত গরুটি ভেসে ওঠে—ঘাড় তেমনি একদিকে কাৎ করা, পাগুলো ছড়িয়ে পড়া—তেমনি করুণ অসহায় হয়ে সে মাটিকে আশ্রয় ক'রে অন্ধকারে ঝুলছে। একটু বাতাস দিতেই করমালির মনে হল পালকের মতো হালকা ছায়াটা শূন্যে ভুলে উঠল এবং চোখের ওপরেই ক্রমাগত থির থির ক'রে কাঁপতে থাকল। কিন্তু হাওয়া বন্ধ হতেই সে আবার মাটিতে নামে, সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকে। করমালি তখন তার পাশে মাটিতে বসে পড়ে। হাত বাড়িয়ে তার শঙ্খের মতো সাদা কোমল গলায় হাত রাখে। কিন্তু একটা শীতলতা স্থির সংকল্পে অটুট থেকে করমালিকে আক্রমণে বিধ্বস্ত করে, আর সে সান্ত্বনাহীন কান্না কাঁদে। এইভাবে চোখ অন্ধকার হয়ে গেলে ছায়াটা আবার হারিয়ে যায়। তার পিঠের ওপর চোখ ঘষে ঘষে করমালি তাকে হাতড়াতে থাকে। এই সময় পিছনে দরজার ওপর ক্ষীণ আলো এসে পড়ে এবং গাঢ় নীল রঙের শাড়ি-পরা রহমালির মাকে দেখা যায়। তার হাতের কুপি থেকে গলগল ক'রে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এবং সে কুপিটাকে উঁচু করে ধরা গরু আর করমালিকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছে। তার শীর্ণ তোবড়ানো মুখ লালচে আলোয় প্রায় বিভৎস হয়ে উঠেছে এবং নগ্ন চোখদু'টো কোঠর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু এইসব ছাড়িয়ে যেভাবে তার কুপি-ধরা উঁচু হয়ে আছে এবং তার ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ থেকে বিনত মায়াবী দৃষ্টি চেয়ে আছে তাতে করমালি সরাসরি ভেঙে পড়ে, 'কী করব কতি পারো, রহমের মা? আমি এ্যাহন কী করব?'

'কাঁদলি বাঁচপে?'

'না।'

'তবে কাঁদতিছ ক্যানো।'

'আমি কী করব বুঝতি পারতিছি নে।'

গুমোট গরমের দিনে ঝিরঝির বৃষ্টির মতো রহমালির মা সেই অদ্ভুত প্রস্তাব করে, 'আমারে দিয়ে হয় না? কও। আমি তো দেহিছি দামড়া না থাকলি দুধের গাই দিয়ে আবাদ করিছো জমি। এ্যাহন আমারে দিয়ে পারবা না? রহমালিকে পেটে ধরিছি, তোমার সংসার টানতিছি এতদিন। আমি পারবানে, দেহো তুমি।'

করমালির চোখ এখন শুকিয়ে গেছে এবং সে আশ্চর্য বিব্রত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সকালে উজ্জ্বল রোদে মরা গরুটাকে বের ক'রে পড়ো মাঠে রেখে আসা হল। দশমিনিটের মধ্যে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়ে যেতে সেটা টকটকে লাল হয়ে সকালের রোদে একস্তূপ আগুনের মতো জ্বলছিল। করমালি সেখান থেকে সোজা তার গতকালের জমিতে এসে পৌঁছল। বিল এই সময় সবকিছু পালটে মোহময় হাসছিল। কারণ সূর্যের আলো লম্বালম্বি তার ওপর পড়ায় কালো পনির ওপর ধবধবে সাদা ফিতের মতো রেখা শুয়েছিল এবং সেটাকে সত্যিকার কোনো মাছের পিঠ বলে মনে হচ্ছিল, আর যেখানে সূর্যের আলো শেষ হয়ে সূর্যটাই বিম্বিত হয়েছিল সেখানে গলিত রূপোর মতো অপরিমেয় পানি অল্প বাতাসে শির শির ক'রে কাঁপছিল। সেদিকে চেয়ে করমালির চোখ অস্বস্তিতে করকর করলেও সে বার বার ঐ রূপোরাশির দিকে তাকাতে চাইছিল। কিন্তু অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল। তাই সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে করমালির চোখ একেবারে ধানের চারাভর্তি ছোট সবুজ টুকরো টুকরো জমির দিকে তাকালো। বিশেষ ক'রে বিলের মধ্যে তার নিজস্ব যে একটুকরো জমিতে এখন বিঘতখানেক উঁচু ধান মাঝে মাঝে বাতাসে নেচে নেচে উঠছিল সেদিকে তার অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল। সে একই সঙ্গে রহমালি এবং তার মায়ের কথাও চিন্তা করছিল। চিন্তা করতে করতে মুহূর্তের মধ্যে সে বিল এবং বিল সংলগ্ন সমস্ত গ্রাম হাটবাজার ইত্যাদি সবকিছু কল্পনায় ঘুরে এল। রবিবারের হাটে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করছিল। এই ভিড়ে করমালি দাঁড়িয়েছিল। অন্যদিন যে-পড়ো জমিটা ভাগাড়ের মতো নির্জন হয়ে থাকে—কাক বা চিল ছোটখাটো হাড় কিংবা অন্যকিছু নোংরা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করে, মরা বিড়াল বা কুকুরের ওপর শকুন এসে বসে এবং পত্রহীন শিমুলগাছে কিছু কিছু ঘুঘু এসে দুপুরের ক্লান্তিতে ডাকতে থাকে—সেখানে এখন সাদা কালো এবং আরো অনেক বর্ণের, অনেক আকারের অগুনতি গরু মাথা ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বড় বড় কান খাড়া হয়ে উঠছে, কখনো লেজ নাড়ার সপ সপ শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং শরীরের অংশবিশেষের চামড়া কাঁপিয়ে ছোট কালো মাছি তাড়াতে দেখা যাচ্ছে। করমালি বিলের প্রান্তে তার অসমাপ্ত ঝোপজঙ্গল ভরা পগারের মতো উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালালদের ঘোরাফেরা যেন দেখতে পাচ্ছিল এবং দরাদরি করার চিৎকার শুনতে পাচ্ছিল। এই সময় রহমালি কথা বললে সে চমকে ওঠে। রহমালি বলছিল, 'বাজান, আইজ জমি সবডা সাফ না

করতি পারলি এবার আবাদ করতি পারবা না।'

'বিলের পানি কি এ-পর্যন্ত আসবে নে?' – করমালি জিজ্ঞেস করে।

'আসতিও পারে। মোডে বর্ষা শুরু হইছে, বিষ্টি তো আশ্বিন মাস পর্যন্ত হবে নে।'

করমালি নারকেল গাছটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে সে নামহীন লতাপাতা ঘাস কাঁটাগাছ ইত্যাদির জঙ্গলের মধ্যে সেই বলিষ্ঠ প্রাচীন প্রাণীটিকে খুঁজতে থাকে। কালো মাটির খাঁজে খাঁজে পানি জমে আছে এবং তারা সূর্যকে বুকে নিয়ে ঝিকমিক করছে। মাটির মতো প্রবীন, প্রাণপণ ও অসংখ্য সময়ের মধ্যে দিয়ে অফুরানভাবে চলে চলে যে বয়েসের ভারে পৃথিবীর মতো শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং যার ওপর এখন সময় ধীর হাতে শেওলার আস্তরন পড়ায় সেই অমিত বলশালী অজেয় সর্পটিকে করমালি খুঁজছিল। এবং সে ভালো ক'রেই জানত এখন তাকে না পাওয়া গেলেও যে কোনো সময়ে এবং যে কোনো জায়গায় তার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কারণ যে সময়ের নিত্য সঙ্গী তাকে বার বার ফিরে পাওয়া যেতে পারে এবং বার বার হারানোও যেতে পারে। সময়ের সঙ্গে মিশে আছে বলে সে অস্তিত্বে আছে এবং সচেতনতায় প্রদত্ত এবং অবচেতনায় ক্রিয়াশীল। কাজেই তাকে অতিক্রম করা যায় না, যদিও এটা নির্দিষ্ট যে তোমাকে তারই সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে এবং পরাজয়ের হাতে বার বার আঘাত খেয়েও তোমাকে নতুন কৌশলে ও দক্ষতার সঙ্গে সমস্ত অস্ত্র তীক্ষ্ণ ধার ক'রে নিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই ব্যাপারের সঙ্গে কাজেই মৃত্যুর প্রশ্নও জড়িত রয়েছে এবং সম্ভবত তুমি মৃত্যুতেও তারই কাছে প্রত্যাবর্তন ক'রে থাকো। মৃত্যু দুর্জ্ঞেয় বলে তাকেও তোমার দুর্জ্ঞেয় বলে মনে হয় এবং এই কারণেই বান এলে, তাদের জমিতে নোনা পানি ঢুকলে, সাপে কাটলে, বজ্রপাত হলে, মালিক জমি কেড়ে নিলে তোমার তার কথাই পৌনঃপুনিক মনে হয়। এবং জীবন্তেরও এইকথা, মনে হয়, কারণ জীবনেও সে আদিঅন্তহীন। তোমার আমার জীবনের সঙ্গে নয়—জীবনের প্রবাহের সঙ্গেই সে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে।

করমালি একমনে কাজ করছিল। তার শীর্ণ হাতের পেশিগুলো তখন পার্থিব নয়। আদতে সেগুলিকে দেখাচ্ছিল নীলচে ইস্পাতের মতো—কারণ করমালির রঙ কুচকুচে কালো এবং সে প্রচুর পরিমাণে ঘামছিল বলে রোদ তার শরীর থেকে পিছলে পিছলে পড়ছিল। যেহেতু আজ আকাশে মেঘের কণামাত্রও ছিল না, অথচ গতকাল প্রায় সারাদিনই বর্ষণ হয়ে গেছে এবং বাতাসে আর্দ্রতা আছে প্রচুর পরিমাণে,

এজন্যে মাটি থেকে গরম বাষ্প উঠছিল। গুমোট গরমের অন্ত ছিল না। যার জন্যে রহমালি প্রায়ই ঝোপের আড়ালে বিড়ি খাবার ছলে বিশ্রাম নিতে চাইছিল। বিলের পশ্চিমদিকের রূপোর থনিটা অনেকক্ষণ আগেই মাঝখানে চলে এসেছিল। এখন সেটা আস্তে আস্তে পুবদিকে ওদের কাছাকাছি চলে আসছে। করমালি নারকেল গাছের নিচের সামান্য ছায়াটুকুতে দাঁড়িয়ে কোদালের লম্বা বাঁটটা তল-পেটে ঠেকিয়ে দম নিচ্ছিল। জমিটার প্রায় সমস্ত জঙ্গলই এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। রহমালি কাটা জঙ্গলগুলো জমির চারপাশে সাজিয়ে ফেলেছে এবং কিছুটা অংশে কোদাল চালিয়ে প্রায় ছয় আঙুল পরিমাণ মাটি উলটিয়ে চিৎ ক'রে দিতে পেরেছে। করমালি এখন খিদে এবং পিপাসার জন্যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছিল না। তবু সে ভাবছিল কী কী করতে পারে সে। প্রথমত এই নতুন তৈরি জমি থেকে ধান পাওয়ার আশা এ-বৎসর কোনোমতেই করা চলে না এবং দ্বিতীয়ত তার নিজের জমি থেকে বারো-চোদ্দ মনের বেশি ধান পাওয়া যেতে পারে না। এইজন্যে জমিগুলো তাকে রাখতেই হবে। কিন্তু কীভাবে রাখা যায় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিল না করমালি। বাপকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রহমালি ভাবল এখন করমালি নিশ্চয় একটা বিড়ি খেতে চাইবে। তাই সে কোঁচড় থেকে বিড়ি দেশলাই নিয়ে তার দিকে এগিয়ে যায়। করমালি রহমালির দিকেই তাকিয়েছিল এবং তার দিকে তাকাতে রোদ চোখে পড়ছিল বলে যখন সে কপালের ওপর হাত দিয়ে আড়াল করছিল চোখদু'টোকে, তখনই তার চোখের ছায়ার নিচে জমিটার একটেরে ছোট্ট শীতল ঝোড়িটায় গোখরোটিকে শুয়ে থাকতে দেখতে পেল। আজ তার উজ্জ্বল রঙ মেটে মেটে দেখাচ্ছিল এবং তার ওপর লতাপাতা বাতাসে ইষৎ কাঁপছিল। তাই রোদ এবং ছায়া সেখানে পাশাপাশি খেলা করছিল। এইজন্যে আজ করমালির তাকে বিচিত্র আঁককাটা অজানা একটি প্রাণী বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বা বোধহয় দেখার আগেই করমালি চিনতে একটু দেরি করে নি। এইভাবে শুয়ে শুয়ে সে পৃথিবীর সঙ্গে তার আদি সম্পর্কে ফিরে গিয়েছিল। রহমালি কাছে আসতে করমালি আপন নিয়তিকে দেখানোর মতো আঙুল উঁচিয়ে তাকে দেখালো। সে যেন নিজের কপালের অদৃশ্য জটিল অক্ষরগুলোকে নির্বিকারভাবে রহমালিকে দেখাতে চাইল। রহমালি প্রথমে মাটিতে মিশে-থাকা জীবটিকে দেখতে পাচ্ছিল না। তারপরে যখন সে তার চোখে পড়ল তার সমস্ত শরীর সামান্য সময়ের জন্যে কেঁপে শক্ত হয়ে এল। কিন্তু এই অবস্থাটা থাকল অত্যন্ত অল্প সময়ের জন্যে। বয়সের এবং মানসিক পরিণতির সোজা প্রমাণ হিসেবে যে-কঠিন ভোঁতা ধৈর্য তার

কপালে এবং চিবুকে, অল্প গজিয়ে ওঠা দাড়ি-গোঁফে এবং ঠোঁটের রেখায় দানা বেঁধে উঠছিল এবং একটি নির্দিষ্ট বাঁধাধরা জীবনের বাসিন্দা হিসাবে স্থপতির মতো দক্ষতার সঙ্গে জীবনব্যবস্থা যে-কঠিন ও শান্ত, বিমর্ষ ও কৌতুকবিমুখ সংগ্রাম-পরায়ণতা তার সর্ব অবয়বে গেঁথে গেঁথে দিচ্ছিল সে-সমস্ত মুহূর্তে ঝরে যায়। কাজেই বিপুল অভিজ্ঞতার গ্রন্থিতে আবদ্ধ যে-করমালির চেতনা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে জীবনের অবশ্য-ঘটনীয়কে গ্রহণ করতে পারে এবং উপলব্ধিতে দৃঢ় থাকতে পারে তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে রহমালি বাল্যে ফিরে যায়। ঝরনার মতো চঞ্চল হয়ে ওঠে তার শরীর। কৌতুকে কাঁপে চোখের তারা। অনভিজ্ঞ শিশু-ঘোটকের মতো উদ্দাম দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে সে। সে সমস্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার পারম্পর্য হারিয়ে ফেলে এবং অবিমৃষ্যকারীর মতো ছুটে গিয়ে তার কোদালটা নিয়ে ফিরে আসে। এ-সমস্ত করতে থাকল সে যতক্ষণ, করমালি নির্বিকার দাঁড়িয়ে থেকে তাকে লক্ষ করে। সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল যে রোমাঞ্চকর কোনোকিছুই ঘটতে পারে না, তবে শোচনীয় শোকাবহ কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু সে-সম্ভাবনাতেও বিচলিত বোধ করে না করমালি—কারণ তা যদি ঘটেই তবে তার শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। কাল যখন তার সঙ্গে দেখা হল তখন থেকে। হতে পারে তারও আগে থেকে, তার সচেতনায় সমস্ত জীবন ধরে। জীবনের কুটিল কষ্ট অন্ধকারের মধ্যে। তার শুধু আত্মক্ষয়ী সংগ্রামে নিজেকে টিকিয়ে রাখার মধ্যে। এইভাবে জীবনের শুরুতেই—অন্ধকার, খিদে, বাসনা, দলিত কান্নাসমূহ, শূন্যতার গহ্বর, জমি, মাটি বিল, লোকালয়, মানুষ—এই সমস্ত ক্রমের ধাপে ধাপে সেই আরম্ভ চলে চলে আসছে। গতকালের করুণ মৃত্যুতে সে ছিল, হয়তো এখনো কোনো নতুন মৃত্যুতে সে থাকবে।

রহমালি পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। তার শরীর ফুলে উঠেছে। পেশি দৃঢ় হয়েছে। দু'হাতে কোদালটাকে উঁচিয়ে মাথার ওপর তুলে সে এখন তার একান্ত কাছে হাজির হয়েছে। কিন্তু সে ঠিক তেমনি ক'রে নিথর শুয়ে। করমালি এদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বিলের দিকে তাকালো। এক্ষুণি বাড়ি যেতে হয়—কারণ দ্রুত বিকেল নেমে আসছিল। রহমালি তাকে এখন নাগালের মধ্যে পেয়েছে, সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য স্থির করছে। তারপর নীলচে আলোর ঝলকানির সঙ্গে কোদাল পড়ল। মাটিতে কোপ পড়ার সেইটুকু সময়ের মধ্যে কানে তালা লাগার মতো প্রচণ্ড গর্জন ভেসে এল—হিস-স্-স্। বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুত গোখরোটি লেজের ওপর ভর দিয়ে বিশাল ফণা তুলে রহমালির প্রায় মাথার ওপর দুলতে লাগল। ঠাণ্ডা

ধারালো চোখে সে রহমালিকে নিরীক্ষণ করল একটু। তারপর মাথা নামিয়ে এক সময়ে অদৃশ্য হল।

বিস্মিত ভীত করুণ ছেলেটা দাঁড়িয়ে। করমালি কাছে এসে বলছে, 'কেউ মারতি পারে না। ওরে মারা যায় না কোনোদিন!'

ব্যাপারটা এইভাবেই ঘটল। রহমালি ফিরে এসে তার মাকে আশ্চর্য সাপটার কথা বলল এবং সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাহিনীটাকে সবিস্তারে বর্ণনা করার জন্যে বেরিয়ে গেল। সে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে কিভাবে বিষয়টার অবতারণা করে-ছিল কে জানে। হয়তো একটা জলচৌকি বা চাটাই টেনে নিয়ে বসে পড়ে কিংবা মানুষটাকে উঠোনের একদিকে টেনে নিয়ে ব্যাপারটা বলতে শুরু করেছিল। কিন্তু যা সে বলেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি কার্যকরী হয়েছিল তার বিস্মিত চোখের সন্ত্রস্ত চাহনি, হাতের সমুচ্চ মুদ্রা এবং একটা গভীর আবেগ যা তার কণ্ঠস্বর বার বার কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। সাপটার বর্ণনা দেবার সময় সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, চোখের তারা কৌতুকে ভয়ে নাচিয়ে তার বিশাল আকৃতির মেটে রঙের ফণা, তার বিদ্যুতের মতো গতি আর নিষ্ঠুর ক্রোধ এবং সীমাহীন শক্তি এবং অপার দয়ার প্রসঙ্গ ক্লান্তিহীনভাবে টেনে আনছিল। চেষ্টা করছিল বর্ণনাটা যাতে সঠিক ও জীবন্ত হয়। এজন্যে সময়ের এবং পারিপার্শ্বিকের কথাও তুলে ধরার চেষ্টা করেছিল সে। সূর্য, আকাশ, বিল, ধানের জমি, দুপুরের রোদ, ছায়াময় বনভূমি এবং অল্প কাঁপতে থাকা অতল জলরাশি ইত্যাদি—সবকিছুই এক অদ্ভুত গ্রাম্যভাষায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল তার কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে। এইরকম অবিশ্বাস্য তৎপরতায় ফলে সম্ভবত সন্ধ্যার আগেই সাপটি গ্রামটিকে তার বিশাল শরীর দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে ফেলেছিল, কারণ এইভাবেই কিছুমাত্র ব্যস্ত না হয়ে নিশ্চিন্তভাবে কাজ করার রীতি তার। সে অত্যন্ত ধীরগতিতে পৃথিবীর বয়সী গ্রাম্যচেতনায় উপস্থিত হতে জানত, কারণ গ্রামবাসী তার মধ্যেই সংগ্রাম করত, বাঁচত এবং মরত। এজন্যে কখনো সে তাদের তৈরি হতে সময় দিত, কখনো ঝাঁপিয়ে পড়ত অতর্কিতে। এখন রাত্রি নেমে আসতে না আসতেই সে প্রতিটি মানুষের চেতনায় হাজির হল। তখন তারা কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ না হয়ে কেবলমাত্র তাদের সংকল্পকে সংঘবদ্ধ করতে থাকে এবং চেতনাকে বল্লমের ফলার মতো তীক্ষ্ণ ক'রে নিয়ে আসে এবং সকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে একসঙ্গে মাঠের কাজে বেরোয়, দিনমজুরের কাজে যায়, যেভাবে একসূত্রে বাঁধা থেকে যাবতীয় সংস্কারের পরিচর্যা ক'রে গ্রামীণ জীবনের আদিমতাকে টিকিয়ে রাখে, লাঙল গরু হাতিয়ার ইত্যাদির বিবর্তন ঘটতে

দেয় না—ঠিক সেই একইরকম জোট বাঁধার নমুনায় তারা করমালি এবং রহ-মালিকে বাড়ি থেকে জমির দিকে ডেকে নিয়ে যায়। 'দেরি করলি চলবেনা নে। ওডারে শ্যাষ ক'রে যে যার কাজে যাবানে। বাড়ির পাশে ও কাল রাখা কাজের কথা না, বুজিচো?' এই কথায় প্রত্যেকে নীরব থেকে নিজের নিজের হাতিয়ারের দিকে মনোসংযোগ করে। এইদলে প্রবীনদের অনেকেই আসে নি এবং যুবকদের তুলনায় কিশোর ও বালক ছিল সংখ্যায় অনেক ভারি। প্রবীণরা হয়তো কর-মালির মতো ব্যাপারটার নিরর্থকতা বুঝতে পেরেছিল। হঠাৎ একজন দলের মাঝখান থেকে লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'তাহলি এডাই তোমার গরুডা কাটিছে।' করমালি ভাবল যদি সে ইচ্ছা করে থাকে তাহলে হয়তো তাই। কিন্তু সে-কথায় নকিব, রকিব, সরদারদের দু'ভাই, রউফ জমাদার, সাবু মণ্ডল, হারান বিশ্বাসরা—সবাই একটু যেন কেঁপে উঠল।

মনের পিছনে যতক্ষণ সে আবহ সঙ্গীতের মতো ক্রমাগত কাজ ক'রে যাচ্ছিল, ততক্ষণে তারা বর্ষা বিল জমি ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করছিল। এইসব প্রসঙ্গ তাদের জীবনের অনুষঙ্গ। আর এইসব কথা তাদের মনে যেমন অনুরণন তুলত তেমন আর কিছুতেই না। কারণ তাদের বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা এসব কথা পুনঃপুনঃ বলে যেত এবং সেজন্যেই সেগুলো গ্রামের পথে, তেঁতুলতলার অন্ধকারে, শান বাঁধানো পুকুরের ঘাটে এবং সর্বত্র ওদের ঘরে বাইরে এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিশে-ছিল। বহু বহু বছরের এই শ্রবণের ফলেই তারা নতুন কিছু ভাবতে পারত না, অভিনব বিষয় ও বাক্য ব্যবহার করতে পারত না। কাজেই চাষবাস, ভাগে আবাদ, দুঃখকষ্ট, অনটন, বিধিলিপি, হাটবাজার, ফসল ইত্যাদির আলোচনায় দলটা মগ্ন হয়েছিল এত বেশি যে জমিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তারা তার অস্তিত্বের কথা ভুলে গেছিল। যদিও সে তার কাজ ক'রে যাচ্ছিল নিঃসংশয় হয়ে। কারণ জমিতে পৌঁছেই একটি মাত্র সংকল্পের সূত্রে একসঙ্গে বাঁধা পড়ে তারা যাবতীয় বিষয় নয় শুধু, পরস্পরকেও ভুলে যাচ্ছিল। এ-থেকেই বোঝা যায় তার প্রভাব কত গভীর ছিল ওদের মনে। জমিতে নেমে তারা সৈন্যবাহিনীর মতো এগিয়ে গেল এবং জমিখণ্ডটিকে কয়েকবার পারাপার করল, তাকে কোথাও দেখা গেল না। তারা তীক্ষ্ণ চোখে ছোট ছোট নালাগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছিল। পরিষ্কার জায়গাটা বার বার পরীক্ষা করছিল, তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখা যায় কি না পরখ করার জন্যে। যে-ঝোপঝাড়গুলো এখনো কেটে ফেলা হয় নি সেখানে সে ছায়ার মধ্যে বিশ্রাম করতে পারে ভেবে তারা লতাপাতা সাবধানে ফাঁক ক'রে ঝরা পাতা-

ভর্তি কালো মাটির মেঝেয় উঁকি দিচ্ছিল আর বালকরা তাদের স্বাভাবিক প্রাণ-শক্তির প্রাচুর্যের জন্যে জমির চারপাশের কাটা জঙ্গলগুলোর ওপর লাঠি চালাচ্ছিল যাতে যদি সে লুকিয়ে থাকে তাহলে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে। কথাবার্তা সম্পূর্ণ বন্ধ ক'রে একাগ্র মনে হারানো ধনের মতো তাকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং এইভাবে খুঁজতে গিয়েই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। আলাদা হয়ে গিয়ে কখনো তারা তার ভাবনায় অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল, কখনো তাদের এখানে এই সময়ে উপস্থিত হবার কারণ সম্পর্কে সচেতন হয়ে চমকে উঠছিল। সবাই যখন এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, করমালি তার কোদাল হাতে নিয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দলের বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত হয়ে এলে, কেউ জমির বাইরে গিয়ে ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াতে থাকলে, বালকরা অনুসন্ধান ছেড়ে দিয়ে খেলা শুরু করলে এবং প্রত্যেকে নিজস্ব সত্তায় ডুব মেরে একদম পৃথক হয়ে গেলে শূন্য থেকে স্তম্ভের মতো একটা ঘূর্ণি বাতাস প্রমত্ত গর্জন ক'রে নিচে নেমে এল। তখন তাকে দেখা গেল। পিছনে ছায়া ছায়া অন্ধকার গ্রামের পটভূমিকায় এবং বিশাল বিলকে সামনে ধারণ ক'রে তার আজকের তেজস্বী ছিমছাম স্বর্ণবর্ণের শরীর অপূর্ব ভঙ্গিতে ওদের আহ্বান করছিল। আর তার চোখের দিকে চেয়ে, তার সাবলীল দুলুনিতে পিপাসার্ত সঙ্গীত রসিকের মতো সেইসব যুবক, প্রৌঢ় এবং বালকরা হাতিয়ার হাতে রেখে তার দিকে এগিয়ে আসছিল এবং তাকে ঘিরে ফেলে একান্ত নিবিষ্টমনে লক্ষ করছিল। সেই সময় করমালি দেখছিল পশ্চিম আকাশে দ্রুত একখণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দিচ্ছে বিল তার বুকের ভিতর থেকে। মুহূর্তে কালো মেঘখণ্ডটি সমস্ত আকাশে ছড়িয়ে পড়ল আর যেমন হয়ে থাকে, সজল ছায়া পৃথিবীর উপর নেমে এল। দর্পণের মতো স্থির হয়ে এল সীসে-রঙের অজস্র জল-রাশি আর বদলে গেল সাপটির উজ্জ্বল রঙ। তাকে মাটির মতো কালো মনে হল এবং সে তার হালকা তারুণ্য পরিহার ক'রে বিকট বৃহদাকার হয়ে উঠছিল — বয়সে সময়ের সাথী এবং ওজনে অকল্পনীয়। তারপর করমালি চোখ বন্ধ করল — কারণ তার বিশালতার দিকে, বিপুল ফণা এবং সাদা গোক্ষুরটির দিকে আর তাকানো যাচ্ছিল না। সে চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে শব্দ উঠল — বোঁ-ও-ও-হিস্ এবং পরমুহূর্তেই নিঃশব্দের কালো ভারি যবনিকা পড়ল। চোখ চেয়ে এখন সে দেখল চোদ্দ বছরের ফর্সা মিষ্টি ছেলে সাদেক তার দেহের ভারে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। আহা! তার হাতে শীর্ণ কঞ্চিটা এখনো ধরা! তার সরল পা সিধে মেলা। তার গলার কাছে ক্ষীণ কালো রক্তের ধারা। তাকে ধূলিসাৎ করে সে এখন ফণা

গুটিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে তার দেহের ওপর ক্রুদ্ধ সরল লাঠির আঘাতে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না ক'রে। তার শত্রুর সঙ্গে শেষবারের জন্যে মোকাবিলার জন্যে করমালি অটল প্রতিজ্ঞায় ওর কাছে যায়, দৃঢ় হাতে তার শরীরের মাঝ বরাবর কোপ মারে। মুহূর্তে গতি বাড়িয়ে কিন্তু করমালিকে একেবারে হতাশ না ক'রে, যেন দয়া এবং স্নেহবশত সে তাকে তার লেজের দিক থেকে আট আঙুল পরিমাণ দেহ উপহার দিয়ে যায়।

বিকেলে করমালি একাই গেছিল। রহমালিকে সঙ্গে নিতে সাহস হল না তার। এবং গোটা ব্যাপারটা ঘটে গেল অতি সহজে। লোকটাকে রাজি করাতে করমালি শুধু বলল, 'আমার জমিডা তো দেহিছেন। বিলির ওদিকি এমন জমি আর আছে কন দেহি।'

করমালি তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'জমিডা ব্যাচপো না আমি। ঐটুহ জমিই আছে আমার—বেচলি থাকপে কী? ব্যাচপো না আমি। আপনে শ' তিনেক ট্যাহা দিয়ে রাখে দ্যান জমিডা। ফসলড়াও আপনের। মাঘ মাসে আপনের ট্যাহা দিয়ে দলিল ফেরৎ নিয়ে নেবানে।'

লোকটা সব বুঝে বলল, 'ট্যাহা নিয়ে কী করবি। জমি দিলি আর কি ট্যাহা শুধতি পারবি?'

'ট্যাহা না নিলি আপনের জমি রাখপো কী ক'রে। গরু এ্যাট্টা কিনতি হবে। আপনের জমি আবাদ না করলি তো চলবে না।'

এরপর দু'এক মিনিটের মধ্যে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। করমালি কাজেই খুশিমনে ফিরে আসছিল। সে রাস্তায় নামতেই বৃষ্টি এল। বৃষ্টি নামল ঘন হয়ে এবং ধোঁয়ার মতো। বৃষ্টির মধ্যেই সে রহমালিকে মনে মনে গাল দিচ্ছিল চিৎকার ক'রে, 'হারামজাদা, আমার জমি আমি বেচছি, তোর বাপের কী—আঁ? শ্যাষ জমিডাও গেল? গেল তো গেল! কী করবানে? গরু না কিনলি, ভাগে জমি আবাদ করতি না পারলি কলা চোষবা সারা বছর? হারামজাদা!' তারপর বৃষ্টিতে করমালি আগাগোড়া ভিজে গেল। এত বেশি ভিজে গেল যে মনটাও তার নরম হয়ে এল এবং সে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে, আকাশের গর্জনের মধ্যে, বাতাসের স্বননের মধ্যে বলল, 'বাজান, আমার বাজান, রাগ করিস নি। জমি তো বেচি নি। মাঘ মাসে ট্যাহা কডা দিয়ে তোর জমি এনে দেবানে।' বৃষ্টি খুব বেশি হচ্ছিল বলে করমালির চোখের পানি কিছুতেই দাঁড়াতে পারছিল না, ধুয়ে ধুয়ে যাচ্ছিল। এই সময় বিল চোখে পড়ল। দূরে সে তখন বৃষ্টির মধ্যে টগবগ ক'রে ফুটছিল এবং আকাশ ও

পৃথিবীকে একাকার ক'রে দিয়ে বিরাট অগ্ন্যুদ্গীরণের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে জ্বালাময়, সীসে রঙের ধোঁয়ায় পাহাড় তৈরি করছিল বার বার। করমালি তার বাড়ির বাইরে খড়ের গাদার কাছে নারকেল গাছের নিচে এসে পৌঁছল। রহমালি দেখতে পাচ্ছিল করমালি ভীষণ ভিজে, যেন দু'হাত দিয়ে বৃষ্টি সরাতে সরাতে রাস্তা থেকে উঠে নারকেল গাছটার দিকে এগিয়ে আসছে। সেই সময় হঠাৎ কটকটে সাদা, তীব্র ও ঝাঁকালো আলো ঝলকে উঠল। এবং বেশ একটু পরে পাহাড় বিদীর্ণ হওয়ার মতো হিংস্র আওয়াজ উঠে বিলের দিকে চলে গেল গম গম ক'রে।

করমালি খড়ের গাদার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার কাঁচা-পাকা চুলদাড়ি, ভ্রু, চোখের পাপড়ি ইত্যাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে কদাকার কিম্ভূত দেখাচ্ছে। রহমালি বাইরে এসে তাকে বুকে ক'রে বৃষ্টির মধ্যে সবল পায়ে অশ্রুহীন চোখে ভিতরে নিয়ে পরম যত্নে দাওয়ায় শুইয়ে দিয়েছে।

অ্যালান মার্শাল

গর্দভচন্দ্রের কাহিনী

একদম মামুলি একটা গাধা। যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি উদাস! আধবোজা চোখ, মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে সার্কাসের তাঁবুতে ঢোকার একেবারে মুখটায়। তাঁবুটা পড়েছে বড় সহরের কাছে, এছাড়া তেমন সবুজ মাঠ আশেপাশে আর কোথাও নেই বলেই।

বছরে মোটে একবারই সহরের মানুষ সার্কাস দেখার সুযোগ পায়। দল বেঁধে, কিংবা লাইন দিয়ে চলেছে সবাই। ভিড় ক্রমে ঘন হতে থাকে। সকলেরই লক্ষ সার্কাসের তাঁবু।

বড় হাতগুলো ধরে নিয়ে চলেছে ছোট ছোট হাত, ওদের হাতে আইসক্রীম, চোখেমুখে বিস্ময়। ছোট হওয়াতে ভিড়ের জন্যে ওরা প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সামনেই সার্কাসের রঙচঙে মালগাড়িটার সামনে হাতিগুলো ঢিলেঢালা ভাবে চলাফেরা করছে। বাচ্চারা কিন্তু তাও দেখতে পাচ্ছে না। কেবল বড়রা যখন ওদের উঁচু ক'রে তুলে দেখাচ্ছে তখনই দেখতে পাচ্ছে। আর কেবল তখনই সেই গাধাটাকে স্পষ্ট দেখা যায়, যেন গেটের ধার ঘেঁষে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁবুটা বেশ বড়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ছোটখাটো নানা গলিঘুঁজির ময়লা দেয়ালে লটকে-দেওয়া যেসব ঝকঝকে বিজ্ঞাপন বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাতে বলা হয়েছে, এই তাঁবু নাকি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম—চার হাজার লোকের জায়গা হতে পারে। খুঁটির সঙ্গে জীর্ণ দড়ি দিয়ে বাঁধা গাধাটা দরজায় ঢোকার রাস্তায় এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে যে টিকিট কাটার পর ওটাকে পাশ কাটিয়ে না গিয়ে কোনো দর্শকের পক্ষে হুড়োহুড়ি ক'রে আলোকজ্জ্বল রিং পেছনে ফেলে গ্যালারীতে আসন গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব।

প্রতি শনিবার তিনটে ক'রে শো। অর্থাৎ বারো হাজার মানুষ গর্দভচন্দ্রকে অতিক্রম করে ঐদিন। এই বারো হাজার দর্শকের মধ্যে খুব কম ক'রে তিন হাজার দর্শক পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাধাটাকে একবার আলতো চাপড় মারে আর

নাহলে কেবল ছুঁয়ে যায়। সুতরাং সমস্ত দিনে ন' হাজার হাত গর্দভের পিঠে কোথাও না কোথাও একবার ঢাক পেটায়। গোটা সপ্তাহে সব মিলিয়ে কতবার যে কত চড়চাপড় খায় গুনে ওঠা সহজ নয়।

পিঠে চাপড় মারার নানান রকমফের আছে। কেউ কেউ নিজের বাহাদুরি জাহির করতে মারে। বাকিদের আবার একটা সমঝদারির ঢঙ থাকে। কোনো কোনো চড়চাপড়ের মধ্যে প্রকাশ পায় আত্মসন্তুষ্টির ভাব। কোনোটা আবার নিছক গর্দভপ্রীতির পরিচায়ক। নিজের ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে দেখিয়ে বাপেরাও কখনো বা তারিফ পাওয়ার জন্যে গাধার পিঠে জোর থাপ্পড় কষিয়ে দেন।

দারুণ উৎসাহভরে একটা ছোট্ট ছেলে তার মাকে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। একবার থেমে ভয়ে ভয়ে ছোট হাত বাড়িয়ে গাধার কাঁধে হাত বুলিয়ে নিল। গর্বিত পিতারা বাচ্চাদের হাত ধরে যখন ওপরে তুলে ধরে, তারা তখন নিজেদের মোটাসোটা অথচ ছোট আঙুলগুলো ওর পিঠে ঘষে, মাথা আঁচড়ায়, অথবা কান ধরে টানে।

যেসব বাচ্চারা একা একা এসেছে তাদের আর মা-বাবার 'কোরো না' 'কোরো না' শুনতে হয় না। মুহূর্তের মধ্যেই সাহস সঞ্চয় ক'রে ওরা নির্বিকার গাধাটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় অথবা নাকে নাক ঘষে। সতর্কভাবে ফিরে দেখে কাজটা আবার কেউ দেখল কিনা।

মাঝে মধ্যে আবার বেজায় দয়ালু ব্যক্তিবর্গ চেষ্টা করেন জোর ক'রে যদি গাধাটার ঠোঁটের মধ্যে চীনাবাদাম বা ললিপপ পুরে দেওয়া যায়। তবে কাজটা বেজায় কঠিন, কারণ দাঁতে দাঁত চেপে থাকে গাধাটা। আর কেউ মুখে হাত দিচ্ছে বুঝতে পারলেই গর্দভ বাবাজী দ্রুত মাথা দোলায়।

দশ মিনিট অন্তর আবার এক-একজন গর্দভ স্পেশালিস্টের আবির্ভাব ঘটে!

'আরে গাধা দেখছি!' এমন চেনা ও মোলায়েম গলায় কথাটা বলেন যে যারা পিঠ থাবড়াচ্ছিল তারা হয়তো হাত সরিয়ে সসম্ভ্রমে বক্তার মুখের দিকে তাকায়।

অতঃপর গাধা-বিশেষজ্ঞ মহাশয় জন্তুটার গলা জড়িয়ে তাকে এমন সব নামে ডাকতে আরম্ভ করেন যে সবাই মনে করে: 'হ্যাঁ, ভদ্রলোকের জ্ঞানগম্যি আছে বটে!'

'আরে ইয়ার, তা শেষকালে এখানে এসে জুটলে যে? বেশ হয়েছে, ভারি কাজ নিশ্চয়ই এখন আর করতে হচ্ছে না? আর তাইতো হওয়া উচিত।' তারপর কণ্ঠস্বর বদলে যারা শুনছিল তাদের বোঝায়, 'জানেন মশাই, পশ্চিমের

দেশগুলোতে এদের দিয়ে যা মাল বওয়ানো হয় তার ওজন জন্তুগুলোর নিজের শরীরের ওজনের চেয়েও ঢের বেশি। ভারবাহী জন্তু বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই আর কি!'

এরকম কথাবার্তা শুনে লোকজন সমঝদারের মতো ঘাড় নাড়ে। যাওয়ার আগে শেষবারের মতো সহানুভূতির সাথে পিঠ চাপড়েও দেয়।

মেলাই লোকের ভালোবাসার স্পর্শ গাধাটা এত নির্বিকারচিত্তে সহ্য করে যে দেখে মনে হয় জীবনভরই ও চাপড় খেতে অভ্যস্ত।

আর যদি বা কখনো মনের ভেতর বিদ্রোহ মাথা চাড়া দেয় তাতো আর প্রকাশ করে না। অসহায় নির্লিপ্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। গাধার একটি দিক শ্লথ হয়ে ঝুলে পড়েছে। অনেক হাতের স্পর্শ ওর চুলগুলো অবিন্যস্ত ক'রে দিয়েছে, কিন্তু যে-স্বপ্নে ও মশগুল সে-স্বপ্ন রচনায় কোনো বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি।

সার্কাসের শেষ দিনে গাট্টাগোট্টা একটা লোক গায়ে চাপানো টান টান ঘন নীল রঙের স্যুট পরে বেশ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে মেন গেটের কাছে এসে গাধাটার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে দেখতে থাকে। ঠোঁটে একবার জিভ বুলিয়ে 'উহু' শব্দ ক'রে মাথা নেড়ে সে ঈষৎ পিছিয়ে যায়। আর সেখান থেকে আরো ভাল ক'রে নিরীক্ষণ করে। অনেকক্ষণ চিন্তিতভাবে ঘাড় নাড়তে নাড়তে গাধাটার চারপাশে একটা চক্কর খায়। গর্দভ সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিল সবই যেন সে জেনে ফেলেছে। চলে যাবে বলে পেছন ফিরতেই গাধাটার পিঠে দমাস ক'রে হাত দিয়ে এক চড় কষিয়ে দেয়। আজকের আট হাজারতম থাপ্পড়!

আপাতদৃষ্টিতে গাধাটা ঘুমাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ এই মানুষটার হাতের শক্ত থাপ্পড় খাওয়ার পর ওর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, এতদিন বুঝি ও এই সংকেতেরই অপেক্ষা করছিল। এক ঝাঁকুনিতে নিজের গুরুভার মাথাটা উঁচু ক'রে, ঘুরে, গ্যাক ক'রে খরগোস-ধরা যন্ত্রের মতোই দাঁত খিচিয়ে লোকটার হাতে কামড় লাগায়।

কোটের হাতার ওপর দাঁত পড়েছিল। খাবলা দিয়ে ছিঁড়ে নেওয়া নীল কাপড়ের টুকরোটা গাধাটার মুখ থেকে ঝুলতে থাকে। ঘাড় ফিরিয়ে নিয়ে আবার গাধাটা নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়।

লোকটা দারুণ অবাক হয়ে টলতে টলতে পিছিয়ে অন্য লোকের ঘাড়ে এসে পড়ে। চোখ যেন মার্বেল পাথর, মুখে বিরাট হাঁ। আরেক হাত দিয়ে কাপড় খাওয়া হাতটা চেপে ধরে লোকজনের দিকে তাকায়। ভাবটা হল: 'দেখলেন তো, কী

অদ্ভুত কাণ্ড !' তারপর আতঙ্কভরা গলায় বলে উঠল, 'কামড়ে দিয়েছে !' বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে গাধাটার দিকে তাকায়। বলে, 'অবাধ্য বর্বর জানোয়ার !'

যারা পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটাকে আর গাধাটাকে দেখতে থাকে। মুখে এখনো ঝুলছে নীল কাপড়ের টুকরো। ভদ্রলোকের কথায় সম্মতি জানিয়ে সবাই মেনে নেয় যে সত্যিই জন্তুটা একেবারে ইতর, বর্বর। অযথা মোটসোটা ভদ্রলোকের হাতে কামড় বসালো। কী-ই বা করেছেন ভদ্রলোক ! শুধু একবার পিঠ থাবড়েছিলেন, এই তো ! কী বেইমান, জংলী আর কাকে বলে !

এরপরে পাঁচ মিনিট কেউ আর ওর পিঠ থাবড়ায় নি। দীর্ঘ অনেক বছরের যে-জীবন তাতে এই প্রথম ও শান্তির স্বাদ পায়।

অনুবাদ ॥ অশোক বর্মন

রি চা র্ড রা ই ভ

বেঞ্চি

'এক জটিল সমাজের আমরা অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। এই সমাজে মানুষজনের এক বৃহৎ অংশ বেঁচে থাকার মৌল অধিকার হতে বঞ্চিত। তারা এই সমাজে ঘৃণার পাত্র কারণ তাদের দুর্ভাগ্য তারা কালো চামড়া নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এই সমাজ বহু অনিশ্চিত অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা জীইয়ে রেখে সেই অসংখ্য কালো মানুষদের শোষণ ক'রে বেঁচে আছে!'

কার্লি যথাযোগ্য মন দিয়ে বক্তার কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছিল। তার মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠছিল যে কথাগুলো অসাধারণ এবং অর্থ যাই হোক না কেন এই কথাগুলো এক পরম সত্যকে নির্দিষ্ট করছে। বক্তা এক মুহূর্তের জন্য থেমেছিলেন জল খাবার জন্য। কার্লি ঘামছিল। জনসমাবেশের ঠিক মাথার উপর অক্টোবরের নির্মম প্রখর সূর্য। জ্বলন্ত আকাশে এক টুকরো মেঘেরও দেখা নেই, নেই আশেপাশে ছড়ানো গাছপালার সামান্য ছায়ায় আশ্রয়ের কোনো প্রতিশ্রুতি। কার্লির জামার কলারে-রাখা রুমাল ঘামে ভিজে জবজবে। চারদিকে তাকাচ্ছিল সে। অসংখ্য মুখের মিছিল—কালো, তামাটে, দু'একটা সাদা মুখ। কিছু লাল পাগড়ীওলা মালয়ীও চোখে পড়ছে। অদূরেই একটা গাড়ির একপাশে দু'জন গোয়েন্দা বক্তৃতার নোট নিচ্ছিল। মঞ্চের উপর বক্তা আবার বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলেন।

'যে-আইন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানুষকে ক্রীতদাসত্বে ঠেলে দেয়, সে-আইনকে মোকাবিলা করার দায়িত্ব আমাদের। বর্ণকে ভিত্তি ক'রে যারা মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে, তাদের মোকাবিলা আমাদেরই করতে হবে। আপনাদের সন্তানেরা মানুষের জন্মগত অধিকার হতে বঞ্চিত। সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষাগত অধিকার—সকল স্তরেই তারা আজ অপাংক্তেয়।'

কার্লি বুকের ভিতর উত্তেজনা অনুভব করছিল। আগে কখনো এমন চাঞ্চল্য সে অনুভব করে নি। মঞ্চের উপর ঐ বক্তা এক নতুন দর্শন প্রচার করছিলেন—

তারো কিছু ন্যায্য অধিকার আছে, তার সন্তানদেরও কিছু ন্যায্য অধিকার আছে। কিসের অধিকার? শ্বেতাঙ্গদের মতো বেঁচে থাকার অধিকার? অথবা বুড়ো লাটেগানের মতো বেঁচে থাকার অধিকার? এই নতুন চিন্তা কার্লির মনে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল—যে-চিন্তা করার সাহস আগে তার কখনো হয় নি। এক অদ্ভুত উন্মাদনা কার্লির সারা মন আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। সে সহরের বাবুদের মতো যেকোনো রেস্তর াঁয় বসতে পারবে! নেলীকে সাথে নিয়ে যেকোনো সিনেমাহলে ঢুকতে পারবে। তার সন্তানেরা ইউনিফর্ম পরে স্কুলে যাবে! এক নতুন পৃথিবীর কল্পনায় সে কিছুটা ভীত হলেও, আকৃষ্টই হয়েছিল বেশি। এসব শুনলে উ ক্লাস কী মন্তব্য করত? উ ক্লাস বিশ্বাস করে ভগবান শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের আলাদাভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এবং কৃষ্ণাঙ্গরা জন্মেছে শ্বেতাঙ্গদের সেবা করার জন্য। কাকার এসব কথার সাথে কোনো মিল না থাকলেও এই নতুন ভাবনা কার্লির মনে এক নতুন অনুভূতির সঞ্চার করেছিল।

কপাল কুঁচকে কালি ভাবছিল। মঞ্চে অনেক বক্তা উপস্থিত—শেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ তুই-ই। তাদের পরস্পরের স্বাভাবিক ব্যবহারে মনে হচ্ছিল না যে সাদা-কালোর কোনো পার্থক্য আছে। নীল পোশাক পরিহিতা এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্র-মহিলা এনএক্সলিকে সিগারেট দিল। এনএক্সলি কার্লির পরিচিত—সে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক। কার্লির ধূমপান করতে ইচ্ছা করছিল। পকেট থেকে চেপ্টে-যাওয়া সিগারেট বার করল সে। এনএক্সলি যদি বুড়ো লাটেগানের মেয়েকে সিগারেট দেয়, তাহলে বুড়ো নিশ্চয়ই মূর্ছা যাবে। কার্লি কল্পনা করল উ ক্লাস বুড়োর মেয়ে অ্যান লাটেগানকে সিগারেট দিচ্ছে। এ-কল্পনা তার কাছে এত হাস্যকর মনে হয়েছিল যে সে জোরে হেসে উঠেছিল। তু-একজন লোক তার দিকে ফিরে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালো। একটু অপ্রস্তুত হয়ে সিগারেট ধরিয়েছিল সে, কিন্তু এ-কল্পনা তার মন হতে মুছে যায় নি। কিন্তু অ্যানের তো এত সুন্দর পোশাক নেই। মঞ্চের উপরে বসা ভদ্রমহিলাকে নীল পোশাকে সুন্দর মানিয়েছে! যাই হোক, বক্তার কথাগুলো যদি সত্য হয় তাহলে কার্লিও সবার মতো মানুষ। অস্ফুটস্বরে সে উচ্চারণ করল: 'এমন কি একজন শেতাঙ্গের মতো।' কিন্তু তাড়াতাড়ি সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। কিন্তু বক্তা এ-কথাটাই জোর দিয়ে বলছিলেন, সে কেন এ-চিন্তাকে বর্জন করবে? চোখের সামনে ভেসে উঠল মানবতা-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কিছু লোকের ছবি, যা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। উ ক্লাসকে এ-ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু সে কোনো আমলই দেয় নি।

কারাবরণ করার সময়ও লোকগুলো হাসছিল। কার্লির মনে হয়েছিল ব্যাপারগুলো অদ্ভুত আর রহস্যময়।

কার্লি মন দিয়ে বক্তার কথাগুলো শুনছিল। বক্তা খুব সতর্ক হয়ে মেপে মেপে কথা বলছিল। কার্লির মনে হল এই বক্তা বুড়ো লাটেগান, এমন কি ডোমিনির থেকেও মহৎ—যদিও ডোমিনি একজন শ্বেতাঙ্গ।

এবার শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা বক্তব্য শুরু করল। সুন্দর নীল পোশাক তার, আরো সুন্দর তার জামার সাদা হাতা! সে বলল, যে-আইন মানুষকে সমান চোখে দেখে না, আমাদের উচিত সে-আইনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা। সে আরো বলেছিল 'আপনারা ট্রেনের যেকোনো সিটে বসবেন, যেকোনো রেস্তরাঁয় ঢুকবেন।' শ্বেতাঙ্গ গোয়েন্দা দু'জন তখনো নোট লিখে যাচ্ছিল। ভদ্রমহিলা এরকম চিন্তা কেন করবে? সে তো সব থেকে ভাল ছবি দেখতে যেতে পারত, কিংবা সমুদ্র-সৈকতে স্নান ক'রে সময় কাটাতে পারত, অথবা কোনো চমৎকার বাড়িতে বসে বিশ্রাম করতে পারত। অ্যানের থেকেও ভদ্রমহিলা অনেক সুন্দরী, তার সুন্দর চুল রৌদ্রকিরণে ঝলমল করছে। মুলুক ছাড়ার আগে কার্লিকে সকলে সাবধান ক'রে দিয়েছিল যে কেপটাউনের রীতিনীতিই আলাদা। ছয় নম্বর জেলায় কিছুদিন কাটিয়েছিল সে, একেবারে প্রথমদিকে দারুণ ভয় পেলেও, পরে আর সে ওই শ্বেতাঙ্গ বদমাশগুলোকে ভয় পেত না। হ্যানোভার স্ট্রীটের অদূরেই থাকত কার্লি। ওরা যতটা খারাপ বলেছিল, অবস্থা ততটা খারাপ নয়। কিন্তু এ-ব্যাপারটা অভাবনীয়। উ ক্লাসও এ-ব্যাপারে হুঁশিয়ার ক'রে দেয় নি। আজকের জনসভায় বক্তাদের কথাগুলো তার কাছে একেবারে নতুন, এসব নিশ্চয়ই সবাইকেই ভাবাবে। মহিলাটি আহ্বান জানাচ্ছে প্রত্যেকেরই 'মোকাবিলা' করা উচিত। কার্লিরও 'মোকাবিলা' করা উচিত। ক্রমশ একটা সংকল্প কার্লির মনে দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। এই সংকল্প এত দৃঢ় যে প্রথমে সে হাস্যকর বলে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু বক্তৃতা শুনতে শুনতে সে মনস্থির ক'রে ফেলেছিল। ঠিক আছে, কার্লি প্রতিবাদ জানাবে, প্রতিরোধ করবে। সে বুড়ো লাটেগান, উ ক্লাস, অ্যান, নেলী—সবাইকে স্তম্ভিত ক'রে দেবে। কার্লি স্থির করেছিল, সে প্রতিবাদ জানাবেই। এমন কি সেজন্য যদি জেলে যেতে হয় তবুও পরোয়া করবে না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছবির লোকগুলোর মতো সেও হাসতে হাসতে জেলে যাবে!

অবশেষে জনসভা শেষ হয়েছে। ভীড়ের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে সে হাঁটছিল। বক্তাদের কথাগুলো তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছিল। কথাগুলো অদ্ভুত কিন্তু

অর্থবহ। নিজের মুলুকে এরকম কথা কখনোই শোনা যায় নি। হঠাৎ একটা গাড়ীর ব্রেক কষার তীব্র কর্কশ শব্দ! কালি থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়েছিল একজন রাগী শ্বেতাঙ্গ।

'ঠিকমতো রাস্তা দেখে হাঁট···কালো বেজন্মার বাচ্চা!'

কালি হতভম্বের মতো তাকিয়েছিল। তার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। এ-লোকটা নিশ্চয়ই কখনো দেখে নি যে শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা কৃষ্ণাঙ্গ এনএক্মলিকে সিগারেট দিচ্ছে। নীল পোশাকী ভদ্রমহিলা কখনোই কালিকে এভাবে চেঁচিয়ে গালাগালি দিত না। ব্যাপারগুলো সব ধাঁধার মতো! এখন বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরে এসব ভাবাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পরিবর্তিত মানসিকতার দৃষ্টি দিয়ে ষ্টেশন পর্যবেক্ষণ করেছিল কালি। ষ্টেশনে অনেক লোক ট্রেনের অপেক্ষায়—অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গ, কিছু কৃষ্ণাঙ্গ, আর অল্প কয়েকজন তার মতো তামাটে। সকলেই এখানে পরস্পরের সাথে মিশছে, কিন্তু প্রত্যেকের দৃষ্টিতে এক অস্বাভাবিক ত্রস্ত ভাব। একে অপরকে ঘৃণা করছে। প্রত্যেকের পথ সংকীর্ণ সন্ত্রস্ত ছকে বাঁধা। এসবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাবার আহ্বান করেছিল বক্তাটি···যে যার শক্তি অনুযায়ী। কিন্তু কীভাবে? কীভাবে একজন প্রতিবাদ জানাবে?

হঠাৎ সবকিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তার সামনেই একটা সুযোগ। ঐ বেঞ্চিটা। রেল কোম্পানীর ঐ বেঞ্চির উপরে সাদা হরফে লেখা রয়েছে এক কিংবদন্তী—'ইউরোপীয়দের জন্য।'

এক মুহূর্তের জন্য ঐ লেখাটি দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্দশাগ্রস্থ বর্ণবিভক্ত সমাজের যন্ত্রণার প্রতীকী রূপ পরিগ্রহ করেছিল। মানুষ হিসাবে তার ন্যায্য দাবির অধিকার জানাবার সুযোগ পেয়েছিল কালি। একেবারে তার সামনেই। একটা কাঠের সাধারণ বেঞ্চি; সারা দক্ষিণ আফ্রিকার সব জায়গাতেই এরকম হাজার হাজার বেঞ্চি দেখা যায়। এই বেঞ্চিই প্রতিফলিত করছিল দুর্বোধ্য এক সমাজব্যবস্থার সমস্ত অন্যায়। মানুষ হিসাবে তার পরিচয়ের পক্ষে এই বেঞ্চি একটা বিরাট বাধা। যদি এই বেঞ্চিতে কালি বসতে পারে তবেই সে মানুষ। যদি বসতে ভয় পায় তাহলে মানবসমাজে ও স্বীকৃত হতে চায় না। কালির মনে হয়েছিল যদি এই বেঞ্চির উপর বসা যায় তাহলে প্রচলিত অন্যায় ব্যবস্থাকে চুরমার করতে ও সক্ষম হবে। এই-ই সুযোগ। কালি প্রতিবাদ জানাবেই।

বেঞ্চির উপর কালি শান্তভাবে বসে থাকলেও ওর বুকের ভিতর কে যেন

হাতুড়ি পিটছিল। দুই বিপরীতধর্মী চিন্তার টানাপোড়েন চলছিল ওর মনের ভিতর। একজন বলছিল : 'এই বেঞ্চিতে বসার কোনো অধিকার তোমার নেই।' অন্যজনের প্রশ্ন : 'কেন তোমার এই বেঞ্চিতে বসার অধিকার নেই?' প্রথম কণ্ঠস্বর অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাচ্ছিল—তার ফেলে-আসা গ্রাম্যজীবনের কথা, তার বাবার ন্যুব্জ শরীরের কথা, তার ঠাকুর্দার কথা—যারা ভেড়ার মতো ক্রীতদাস জীবন কাটিয়ে গেছিল। দ্বিতীয় কণ্ঠস্বরে ছিল প্রতিশ্রুতি, ছিল ভবিষ্যৎ। আবার তার মনের ভিতর প্রতিশ্রুতি অনুরণিত হল : 'কার্লি, তুমি একজন মানুষ। তোমার বাবা যা করতে সাহস পায় নি, তুমি তা করেছ। একজন মানুষের মতোই তুমি মৃত্যুবরণ করবে।'

কার্লি এবার সিগারেট ধরালো। মনে হল না কেউ ওকে লক্ষ করছে। অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! জীবন এগিয়ে চলেছে নিজস্ব গতিতে। মানুষের দৈনন্দিন কর্মপ্রবাহ, জীবন বা মৃত্যু—কোনোকিছুরই ব্যাঘাত ঘটে নি। কোনো কণ্ঠ ঘোষণা করে নি : 'কার্লি বিজয়ী!' আর বাকি দশজনের মতোই সে সাধারণ—জনবহুল একটি ষ্টেশনে সিগারেট খেতে ব্যস্ত। এটাই কি তার বিজয়ের প্রকাশ? কার্লি কি প্রমাণ করতে পেরেছে যে সে-ও একজন মানুষ?

একজন সুন্দর পোশাক পরিহিতা শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উনি কি এই বেঞ্চিতে বসতে চেয়েছিলেন? কার্লির মনের ভিতর আবার কে বলে উঠল : 'তোমার উঠে দাঁড়ানো উচিত যাতে এই শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলাকে তোমার পাশে বসতে না হয়।' কার্লি ভুরু কোঁচকালো, তারপর আরো জোরে সিগারেট টানতে লাগল। শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা কার্লিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রেই এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কি তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ভয় পেয়েছিলেন? নাকি ব্যাপারটা তিনি লক্ষই করেন নি?

কার্লি হঠাৎ খুব পরিশ্রান্ত বোধ করল। তৃতীয় এক সত্তার উপস্থিতি উপলব্ধি করল সে, যে বলছে : 'তুমি তো প্রতিবাদ জানাতে বেঞ্চিতে বসো নি। বসে আছ, কারণ তুমি পরিশ্রান্ত।' সে কি পরিশ্রান্ত বলেই বেঞ্চি হতে উঠছে না, অথবা প্রতিবাদ জানাতেই বেঞ্চিতে বসে আছে?

প্ল্যাটফর্মে ট্রেন এসে থেমেছে। লোকজন ট্রেন হতে নামছে আর উঠছে। ভিড়ের মধ্যে কেউ কার্লিকে লক্ষ করছিল না। কার্লি এই ট্রেন ধরেই বাড়ি ফিরতে পারে। এই ট্রেনে উঠে বাড়ি ফিরে যাওয়াটাই এই মুহূর্তে পৃথিবীর সহজতম কাজ। প্রতিরোধের আহ্বান, বসতে-নিষেধ বেঞ্চি, চড়া রোদে সভা—এসব হতে

অনেক দূরে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু তার অর্থ আত্মসমর্পণ, পরাজিত হওয়া, স্বীকার ক'রে নেওয়া যে সে মনুষ্যতর জীব। আবার সিগারেট ধরালো কার্লি। নানা চিন্তা মাথায় ভিড় করেছে। তার মনে পড়ছে উ ক্লাসের কথা—যার সাথে মুলুক ছেড়ে সহরে পাড়ি দেওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছিল। মনে পড়ছে ঝলমলে কেপটাউন সহর আর সেখানকার বাদামী সুন্দরীদের! জীবনসংগ্রামে অভিজ্ঞ বয়োবৃদ্ধ উ ক্লাসের রহস্যময় চোখ আর পাইপ টানা—ও সত্যিই চালাক, তাই এতদিন বেঁচে আছে। ওর মতে দেশবিদেশ ঘুরে জ্ঞানলাভই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কেপটাউন সহরেও গেছিল ও। ছয় নম্বর জেলায় বাদামী মালয়ী মেয়েদের কথা বলার সময় ঘৃণায় থুতু ছিটাতো। উ ক্লাসের মতে ভগবান শ্বেতাঙ্গ আর কৃষ্ণাঙ্গদের আলাদাভাবেই সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের সকলের তা মেনে চলা উচিত।

'জায়গাটা ছেড়ে দে!'

একটা রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল। কার্লি কিন্তু খেয়ালই করল না। তার মন এখন উ ক্লাসের কথা ভাবছে। উ ক্লাস এখন মুলুকে আছে—বোধহয় ওর জন্য বরাদ্দ সস্তা মদের অপেক্ষা করছে।

'এই বেজন্মা···বেঞ্চি হতে উঠতে বলছি না!'

কার্লির পিঠে যেন বাস্তবের চাবুকের নির্মম কষাঘাত। ওর সম্বিত ফিরে এল। অভ্যাসবশতই উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে আপন সত্তার পরিচয় পেল এবং মনে পড়ল কেন সে এই বেঞ্চিতে বসে রয়েছে। ভীষণ পরিশ্রান্ত বোধ করল। ধীরে ধীরে চোখ তুলল। তার সামনে একটি রাগী লাল মুখ।

'উঠে দাঁড়া'—আদেশটি যেন কার্লির পিঠে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল। কার্লি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, মুখে কথা নেই।

'ব্যাটা, কালো বেজন্মা···কথা কানে যাচ্ছে না?'

ইচ্ছা ক'রেই খুব ধীরে ধীরে কার্লি সিগারেটে টান দিল। সামনে তার অগ্নি-পরীক্ষা। দু'জন মুষ্টিযোদ্ধা যেমন প্রতিযোগিতা শুরু করার সময় প্রথম আঘাত হানতে ভয় পেয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে, তেমনিই তারা তাকিয়ে রইল।

'দাঁড়া, তবে পুলিশ ডাকি।'

কার্লি তবুও তার দুর্দমনীয় জেদী ভাব বজায় রাখল। কথা বললেই যেন আব-হাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে, অর্থাৎ সে যে-সুবিধা আদায় করেছে তার পরিসমাপ্তি ঘটবে।

'দাঁড়া, পুলিশ ডাকি। শ্বেতাঙ্গরা কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ খুলিস না কেন?'

কার্লি মুহূর্তের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গটির দুর্বলতা আঁচ করতে পারল। শ্বেতাঙ্গটি কিছু একটা করতে ভয় পাচ্ছিল। এই বেঞ্চিতে বসার লড়াইয়ের প্রথম ভাগেই সে বিজয়ী হয়েছে। চারদিকে ভিড় জমে উঠেছে। বুড়ো আঙুল উঁচু করে উপহাসের ভঙ্গিতে একজন চিৎকার ক'রে উঠল, 'আ-ফ্রি-কা!' কার্লি ভ্রূক্ষেপও করল না। চারদিকে কৌতূহলীর ভিড় ক্রমাগত বাড়ছে। সকলের দৃষ্টি একদিকেই নিবদ্ধ—একজন কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে বসে আছে। কার্লি নিঃশব্দে সিগারেট খেয়ে চলেছে। চারদিকে নানা মন্তব্যের লক্ষ্য সে।

'কালো বাঁদরটাকে দেখো! বেশি প্রশ্রয় দিলে ওরা মাথায় চড়ে বসে!'

'ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। কালোদের জন্য তো আলাদা বেঞ্চি আছে!'

'পুলিশ আসলেই বাছাধন টেরটি পাবে।'

'ভগবান তোমার স্বপক্ষেই থাকবেন। তুমি উঠো না। অন্য যে কোনো লোকের মতোই তোমারো এখানে বসার অধিকার আছে।'

'ব্যাপারটা আমিও বুঝতে পারি না কেন এই কালো লোকগুলো যেখানে খুশি বসতে পারবে না।'

'এই শয়তানগুলোকে একেবারে বিশ্বাস করা যায় না। আমার একটা কালো চাকর ছিল সেটা এত বদমাশ আর ছোটলোক ছিল যে…'

কার্লি কিন্তু বসেই আছে। কোনো কথাই ওর কানে যাচ্ছে না। টানাপোড়েন আর নেই…তার বদলে দৃঢ় সংকল্প। কোনো অবস্থাতেই সে উঠে দাঁড়াবে না। ওরা যা খুশি করুক।

'এই সেই বদমাশটা! উঠে দাঁড়া! লেখা পড়তে পারিস না?'

একজন পুলিশ সামনে চড়াও হয়েছে। কার্লি তার পিতলের ঝকঝকে বোতাম আর কাঁধের বলিরেখা দেখতে পেল।

'তোর নাম কী আর থাকিসই বা কোথায়? বল, শীগগির বল!'

কার্লি তার জেদী ভাব বজায় রেখেছে। তার এই ঔদ্ধত্যে পুলিশটা বিভ্রান্ত আর অবাক হয়ে গেল। ভিড় ক্রমাগত বেড়েই চলেছে।

'এভাবে কারোর সাথে কথা বলা আপনার উচিত নয়।'

সেই নীল পোশাকী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রমহিলা!

'নিজের চরকায় তেল দিন। দরকার পড়লে আপনার সাহায্য নেব। আপনাদের মতো কিছু লোকের জন্যই এই কালো বদমাশগুলো প্রশ্রয় পেয়েছে। এমন কি এরা শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের বিয়ে করতে চায়!…এই ওঠ!'

'আবার বলছি, ওর সাথে ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

পুলিশটি রাগে লাল হয়ে উঠল। মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছে না তার।

'নিজে থেকে না উঠলে ওকে লাথি মেরে ওঠানোর ব্যবস্থা করুন।' এই বলে চিৎকার ক'রে একজন শ্বেতাঙ্গ যুবক কার্লির জামার কলার চেপে ধরল। 'কালো বেজন্মা, ওঠ!'

কার্লি বাধা দেবার চেষ্টা করল। বেঞ্চি…বেঞ্চিটাকে আকড়ে ধরার চেষ্টা করল। অনেক লোক তার উপর চড়াও হয়েছে। এবার সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুষি চালাতে লাগল। হঠাৎ চোখে একটা ঘুষি লাগায় কার্লি তীব্র ব্যথা অনুভব করল। জায়গাটা ফুলে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তবুও কার্লি লড়াই থামালো না। পুলিশটি কার্লিকে হাতকড়া পরিয়ে ভিড়ের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চারদিক থেকে অজস্র ঘুষি এসে পড়ছে তার উপর। হঠাৎ সে স্থির হয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। আর লড়াই করার চেষ্টা বৃথা। এখন তার হাসবার পালা। সে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তার ধারণা সে বিজয়ী। ফলাফল নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামায়!

ভিড়ের মধ্য দিয়ে পুলিশ কার্লিকে নিয়ে যাচ্ছে। 'চল বেজন্মার বাচ্চা…এবার থানায় চল।'

'নিশ্চয়ই!'—এই প্রথম কার্লি মুখ খুলল। সোজাসুজি তাকালো পুলিশের দিকে। শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে সাহস ক'রে বসতে পারে এমন একজন মানুষের ঔদ্ধত্য ওর চোখে জ্বলজ্বল করছে।

অনুবাদ ॥ শংকর ভট্টাচার্য

চেং ওয়ান-লঙ

বসন্তের স্রোতে আজ এসেছে জোয়ার

উত্তরে বিস্তার শৈলশ্রেণী। পিছনে গ্রাম। গ্রামের নাম কেং। রক্ষণাবেক্ষণে প্রহরীর মতো পাহাড়ের পিঠ। পিঠের উপর উড়ছে রক্তপতাকা, বাতাসে চঞ্চল। উজ্জ্বল পরিষ্কার লেখা—কাপড়ের নিশানে। শুধু যে পড়া যায় তা নয়—প্রায় যেন পরিষ্কার শোনা যায় এমন লেখা কাপড়ের নিশানে—'লড়াই আকাশের সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, পাথুরে মাটির সঙ্গে। তা-চাই-এর আদর্শ সমবায়ের কাছ থেকে শিখেই তো আমাদের দাবি - বিপ্লবের জন্য ঐ পাথুরে পাহাড়ের কাছ থেকে শস্য আমাদের পেতেই হবে!' পাথুরে পাহাড়কে শস্যক্ষেত্রে বদলে ফেলতেই হবে—এই পালটি-বদলের লড়াই, এই বদলে ফেলার অভিযান শুরু হয়ে গেছে। চারদিকে লোক—সামনে পিছনে ছোটাছুটি করছে; কোথাও বা ইস্পাতদণ্ড সটান চালিয়ে দিচ্ছে শিলাখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে; কোথাও বা খনিত্র ঘোরাচ্ছে মাথার উপর, নামিয়ে সোজা বিঁধিয়ে দেবে পাথুরে পাহাড়ের গায়ে; কোথাও বা ভরতি-ঝুড়ির আর ভরতি-কুন্ডার ভারে কেমন যেন নাচতে নাচতে অগ্রসর হচ্ছে। সারা পাহাড়ে যেন আগুন লেগেছে—আগুন আর আগুন। ঠিক যেন আগুনের গর্জন। সমস্ত উপত্যকায় ছড়িয়ে যায় মজুরদের গান আর হাতুড়ির আওয়াজ।

সবাই ডাকে কেং খুড়ী। বয়সে প্রবীণা, হাতে খাবারের ঝুড়ি নিয়ে এগিয়ে চলেছেন শৈলশ্রেণীর দিকে সোজা, দৃষ্টি-আঁধার-করা তুষার ঝড়ের মধ্য দিয়ে। প্রতি পদক্ষেপে উঁচু-হয়ে-ওঠা হালকা নরম সাদা স্তূপে গভীর গর্ত হয়ে যাচ্ছে। চোখের উপর হাতের আড়াল দিয়ে সামনের দিকে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছেন—ঐ যে ঐ দিকে—যেখানে এখন কাজ হচ্ছে প্রচণ্ড ব্যস্ততায়—কর্মচাঞ্চল্যে কর্মক্ষেত্র যেখানে বাষ্পের উত্তাপে উত্তপ্ত। মনে মনে ভাবছেন যে তা-চাই-এর আদর্শ সমবায় যেদিন থেকে আমাদের শেখাতে আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এর মধ্যে এখানে কত তাড়াতাড়ি কত কিছুই না বদলে গেছে। কোণ থেকে কোণ, আনাচকানাচ, যেখানে জায়গা সেখানে বুনেছি। এ-বছর এই পাহাড়ের

পর পাহাড়কে আমরা তা-চাই-খেতে ফিরিয়ে ফেলব। এইসব পাহাড়ের গা থেকে জিতে নেওয়া শস্য—আমাদের কেং গাঁয়ের ফলনের অঙ্ক খুব শীগগির এবার পীত নদী পার হওয়ার কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে যাবে। আমাদের পার্টি-সম্পাদক—অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। তিনি বলেছেন এবার আমাদের খেত—ওই যে পাহাড়ের চূড়োয় হাপর গাঁ—ওর তলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। তখন এই পুরো পাহাড়ের পর পাহাড় শুধু খেত আর খেত, শুধু গাছ আর গাছ, এইসব পাহাড়ের সবটাই তখন লুকিয়ে থাকা গুপ্তধনের আবিষ্কার।

তাকে তাকে খাঁজে খাঁজে পাহাড় ওপরে উঠে গেছে—অনেক কষ্টে ওপরের তাকে উঠলেন। কাজ করবার জন্য একটা ঝুপড়ি—ঐ ঝুপড়িতে তিনি যাবেন। ঝুপড়িটা বড় নয়, লম্বায় দশ ফুটের আর চওড়ায় পাঁচ ফুটের বেশি তো নয়ই। নাম-ফলকে চারটি কথা—'হৃদয় রাঙানো আগুন জ্বলছে'। কথা চারটে বড় নয়, ছোটই, কিন্তু মনে ছাপ রেখে যায়।

বয়সে প্রবীণা আমাদের ঐ কেং খুড়ী দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। একজন নেহাইয়ে লোহা পেটাচ্ছে। এক হাতে ধরা সাঁড়াশি আর অন্য হাতে হাতুড়ির দোলা—ঘুরন্ত হাতুড়ি সশব্দে পড়ছে। কাঁচায়-পাকায় মিশানো দাড়িতে ছাইরঙের রঙ ধরেছে, কয়লার কালি-মাখা মুখ থেকে টপ্ টপ্ ঘাম ঝরছে। কিন্তু দীর্ঘ দেহ বলবান সেইজন।

'হায় রে বুড়ো, তোমার দেখছি আর কোনো আশাই নেই। বলি—খেতে-দেতে হবে না একেবারে না খেয়ে থাকলেই চলবে?' —খাবারের ঝুড়ি নামাতে নামাতে চিৎকার ক'রে উঠলেন খুড়ী খুড়োর দিকে। বুড়ো কেং খুড়ো চোখ তুলে দেখলেন না পর্যন্ত—নেহাইয়ের ওপর ধরা ইস্পাতের ডাণ্ডাটাকে ঠুকে যেতে লাগলেন। দেখে মনে হল ঐ ডাণ্ডাটাকে পেটার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উনি আর থামছেন না। অতীতে জমা মাটির তাল ভাঙতে আর পাহাড়ের গা চেঁচে সমান করতে তাঁর পেটা-ডাণ্ডাই যথেষ্ট ছিল। কেং গাঁয়ের লোকেরা এখন চূড়োর কাছের উলঙ্গ পাথুরে পাহাড়গুলোকে আক্রমণ করেছে। এই আক্রমণের প্রথম যে-উত্তাল তরঙ্গ—সেই তরঙ্গে ব্যবহারের জন্য বুড়ো কেং খুড়ো যে শ'-খানেক পেটা-ডাণ্ডা প্রস্তুত রেখেছিলেন সেগুলো সমস্তই তাড়াতাড়ি মেরামত ক'রে দিতে হবে। আক্রমণের প্রথম চোটেই কিছু ভেঙে গেছে, কিছু ফেটে গেছে, কিছু বা দু'-বাঁকে বেঁকে গেছে—নিরেট কঠিন পাথরে ওগুলো আর দাঁত বসাতে পারছে না। আশা-হত উত্তেজনায় দুর্নিবার হওয়া ছাড়া কেং খুড়োর আর কী-ই বা করবার আছে?

ঘরেতে একটাই সরু তক্তা। ঐ তক্তার ওপর খাবার সাজিয়ে দিতে দিতে খুড়ী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'নাও নাও, তাড়াতাড়ি করো। আগে খেয়ে নাও, তবেই না আবার কিছুটা কাজ করতে পারবে।'

'দেখো, দেখো, মানুষটার রকম দেখো! বলি, আমার কোনো কথাটাই বুঝি শোনার মতো নয়!' কিন্তু খুড়ো তো থামছে না। তাই খুড়ী এগিয়ে এলেন খুড়োর হাত চেপে ধরতে। 'আচ্ছা বলোতো, এই ডাণ্ডাটাকে আর দু-চারবার পিটোলেই কি তুমি ঐ পাথুরে পাহাড়ের গা চেঁচে সমান ক'রে দিতে পারবে?'

'দেখো, ঐ হাপর গাঁয়ের লোকেদের দেখো। ওরাও তো ঐ তা-চাই-এর কাছ থেকেই শিখছে। ওরা কিন্তু ওদের খেত একেবারে পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত উচিয়ে নিয়ে গেছে,' কেং খুড়ো বললেন। আর যেই না বলা, কপালও কোঁচকালো, ফুটে উঠল ক্রোধের ভ্রূকুটি। 'আমরা কিন্তু মাথা থেকে এখনো অনেক দূরে। শুয়ে-বসে কাজ করলে কি আমাদের চলে? আগে শুধু নরম নরম জায়গায় ঘা দেওয়ার দরকার হচ্ছিল—শুধু নরম ময়লা মাটি। এখন তো উঁচু পাহাড়ের পিঠে—ঐ যাকে বলে 'বাঘের মাথা'—ঐ বাঘের মাথায় ঘা মারছি। এখন আর এসব ডাণ্ডায় একেবারে চলবে না। পিটিয়ে ঠিকমতো ডাণ্ডা যদি না তৈরি করতে পারি, তাহলে ঐ যে শ'দুই লোক আশাভরসার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐ উঁচু পাহাড়ের পিঠে দুর্নিবার গতিতে কাজ করছে—ঐ যে ওরা—ওদের তাহলে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিচে নেমে আসতে হবে, ঘুমিয়ে সময় কাটাতে হবে। মাথায় ঢুকছে কিছু? দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় আমার খালি মরতে বাকি আছে।'

খুড়ী নীরবে খুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ভাবলেন, কী করলে ওকে একটু সাহায্য করা যায়। কিন্তু ভেবে কিছুই পেলেন না—তার করার কিছুই নেই।

খুড়ো হঠাৎ হাতুড়ি থামিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও ভাল কথা, কালো লোহারকে দেখেছ?'

'না, দেখি নি···মানে কি জানো? জানোয়ারের মধ্যে খচ্চর গোঁয়ার, আর মানুষের মধ্যে তুমি, একই যাঁতাকল, ঘুরিয়ে যাচ্ছো তো যাচ্ছোই। তুমি তো কালু খুড়োকে এখানে আসতে বলতে পারো। তাকে জিজ্ঞেসাবাদ ক'রে একটা কিছু বারও ক'রে নিতে পারো—পারো না?'

'আসতে বলি নি কে বলল? তিন-তিনবার বলেছি। তিনবারের একবারেও সে আসতে পারল না। ঐ যে কথায় বলে—বার বার তিনবার—তাতে হল ভাগ

—নইলে আর নয়।' কথা বলতে বলতে খুড়ো উত্তেজিত হয়ে উঠছেন—উত্তেজনায় মুখ নড়ছে, দাড়ি নড়ছে, যেন বাতাসে বাঁশপাতা নড়ছে।

'দেখো খুড়ো, খেপো না। অত গোঁয়ার হওয়াটাও কোনো কাজের কথা নয়। হাপর গাঁয়ের লোকেরা নিশ্চয় খেতের কাজে খুব ব্যস্ত, আর লোহার খুড়ো ঐ জন্যেই সময় ক'রে আসতে পারে নি,' সুস্থির ছন্দে হাপর টানতে টানতে খুড়ী বলে ওঠেন।

'ব্যস্ত? ব্যস্ত নয় কোন জায়গার লোকেরা? প্রত্যেকটি জায়গায় দেখো লোকেরা কুয়ো খুঁড়ছে, পাহাড় সমান করছে, খাল কাটছে, জল ধরে রাখার জন্যে বড় বড় চৌবাচ্চা বানাচ্ছে। ব্যস্ত নয় কে? যতই ব্যস্ত হোক না কেন—আসা কিন্তু তার···ও হয়েছে হয়েছে ···ঐ যে···সেই যে আলাদা জাতের দু'থলি ধান-বীজ—ঐ ব্যাপারটাতে ও নিশ্চয় মনে মনে অখুশি।' পাথরে তৈরি বসার জায়গা-টার ওপর নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলেন খুড়ো।

'ওরকম বে-আন্দাজী আন্দাজ একেবারে কোরো না। কালো লোহার শুধু শ্রমিক নয়, একেবারে আদর্শ শ্রমিক। লোকের ভাল ছাড়া তার মনে আর কিচ্ছুটি নেই। তার মতো লোককে দেখেছ কখনো, শুধু নিজের দলের কজনের ভালমন্দ দেখবে—অন্য কারো নয়?' বুড়ো কেং খুড়ো তামাকের পাইপটি ধরিয়ে, চুল্লিতে চমক দিয়ে ওঠা আগুনের শিখার দিকে তাকিয়ে ধূমপান করতে লাগলেন। জীবনের মাঝ-বরাবর পার ক'রে আজ তিনি খেত-খামারের কাজে এসেছেন। খুব অল্পবয়সে বাপ-মা দু'জনেই মারা যায়। কালো লোহারের বাপের কাছ থেকে তাঁর কামারের কাজ শেখা। কালো লোহারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের বিশটি বছর কেটেছে তাঁর কত না চড়াই-উৎরাই-এর মধ্যে দিয়ে। তারপরেই জমিদার সম্পর্কটি বার ক'রে ফেলল—তাঁর সঙ্গে আট নম্বর পদাতিক বাহিনীর সম্পর্ক। সঙ্গে সঙ্গে দুশমন আত্মরক্ষা বাহিনী তাঁর পিছু নিল। তারপর ছুট—সমান জমি থেকে পাহাড়ে ছুট। ঐ পাহাড়েই তো নতুন জীবনের শুরু, ভাড়া-করা মজুর হিসেবে।

তারপর আবার নতুন ক'রে জমি বিলি হল। এতদিন কালো লোহার এক জায়গায় স্থিতু হতে পারে নি—এক গাঁ থেকে আরেক গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে ফিরেছে—সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে সঙ্গে নিয়ে ঘোরার মতো একটা নেহাই। জমি বিলির পর গ্রামে স্থিতু হয়ে বসে ঐ নেহাইটাকে সরিয়ে রাখল। গরমে কাজ করত খেতে আর শীতে করত লোহারের কাজ—সমবায়ের জন্যে। তাদের যে-উৎপাদন বাহিনী, অনেক বছর ধরে সে ঐ বাহিনীর জিম্মাদার। খামার, ভার বইবার জন্তু-

জানোয়ার, কাজ করবার যন্ত্রপাতি, সবই থাকত তার জিম্মায়। মাঠেতে কেং খুড়ো কারো কাছে মাথা নিচু করার নয়, কিন্তু কামারশালায় কালো লোহারের কাছে মাথা তাকে নোয়াতেই হতো। দু'জনের মধ্যে দশ লি-র মতো রাস্তার তফাত। একজন থাকেন ঐ পাহাড়ের চুড়োয় -- হাপর গাঁয়ে, আরেকজন নিচে -- কেং গাঁয়ে। কিন্তু দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ আছে। দু'জনেই ওঁরা আদর্শ শ্রমিক, কাজেই দু'জনের মধ্যে যোগসূত্রটি কঠিন গেরোয় বাঁধা।

দু'টি গাঁ-কেই ঘিরে বড় বড় পাথুরে পাহাড়ের টুকরো, মাঝে মাঝে রুমালের মতো কয়েক খণ্ড ভাল জমি এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। সমবায় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বনাঞ্চলের পুনর্বিস্তার দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, পশুপালনও পেছনে পড়ে ছিল না। সম্প্রতি এই ক'বছরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আরো অনেক খেত বিছানো হয়েছে, অনেক চৌবাচ্চা খোঁড়া হয়েছে, অনেক সব ফলের গাছ পোঁতা হয়েছে। এখন খাবার তাদের যথেষ্ট, কিন্তু উৎপাদনের অঙ্ক যথেষ্ট উঁচু নয়।

সে একটা প্রচণ্ড বিস্ময় -- যখন দেখা গেল হাপর গাঁয়ের উৎপাদন-অঙ্ক পীত নদী সাঁতরে পার হওয়ার কৃতিত্বকেও ছাড়িয়ে গেছে। সারা জেলা-জুড়ে সবাই বলাবলি করছিল। জেলাস্তরে অনেক সব সভার আয়োজন করা হয়েছিল -- অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য। বুড়ো কেং খুড়ো কালো লোহারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখলেন। শিখলেন কেমন ক'রে গাঁয়ের ব্যাপারে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দিতে হয়; কেমন ক'রে কালো লোহার আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা এমন এক ধরনের ধান উৎপন্ন করেছেন যার উৎপাদন-অঙ্ক খুবই উঁচু, হিমে এই ফলন জমে গিয়ে নষ্ট হয় না, অথচ এর মধ্যেই শীত প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে -- তাই এর নাম শীত প্রতিরোধ অর্থাৎ শী-প্র ফলনের ধান। এই ফলন তুষারের শীত আর শীতের শুষ্কতা -- এ দুই-ই সহ্য করতে পারে, জমে-যাওয়ার মতো ঠাণ্ডাতে বোনাও যেতে পারে, তোলাও যেতে পারে। খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, খুব তাড়াতাড়ি পাকে। শুনে বুড়ো কেং খুড়োর মনের খিদেটা যেন মিটে গিয়েছিল! তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন যে তাঁর নিজের সমবায়ের জন্য এই ফলনের আমদানি করতেই হবে। তিনি ভাবছিলেন : তাহলে হাপর গাঁ আবার আমাদের গাঁ-কে ছাড়িয়ে গেল, ওরা আবার নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। আমরা যদি ঐ শী-প্র ফলন এখানে করাতে পারি -- একমাত্র তবেই উৎপাদনের উঁচু অঙ্ক আমাদের আয়ত্তের সীমায় আসবে। খুব একটা বেশি আশা যদি আমরা নাও করি তাহলেও অতীতে আমরা যা দিতাম তার থেকে অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কাটি বেশি ধান আমরা সরকারে

জমা দিতে পারব। এই জন্যেই তিনি ঐ-দিন জেলাওয়ারী সভা থেকে ফেরার পথে কালো লোহারের সঙ্গে কথাই বলে চলেছিলেন। ঐ রাত্তিরটা কালো লোহারকে তিনি নিজের কাছে রেখেওছিলেন। দু'জনে খালি কথা আর কথা, সেই ভোর হওয়া অবধি।

বুড়ো কেং খুড়ো তাঁর এই বিশেষ ফলনের স্বপ্নটার সঙ্গে কেমন যেন গভীর-ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কে যেন তাঁকে ঘন আঠা দিয়ে ঐ-স্বপ্নটার সঙ্গে এঁটে দিয়েছিল। যে-মুহূর্তে হাপর গাঁয়ের লোকেরা খেতে বীজ ছড়ালো, সে-মুহূর্ত থেকেই আরম্ভ হল তাঁর ছোটাছুটি—দু'টো গাঁয়ের মধ্যে দশ লি-র মতো রাস্তা। দিনের পর দিন তিনি পাশের হাপর গাঁয়ে ছুটেছেন—ওরা কেমন ক'রে কাজ করছে দেখতে। শরৎ এল, আবারো প্রচুর ফলন হল হাপর গাঁয়ে। বুড়ো কেং খুড়ো যাকে পান তাকেই থামিয়ে বলেন, 'এবার তো আমাদেরও আশা আছে। এবার তো আমরাও শী-প্র ফলনের চাষ করতে পারি।'

কিন্তু হাপর গাঁয়ের এই বিশেষ ফলনের পুরোটাই জেলা-সদরের বীজ-কেন্দ্রে বাঁটোয়ারার জন্যে দিয়ে দেওয়া হল—এক-একটা সমবায়ের ভাগে পড়ল মাত্র কয়েক থলি ক'রে। কেং গাঁয়ের ভাগে এল কুড়ি থেকে তিরিশ কাটি। বুড়ো কেং খুড়োর তাতে বেশ রাগ। মনে মনে ভাবলেন: 'এই যে ফলনের উঁচু-অঙ্কের দৌড় —তা-চাই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে এই দৌড়ে তো আমরাও আছি। শী-প্র বীজ-ধান যথেষ্ট নয় বলে তো আমরা ছেড়ে দিতে পারি না। আমরা তো আর পরের বারের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে থাকতে পারি না। না—তা তো আমরা পারিই না, কিছুতেই না, অবশ্যই না। আজ যে তা-চাই-এর সমস্ত খেত এত উন্নত হয়েছে, ফলন এত বেড়ে উঠেছে—এতো আর অপেক্ষা ক'রে হয় নি।' খুড়োর ছেলে লিয়ান ওয়াং—তার সমবায়ে উৎপাদন-বাহিনীর অধিনায়ক। খুড়ো তাকে থামিয়ে বললেন, 'পরের বসন্তে সমস্ত জায়গা জুড়ে পুরোপুরি আমরা শী-প্র ধানই বুনব—অন্য কিছু নয়। আমি চললাম হাপর গাঁয়ে তোমার কালু খুড়োর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে।'

হাপর গাঁয়ের উৎপাদন-বাহিনীর সদর দপ্তরে এলেন কেং খুড়ো। কালো লোহার বেরিয়ে এলেন। কাঁধে একটা ওজনের পাল্লা। কড় গুনে হিসেব করছেন, আর সেই হিসেবের গভীর চিন্তায় চোখ কুঁচকে উঠেছে। কেং খুড়ো পথ আটকে বললেন, 'কালো লোহার, আমি তোমার সন্ধানেই এসেছি।'

হো হো ক'রে হাসতে হাসতে কালো লোহার বললেন, 'আরে ভায়া! আমি

তো জানতাম, তুমি এখানে আসবেই।'

'তুমি কী ক'রে জানতে?'

'কেন? শী-প্র বীজ-ধান, ঠিক বলি নি?'—কালো লোহার চোখ নাচিয়ে বললেন।

'আরে তুমি···মানে···তুমি তো দেখছি গুড়ি মেরে মেরে আমাদের পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছ।'—হাসতে হাসতে বললেন কেং খুড়ো। 'ধরেছ কিন্তু ঠিক, তোমার সাহায্য পেতেই তো এখানে আসা।

'আমরা তো বীজ-ধান নিয়ে তোমাদের জন্যে তৈরি হয়েই আছি—একেবারে পুরো দু'থলি।'

'দু'থলি? সত্যি?' হাসিতে কেং খুড়োর মুখ যেন চাঁদের আলো, যেন প্রচণ্ড খরায় দেহের উপর বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ল। তিনি হাত বাড়িয়ে কালো লোহারের হাত খপ ক'রে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়তে লাগলেন—তাঁর দু'চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা।

শরতের শেষ। দু'-দু'থলি বীজ-ধান, আর যে-সে ধান নয়, একেবারে শী-প্র ধান। কেং গাঁয়ের উৎপাদন-অঙ্ক উঠতে উঠতে একেবারে আকাশ সমান উঁচু। তারা যখন ধান ওঠালো তাদের ফলনের অঙ্ক, তাদের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্ক ছাড়িয়ে অনেক ওপরে—এক-আধ কাটি ওপরে নয়, একেবারে এক লক্ষ কাটি। বুড়ো কেং খুড়ো হাসি আর থামাতে পারছেন না। ছেলেকে চেপে ধরে বললেন, 'লিয়ান ওয়াং, এ-বছর আমি গিয়ে সরকারে ধান জমা দেব। প্রতি বছর সরকার আমাদের যন্ত্রপাতি দিচ্ছেন, রাসায়নিক সার দিচ্ছেন—জমি যাতে উর্বর হয়। এ-বছর আমরাও জেলা সদরের সভায় গিয়ে বলব—এবার আমরাও তা-চাই-এর পথ ধরে এগিয়েছি। পাহাড়ের পর পাহাড়কে আমরা খেতের পর খেতে পরিণত করেছি, উর্বর ফলপ্রসূ সমস্ত খেত। এখন থেকে আমরাও আমাদের দেশের জন্য বেশি, অনেক অনেক বেশি ফলন জমা দিতে পারব।' তাঁর আনন্দরক্তিম মুখেতে কী-না-জানি এক উত্তেজনা প্রতিফলিত হচ্ছিল, তাঁর দু'চোখে কী-না-জানি এক আনন্দের অশ্রুধারা।

বুড়ো কেং খুড়ো জেলা-সদরের খামারবাড়িতে পৌঁছে শোনেন—তাঁদের জন্য রাখা হাপর গাঁয়ের দু'থলি শী-প্র বীজ-ধান একেবারে সবার সেরা। প্রথমে একবার বাছাই, তারপর তুস ঝাড়াই, তারপর আরেকবার বাছাই। এই দু'থলি ওরা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই ঝাড়াই-বাছাই ক'রে রেখেছিল, কিন্তু কালো লোহার

এই দু'থলি কেং খুড়োদের জন্য দিয়ে গেছেন। বুড়ো কেং খুড়ো আপনমনে বলে উঠলেন, 'ওরা কিন্তু সত্যিই খুব উদার। আশ্চর্য, এ-কথাটা আমার আগে মনে হয় নি কেন?'

গাঁয়ে ফিরে বুড়ো কেং খুড়ো পার্টি-শাখার সভায় সমস্ত কথা বললেন। সেখানে ঠিক হল বুড়ো কেং খুড়ো সব-সেরা শী-প্র ধান থেকে দু'শো কাটি বেছে নেবেন হাপর গাঁয়ের জন্য। বুড়ো কেং খুড়ো ওই দু'শো কাটি ধান গাধার পিঠে বোঝাই ক'রে পাহাড়ী পথের দিকে এগিয়ে চললেন। মাত্র এক নজর—কালো লোহারের বুঝতে আর দেরি হল না। বুড়ো কেং-কে থামিয়ে বললেন, 'তোমাদের চেষ্টায় আমরা মদত যুগিয়েছি মাত্র। ভাল জাতের ফলনের উপকার যাতে সবাই পেতে পারে—সেটাই তো আমাদের করা উচিত। শোধ দেওয়ার কথাতো আসে না। আমাদের তোমরা মনে কর কী? আমরা কি এতই ছোট? আসলে কী জানো? ছোট একটা চাবির গর্তের ফাঁক দিয়ে তোমরা আমাদের দেখেছ।'

বুড়ো কেং হাসতে হাসতে বললেন, 'না, না, শোধ দেবার জন্য নয়। তোমরা আমাদের দু'থলি শী-প্র ধান দিয়েছ। আমরা তোমাদের উপহার দিচ্ছি দু'থলি বন্ধুত্বের ধান। যা দিচ্ছি তা হয়তো অল্পই, কিন্তু আমাদের দুই গাঁয়ের বন্ধুত্ব—সেতো অনেক বড়।' কালো লোহার শোনার পাত্রই নয়। ঐ দু'থলি ধান—একবার কালো লোহার ওদিকে ঠেলেন তো কেং খুড়ো এদিকে ঠেলেন। শেষকালে হাপর গাঁয়ের উৎপাদন বাহিনীর দপ্তরখানার উঠোনে ওই দু'থলি ধান ধপ ক'রে ফেলে দিয়ে কেং খুড়ো মার দৌড়!

'কালো লোহার কি মনে মনে এই ব্যাপারটা পুষে রেখেছে? তা না হলে সে এল না কেন? বার বার তিনবার আমি তাকে আসতে বললাম।' কেং খুড়োর দুশ্চিন্তা যত বাড়ে, তত বাড়ে তাঁর হতাশা। তামাকের থলির মধ্যে পাইপ ঢুকিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে বললেন, 'উত্তরে বিস্তার ঐ কঠিন শৈলশ্রেণী—ওদের বিরুদ্ধে আমাদের বিপ্লবী সংগ্রাম। বাতাস আমাদের হাড়ের কনকনানি ধরিয়ে দেয়, পাহাড় জমে ইস্পাতের মতো ঠাণ্ডা। তবু কিন্তু আমরা ছাড়ি নি। চেয়ারম্যান মাওয়ের চিন্তার ওপর আমাদের নির্ভর, লড়াই চালিয়ে যেতে আমরা বদ্ধপরিকর। এই লোহার ডাণ্ডাগুলোর তৈরি খুব খারাপ, কোনো কাজ হবে না এদের দিয়ে, সব পণ্ড হয়ে যাবে। ওইযে ওখানে ওরা কাজ করছে, ওরা সবাই অপেক্ষা করছে আমার হাতের তৈরি ভাল ডাণ্ডার জন্যে, আর আমি অপেক্ষা করছি কালো লোহারের জন্যে।' বুড়ী কেং খুড়ী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'খুড়ো, তুমি তোমার

কাজের পথে চলতে চলতে ঐ-পথের মাটিতেই গেঁথে গেছ—নিজেকে আর ঘোরাতে ফেরাতে পারছ না। কালো লোহার এখন হাপর গাঁয়ের উৎপাদন-বাহিনীর বিপ্লবী-সমিতির কার্য-পরিষদের সদস্য। তাঁর মন তোমার মনের মতো অত সংকীর্ণ হতেই পারে না। এ-বছর গম তোলার ঠিক আগেই প্রচণ্ড খরা হাপর গাঁকে জ্বলিয়ে দিয়েছে। এক-এক গাছা ক'রে ধরে ধরে প্রায় সমস্ত ঘাস জ্বলে গিয়েছে। তবু কিন্তু তারা জল-ভাঁড়ারের কপাট-কল খুলে দিয়েছে আমরা যাতে জল পাই। তাদের কথা: "হাপর গাঁ জ্বলে যায় যাক, সে বরং ভাল। কিন্তু পাহাড়ের নিচে আঠারোটা গাঁয়ের ফলন যেন শুকিয়ে না যায়।" একথা ওদের কথা, কালো লোহারদের কথা। ওখানে ওরা ওইভাবেই কাজ করে। কখনো কি ভেবেছ ওদের ওইসব কথা? তা-চাই-এর পথে চলবার জন্যেই তো আমাদের এত তাড়া, কিন্তু তাদেরও কি ঐ একই তাড়া নয়? যুদ্ধের কথা ভাবোতো! এটাওতো যুদ্ধ—প্রকৃতির বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে হাপর গাঁ আমাদের অধিনায়ক—তাদের তো কয়েক পা এগিয়ে থাকতেই হবে। হঁ্যা, আমাদের এখানকার কাজটাও কাজ নিশ্চই—বড় কাজ। কিন্তু আমাদের এটা তো একটা বাহিনী। আর তাদের ওঠার ওপর যে পুরো জেলাটা ওঠা-নামা করবে।'

'ঠিক!' এবার বুড়ো কেং বুঝতে পেরেছেন। 'নিশ্চই খুব দরকারি ব্যাপার-সব ঘটছে, আর তাই কালো লোহার ওখানে কাজে আটকে গেছে, আসতে পারে নি। নইলে, এরকম তো হবার কথা নয়, কালো লোহার কথা যা দেয় তাতো রাখে।'

কেং খুড়ী বললেন, 'ঠিক। এখন থেকে চেয়ারম্যান মাওয়ের লেখা তোমার আরো বেশি ক'রে পড়া উচিত, খুড়ো। তাঁর নীতিটিকে নেবার চেষ্টা করো। জানবে—প্রত্যেক জিনিসেরই দু'টি দিক আছে। তোমার চিন্তার মধ্যে বস্তুটিকে আর একটু বেশি ক'রে আনবার চেষ্টা করো খুড়ো।'

'বাঃ, চমৎকার! রাজনীতির রাত-পাঠশালার গোটা দুয়েক বৈঠকে তো মাত্র হাজির ছিলে, তাতেই তো বেশ শিখে ফেলেছ দেখছি! অন্য লোকেদের রাজনীতির পড়াও শিখিয়ে দিচ্ছ।' মাথা নাড়তে নাড়তে গায়ের জোরে জুতোর ওপর পাইপ ঠুকতে লাগলেন কেং খুড়ো। দমকা হাওয়ায় দরজাটা খুলে গেল। বাইরে থেকে একরাশ তুষার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। কেং খুড়ো লাফিয়ে উঠলেন—ঠিক স্প্রিঙের মতো। বেশ কিছু লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে বাইরে বেরোবার জন্য পা বাড়ালেন। খুড়ী ধরে ফেললেন তাঁকে। 'যাচ্ছো কোথায়? খাবে কখন, শুনি? না কি, খাওয়াদাওয়ার পাট একেবারেই চুকল?'

খুড়ো বললেন, 'পরে। ব্যাপারটা আমার মনের ওপর চাপ দিচ্ছে। এখন আমি খেতেই পারব না।'

'না, তুমি কোত্থাও যাবে না। লিয়ান ওয়াং বলছিল, আজ নাকি খুব বেশি বরফ পড়েছে। এই ঠাণ্ডা তোমার ঐ বেতো পায়ে সইবে না। এই ঠাণ্ডায় তুমি কাজে বেরোও, এটা সে কিছুতেই চাইবে না।'

'খুড়ী, আমি কাগজেরও তৈরি নই, কাদা-মাটিরও তৈরি নই। এত ভয় পাচ্ছো কেন? তুমি তো জানো, আমি কুঁড়ের মতো বসে থাকতে পারি না। লিয়ান ওয়াং চায় না বলে তুমি আমাকে এখানে তালা-বন্ধ ক'রে রাখতে পারো না।'

'তোমার জ্বালায় আমি আর পারছি না। কাজ আরম্ভ হওয়া অবধি একটা দিনও তুমি ভাগ ক'রে খাও নি। একবারো বাড়িতে আস নি। তোমার ছেলে এখানে থাকলে তোমাকে এক্ষুণি বন্ধ ক'রে রাখত।'

'আমি কারো হুকুম নিচ্ছি না।' ঝুপড়ির বাইরে আসছেন খুড়ো।

'বাবা!' এমন সময় সামনে লিয়ান ওয়াং। কেং খুড়ো ঝপ ক'রে থেমে গেলেন। মাথা নিচু ক'রে ডাণ্ডাগুলোকে পিছনে লুকোবার চেষ্টা করলেন। কেং খুড়ী হাসি আর চাপতে পারলেন না।

লিয়ান ওয়াং তখন হাঁপাচ্ছে। পিঠ থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'বাবা, কালু খুড়ো আমাদের এখানে!'

'কোথায়? কোথায় সে?'

'আরে বুড়ো কেং ভাইটি আমার, এইতো আমি।' লোক নয়তো, যেন লম্বা কালো একটা চুড়ো। দরজায় তাঁর ঘোর রঙের মুখ, সেই মুখে এক জোড়া ভুরু, সে ভুরুই বা কী! ভারি, মোটা, অসাধারণ রকমের কালো এক জোড়া ভুরু! আদর্শ একজন চাষি যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে দেহের প্রত্যেকটি অংশে। বুড়ো কেং খুড়ো এগিয়ে গিয়ে যেন আগন্তুকের বাহু আঁকড়ে ধরলেন।

কালো লোহার বললেন, 'আমার দেরি হয়ে গেল। রাগ করেছ তো?'

'না…না…সে কি কথা ‥!'

কালো লোহার কেং খুড়োকে ধরে বসালেন। 'নাও, এক পাইপ তামাক খাও দেখি। এই তামাকপাতাটা উঠিয়েছি ছাইগাদার সার দিয়ে। টেনে দেখো—কী মিষ্টি!' তামাকের থলিটা গৃহস্বামীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। দু'জনেই দু'জনের পাইপ ভরে নিলেন। কালো লোহার বললেন, 'আরে বুড়ো কেং ভাই, তোমাদের গাঁয়ের কাজ-কম্মো তো দেখছি খুব এগিয়ে গেছে।'

'আপনাদের হাপর গাঁয়ের সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না,' বাপের হয়ে লিয়ান ওয়াং উত্তর দিল। 'লোহার খুড়ো, সবাই বলছে তোমরা ঈগল-চুড়োয় পৌঁছে গেছ, জল রাখার বড় বড় চৌবাচ্চা তৈরি করছ, দক্ষিণের ঢাল খুলে দিয়েছ। ক্রমাগত তোমরা উঁচুতে—আরো উঁচুতে চাষের কাজ ওঠাচ্ছো, তুষার ঝড়ের সাধ্য কি তোমাদের ঠেকায়!'

কেং খুড়ো অবাক বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'কী! তোমরা ঈগল-চুড়োয় পৌঁছে গেছ! কেউ ভাবতে পারে, ওই শক্ত পাথুরে পাহাড়ে চাষের কাজ হচ্ছে!'

কালো লোহার মৃদু হাসলেন। 'ঈগল-চুড়োতো কিচ্ছু নয়। আমাদের হৃদয়ে যখন সূর্য উঠেছে, তখন ঈগল-চুড়ো ছাড়িয়ে আরো অনেক উঁচু ঐ আকাশ ছোঁওয়ার অধিকার আমাদের হবেই। তা-চাই-এর ওরা তো বাঘা-পাহাড়কেই উঁচু-ফলনের খেত ক'রে ফেলেছে। ওদেরই বা এমন কী আছে, যা আমাদের নেই? আছে, আছে। ওদের মনের যে-জোরটা আছে, সেই জোরটাই আমাদের পুরোপুরি নেই।'

বুড়ো কেং চোখ কুঁচকে ভাবতে ভাবতে বললেন, 'তোমরা কিন্তু বাপু সোজা মনের লোক নও। ঐ-যে ঈগল-চুড়ো, ওখানে তো বসন্ত আসে দেরিতে, আর বরফ পড়ে সকাল সকাল। অমন যে ঈগল পাখি—তারাও ওখানে বেশি দিন থাকতে পারে না। তোমরা যদি ঈগল-চুড়ো থেকে শী-প্র ধানের অত ভাল ফলন পেতে পার—তা হলে পরের বছর, ঐ-যে বড় রাজহাঁস-চুড়ো—ঐ চুড়োটাকে আমরা আক্রমণ করব; ওর কাছ থেকে নিংড়ে জমি বার ক'রে নেব, তারপর জোর জবরদস্তি ধানের দাবি করব।

কালো লোহার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'এই কিন্তু পথ, ভাই। এস, আমরা ঐ বড় রাজহাঁস-চুড়োটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। তা-চাই-এর লোকেদের দেখো। কী ছিল তাদের? কিচ্ছু না। খালি কাঁধের ওপর শুধু একগাছা ক'রে লাঠি। ওই লাঠি পিটিয়ে তারা ঐসব পাহাড়ের পর পাহাড়ের পাথুরে সব খালি পিঠে তা-চাই-এর খেত তৈরি করল, পাথর ফাটিয়ে তা-চাই সড়ক বানিয়ে নিল। ওরা যদি করতে পারে, আমরাই বা কেন ঈগল-চুড়োর কাছে কিংবা বড় রাজহাঁস-চুড়োর কাছে মাথা নোয়াবো?'

'কীভাবে কাজ করবে ঠিক করেছ?' মাথায় বেশ চিন্তা নিয়ে কেং খুড়ো জিজ্ঞেস করলেন।

'ঈগল-চুড়োর ওপর আমরা যে বড় জল-ভাঁড়ারটা তৈরি করছি—ওটা এক-

বার শেষ হলে হয়। তখন আর তলার জল পাবার জন্যে কোনো দুশ্চিন্তাই থাকবে না। এ-বছর আমরা চূড়োর দক্ষিণের ঢালটার ওপর কাজ করব, পরের বছর উত্তরের। পাহাড় কেটে, পাহাড় পিটিয়ে, আমরা আমাদের সবার জন্য নতুন দুনিয়া তৈরি করতে চাই। পারব না? তোমরা কী বল?'

খুব ধীরে ধীরে কেং খুড়ো ভারি গলায় বললেন, 'বছরে ছ'মাস তো এই ঈগল-চূড়ো জমা-বরফে কঠিন হয়ে থাকে। আগের দিনে জমিদারেরা অনেক গরীব-ভাইদের ওখানে তাড়িয়ে দিত, ওরা যাতে ফসল বোনার মতো জমি না পায়। তারা সব না খেয়ে মরে যেত – তাদের শবদেহ হতো ঈগলদের খাবার।'

লিয়ান ওয়াং বলল, 'আগের দিনে ঈগল-চূড়ো ছিল গরীবদের কবরখানা। এই নতুন সমাজব্যবস্থায় আমরা ওটাকে ফসল রাখার গোলাবাড়ি বানিয়ে তুলব।'

কালো লোহার বললেন, 'ভুললে চলবে না, শ্রেণীসংগ্রাম কিন্তু এখানে এখনো রয়েছে। যেই না আমরা ঈগল-চূড়োয় হাত দেব, কেউ-না-কেউ বলবে – ঈগল-চূড়ো হচ্ছে স্বর্গের চোখ, ওকে ছোঁয়ার স্পর্ধা কোরো না। তা যদি করো, তাহলে জেনে রেখ – দশের মধ্যে নয় – এই ন'বছরই খরা হবে – কোথাও একদানা ফসল জন্মাবে না।'

কেং খুড়ী বললেন, সব 'মিথ্যে কথা! শয়তান তো – তাই শয়তানির হাওয়া বওয়াচ্ছে।'

'আমরা তা-চাই-এর পথে চলতে চাই, ওরা আমাদের পরিকল্পনাকে ধ্বংস ক'রে দিতে চায়' – কালো লোহার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন। 'ওরা দেখছে, আমরা বছরের পর বছর প্রচুর ফলন ঘরে তুলছি। ওরা দেখছে, বছর বছর আমাদের বাঁচার ধরন ভাল থেকে আরো ভাল হচ্ছে, তাই ওরা আমাদের ঘেন্না করে, আমা-দের কামড় দেবার জন্যে ওদের দাঁত সুড়সুড় করে। আমাদের এখানকার পার্টি-শাখাতেও এসব গুজব পৌঁছেছে। আমরা ঐ-রাত্রেই এ-নিয়ে সভা ডেকেছিলাম। আমাদের শ্রেণীশত্রুদের ওই শয়তানি-হাওয়া আমাদের রুখতেই হবে, আমাদের কমরেডদের নৈতিক-শক্তি বাড়াতেই হবে। পরেরদিন পার্টি-শাখার সম্পাদক আর আমি, দু'জনে মিলে ঈগল-চূড়োয় গেলাম – স্বর্গের চোখে খোঁচা মারতে। ভাইরে, বিপ্লবকে চালিয়ে নিয়ে যাবার এই হচ্ছে পথ – শুধু ভেবে-চিন্তে কাজ ক'রে যাওয়া – যাতে ক'রে ঝুঁকির ভারে শয়তানির পাঁকেতে বসে নুয়ে না পড়তে হয় – ঠিক কিনা?'

কেং খুড়ো উরু চাপড়ে বললেন, 'ঠিক – তুমিই ঠিক বলেছ। এই হচ্ছে পথ –

মাথা তুলে এগিয়ে যাও! আমাদের পথও ঐ একটাই। তা-চাইকে দেখে শেখো। এই অভিযান যেই আরম্ভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কেউ-না-কেউ উলটোদিকের কথা-বার্তা বলতে আরম্ভ করল। বলল : ঐসব পাহাড়কে খেতে সমান করা ভয়ানক কঠিন। ঐ-রাস্তায় বড়লোক হওয়া যাবে না। তার চেয়ে সহরে কাজ খোঁজা ভাল। শুনলে কথাটা একবার? কী ধরনের কথাবার্তা সব? অঙ্কটা তারা শুধু কষেই যাচ্ছে আর কষেই যাচ্ছে। খেলার কোনদিকে বুঝতে পারছ? যেদিকে পুঁজিবাদীরা খেলছে সেই দিকে। আমরা তা-চাই-এর রাস্তা ধরে এগোচ্ছি। ওদের অঙ্ক আমরা কষি না। যে-অঙ্কে দেশের সমর্থন, বিশ্ববিপ্লবের সমর্থন, আমরা সেই অঙ্ক কষি!'

কালো লোহার এক মুহূর্তের জন্য থেমে থাকলেন। তারপর বললেন, 'যত শক্ত খাড়া পাহাড়ই হোক, আর কম ফসলের জমিই হোক—ওসবে আমরা ভয় পাই না। আমাদের এই চাষের কাজে অনেক সমস্যা। এইসব সমস্যার প্রতিপক্ষে লড়াই করার স্পর্ধা যদি না থাকে তবেই আমাদের ভয়। ঠিক পথে চলে আমরা যদি তা-চাই-এর পথ ধরে এগোই, তাহলে আমার বিশ্বাস, তিন-চার বছরের মধ্যেই পুরো জায়গাটাকে আমরা তা-চাই-খেতে পালটে দেব।'

কেং খুড়ী মুচকি হেসে বললেন, 'কালো লোহার একেবারে ঠিক কথা বলে-ছেন। কারো সাধ্য নেই আমাদের আটকায়!' তিনজনে একসঙ্গে হেসে ওঠেন।

কেং খুড়ো আবার পাইপ ভরে নিলেন। তারপর বেশ কয়েকটা লোহার ডাণ্ডা তুলে নিয়ে কালো লোহারকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা এগুলোতে গোল-মালটা কোথায়? এর আগে তিন-তিনবার বলেছি, এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কেন জানো, শুধু এগুলোর জন্যে।'

কালো লোহার ডাণ্ডাগুলো পরীক্ষা ক'রে বললেন, 'লোহা মোটে শক্ত নয়, বেশ নরমই রয়েছে। আসলে তাতানোটা ঠিকমাত্রায় হয় নি। আমরা যখন পাহাড়ের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ে নামলাম, আমরাও ঠিক এই একই মুশকিলে পড়ে-ছিলাম।' তিনি কেং খুড়োর কাছে এগিয়ে এলেন। জামার তলায় ক'রে যে-ডাণ্ডা-গুলো এনেছিলেন, সেগুলো দেখিয়ে বললেন, 'এই হচ্ছে ঠিক মাল—ঠিকমতো তাতানো, ঠিকমতো কঠিন। রঙটাও দেখছ না? কি রকম তফাত।' দুই লোহারে মিলে তুলনা করছেন, উত্তেজিত হয়ে উঠছেন, মা আর ছেলে মজা ক'রে দেখছে।

শেষ পর্যন্ত কেং খুড়ো আবার বলে উঠলেন, 'আচ্ছা কালো লোহার, তুমি আর একটু আগে এলে না কেন? আমি তো অন্ধকারে ফিরে ফিরে ঘুরছি, কী যে

করব কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলাম না।' তারপর কালো লোহারের পিঠ চাপড়ে স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কাজ-পত্তর শেষ ক'রে হাপর চালিয়ে যাও, আর তুমি'—ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'পাহাড়ের ওপর লোকেরা সব কাজ করছে, ওদের কী দরকার-পত্তর দেখগে যাও। আমি তোমার খুড়োর সঙ্গে এখানে থেকে এই ডাণ্ডাগুলোকে একটু পিটোবো। যদি দেখি ঠিকমতো আসছে – তাহলে সারা-রাত্তির লেগে থাকব।' লিয়ান ওয়াং উত্তর দিল, 'কিন্তু বাবা, তার আর দরকারই নেই। কালু খুড়োতো দু'শোটা নতুন তৈরি ডাণ্ডা আমাদের কাজের জায়গায় দিয়েই এসেছেন। আমাদের পার্টি-সম্পাদক তো খাজাঞ্চীকে বলেই দিয়েছেন ওই দু'শোটা তৈরি করতে ওঁদের যে মাল আর শ্রম লেগেছে তার একটা হিসেব করতে।'

'ও! তুমি তাহলে আবারো আমাদের সাহায্যে এলে। সত্যি কালো লোহার, তুমি একটা লোক বটে!'—কেং খুড়ো বললেন।

লিয়ান ওয়াং বলে চলে, 'শুধুতো ডাণ্ডাগুলো নয়, কালু খুড়োতো সঙ্গে ক'রে তাঁর বিছানাটাও এনেছেন। ক'দিন আমাদের সঙ্গেই কাজ করবেন।'

কেং খুড়ী বললেন, 'তাহলেই দেখো, হাপর গাঁ তা-চাই-এর কাছ থেকে কেমন শিখেছে।'

কালো লোহার বলে উঠলেন, 'আরে বুড়ী-বোন, শোনো, শোনো, আমরা সব সময়ে লক্ষ রাখি যাতে ক'রে শ'য়ে শ'—অর্থাৎ কিনা পুরোপুরি চেয়ারম্যান মাওয়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এতো পুরনো কথা, আমাদের জানা। অথচ আমরা কথাবার্তা বলছি, যেন আমরা সব নতুন লোক, কেউ কাউকে চিনি না। আর তা-চাই-এর কাছ থেকে শেখা? ঐ আদর্শ লক্ষ্যে রেখেই তো আমরা প্রকৃত সাম্যবাদের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি।'

কেং খুড়ো ভাবছিলেন কালো লোহার তাঁকে ছাড়িয়ে কতদূরই না এগিয়ে গেছে, কত কী-ই না দেখেছে, কত বেশি কাজই না করেছে! বললেন, 'চলো, কাজের জায়গায় যাই।'

'না না,' বুড়ী কেং খুড়ী বলে উঠলেন। 'কালু খুড়োর পাকস্থলীতে নালী-ঘা রয়েছে, ওঁকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়া চলতেই পারে না।'

'আরে, কোথায় পাকস্থলীতে কী-না-কী একটা হয়েছে—ওতে কিচ্ছু যাবে-আসবে না,' কালো লোহার বললেন। 'তা-চাই-এর বীর সেনানী চিন চিন কাই—তাঁরও তো পাকস্থলীতে ঐ-ধরনের গোলমাল ছিল, কিন্তু তিনি তো কাজ বন্ধ

করেন নি, একদিনের জন্যেও নয়। বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না, এই মর্ত-পৃথিবীর ওপর নির্ভর করাও চলবে না, নির্ভর করতে হবে আমাদের মাও ৎসেতুং-এর চিন্তাধারার ওপর, কমরেডদের কঠিন অস্থির আর রক্তিম হৃদয়ের ওপর।'

কালো লোহার এক হাতে কেং খুড়োকে ধরলেন, আর এক হাতে লিয়ান ওয়াংকে, তারপর তিনজনে লম্বা লম্বা পা ফেলে—ওই যেখানে কাজ হচ্ছে লক্ষ্য ক'রে দৌড় দিলেন।

বুড়ী কেং খুড়ী উনুনের ওপর খাবারটা গরমে রাখলেন। আর এক পাত্র জলও চাপিয়ে দিলেন। জলও ফুটছে আর তিনিও নিজের মনে বলেছেন: 'তোমরা সব ভেবেছ কী? আমায় এখানে আটকে রাখবে? আমারো করার মতো কাজ আছে, আমিও উঠি। এই গরম জল আমি ওদের দিয়ে আসব।' দরজা খুলে তিনি ঐ ঘূর্ণমান তুষার-ঝড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

উত্তরে বিস্তার শৈলশ্রেণী, স্ত্রী পুরুষে সেখানে কাজ করছে, খুঁড়ছে, হাতুড়ি পেটাচ্ছে, আঘাতের পর আঘাত করছে। তুষার ঝটিকাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য ক'রে তাদের উত্তেজিত কথাবার্তা আর হাসি দৃঢ় এক সংগ্রামী গর্জনে পরিণত হচ্ছে। যেন কর্মযজ্ঞের নিষ্ঠায় স্ফীত উত্তাল এক বসন্তের স্রোত—বসন্তের স্রোতে আজ এসেছে জোয়ার।

অনুবাদ ॥ অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

মা ই কে ল অ্যা ন্ট নি

একটি মেয়ে, একটি নদী

সেই খেয়া নৌকাটাকে মনে করতে পারবে না এমন একজনও নেই গোটা অর্টোয়াতে। কেবল খুব বাচ্চারা যারা বোঝে না কিছুই, আর খুব বুড়োরা যাদের মনে নেই কিছুই, তারা ছাড়া। সেই কতকাল আগে থেকে—যখন লোকে বলত যে এত চওড়া নদীতে কোনো সেতু বানানো অসম্ভব, এমনকি যখন এই গ্রামটাই গজিয়ে ওঠে নি তখন থেকেই এই খেয়া মস্ত এই নদীকে পাড়ি দিয়ে চলেছে।

কিন্তু আজ আর খেয়া নৌকাটা নেই। মানুষজন আর যানবাহনকে নিয়ে যেটা তীর থেকে তীরে বয়ে যেত সেই বিপজ্জনক পাটাতনটা আর নেই। নেই সেই কাছিটাও যা দিয়ে টেনে পার করা হতো নৌকাটাকে। আসলে, আজ যদি ওখানে বেড়াতে যাও, সেই খেয়ানৌকার জায়গায় মস্ত উঁচু এক ইস্পাতের সেতু দেখে অবাক হয়ে যাবে। ঐ সেতুটা তৈরি করার ভার পেয়ে আমি যেমন আহ্লাদে আটখানা হয়েছিলাম, তোমরাও সেরকম হতে নিশ্চয়ই।

খুবই খুশি হয়েছিলাম আমি আর উত্তেজিতও ছিলাম খুব, কিন্তু সে কেবল কাজ শুরু করার আগে পর্যন্ত। কেন না ঠিক সেই মুহূর্তেই গোটা গাঁয়ের রাগ এসে পড়ল আমার ওপর।

প্রত্যেকেই হয়ে উঠল আমার তীব্র বিরোধী, ঐ নৌকার মাঝিটির জন্যে। ওরা বলল, আমি নাকি ওকে এই নদী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ফিকিরে আছি। ওরা আরো বলল, ঐ মাঝিই হল এই গাঁয়ের আপন লোক, আমার জন্মের আগে থেকে ও এই খেয়া-পারাপারের কাজে আছে। আর এখন আমি এখানে এসেছি—কেউ জানে না কোত্থেকে। আর এসেই ভাব দেখাচ্ছি যে খেয়াটা এখানে যথেষ্ট ভাল নয়। তারা দেখবে কত দূর যেতে পারি আমি।

চুপ ক'রেই থাকলাম আমি, কিন্তু ঠিক করলাম যে কাজটা করেই যাব। কারণ আমারো এরকম একটা কাজের দরকার ছিল, আর অর্টোয়া নদীরও দরকার ছিল একটা সেতুর। গ্রামবাসীরা যে আমায় ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে, এটা আমি হতে

দিতে পারি না। পারে ভিত তৈরি ক'রে, নদীর বুকে পিলার ফেলে, গরান কাঠ কেটেকুটে কাজ শুরু ক'রে দিলাম আমরা। যতক্ষণ আমরা কাজ করতাম, গ্রাম-বাসীরা আমাদের গালাগাল করত। শেষ পর্যন্ত তারা ভয় দেখাতে লাগল যে জোর ক'রে কাজ থামিয়েই দেবে যদি আমরা নিজেরা না থামি।

আমরা ভয় পেয়েছিলাম একটু। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওদের কথায় যত তেজ কাজে ততটা নয়, ফলে কাজটা চলতে লাগল। খুব শক্ত হাতে কাজ করতে থাকলাম আমরা, কারণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলে কেটে পড়তে হবে। ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত খেটে যেতাম আমরা আর তাঁবুর মধ্যে তটস্থ হয়ে কাটাতাম রাতের বেলা। এই নদীটা, গাছের বুনো আপেল আর যাযাবর কিছু পাখি—এছাড়া আর কোনো বন্ধু ছিল না আমাদের।

বেশ কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর যখন নদীর ওপর সেতুর কাঠামোটা ধীরে ধীরে জেগে উঠল, আমাদের পরিশ্রমের ফসল যখন চোখে পড়তে লাগল, তখন এত অস্থির হয়ে উঠলাম যে রাতে আমার ঘুমই হতো না। এটা কেবল এজন্যই নয় যে এ-জায়গাটা থেকে পালানোর জন্য আমি ব্যাকুল। যখনই আমি শুয়ে পড়তাম, স্বপ্ন দেখতাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আর লোকের ভিড়ের, আর সেতু পেরোবার জন্য লাইন দেওয়া অসংখ্য গাড়ির। দেশের বুকে কিছু একটা চিহ্ন রেখে যেতে চেয়েছিলাম, আর এই হচ্ছে আমার প্রথম সুযোগ। সবাইকে আমি এটা দেখাতে চেয়েছিলাম, জানাতে চেয়েছিলাম যে এটা আমার তৈরি। আমি চেয়েছিলাম, তারা বলুক যে জগতের এ-প্রান্তে এটাই হল সবচেয়ে ভাল সেতু। শেষ করার ভাবনায় আমি এত অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে মনের মধ্যে একটু শান্তি পাবার জন্য অবসর সময়ে আমাকে চলে যেতে হতো সেতুর কাছ থেকে অনেক দূরে। গ্রামের মধ্যে যাওয়ার সাহস আমার ছিল না। তাই এ-সময়ে আমাদের ছোট্ট নৌকাটা নিয়ে বেয়ে যেতাম নদীতে, গ্রাম পেরিয়ে হারিয়ে যেতাম অন্তহীন সবুজের মধ্যে।

নদী থেকে বেরিয়েছে একটা ছোট খাল, গাঁয়ের লোকেরা অনেকে সেখানে আসত কাপড় কাচার জন্য। এখানে জল ছিল খুব পরিষ্কার আর নদীর পারে ছিল চওড়া বড় একটা পাথর। প্রায়ই এখানে আসতাম আমি, বসতাম সেই পাথরটার ওপর। চারদিকে কেউ থাকত না। মনে মনে ঘুরে বেড়াতাম এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়—আমার দেশ পোর্ট অব স্পেনে, এখানকার নানা সমস্যায়, আর সেইসব দেশে যেখানে বা যে-কাজে আমাকে পাঠানো হবে এর পরে। প্রায়ই আমি ভাবতাম এই গ্রামটার কথা, কে জানে গ্রামটা ঠিক কী রকম। নিজেকেই

প্রশ্ন করতাম, যখন এই সেতুটা বানানো শেষ হয়ে যাবে, তখন কি এই রাগী লোকেরা পালটাবে তাদের মন ? তারা খুশি হবে কি ? এইসব ভাবতাম, তারপর প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার ফিরে আসতাম সেই নৌকায়, বেয়ে যেতাম বড় নদীর দিকে, তারপর ঐ সেতুর দিকে।

একদিন, অন্যান্য দিনের চেয়ে একটু আগে, ঐ পাথরটার কাছে পৌঁছে দেখি এক তরুণী মেয়ে কাপড় ধুচ্ছে সেখানে। ফিরে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মেয়েটি চোখ তুলে দেখল আমাকে। ফলে বলতে হল, 'এই যে !'

'এই যে, মিস্টার ড্যাংকলার।'

এ-মুখ আগে কখনো দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না, কিন্তু মেয়েটি দেখছি আমার নাম জানে ! মনে হয়, গ্রামের সকলেই আমার নামটা জানে।

'খুব খাটুনির কাজ ?'

'হুঁ,' বলল সে।

তার পোশাক-আশাক ভাল নয়। মনে হল, সে চাইছে আমি চলে যাই। কিন্তু এতদিনের মধ্যে এ-গাঁয়ের কোনো লোকের সঙ্গে পরিচিত হবার এটাই আমার ঘনিষ্ঠতম সুযোগ। আর একে বেশ নরমগোছেরও লাগছিল, তাই আমি চাইছিলাম ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে। আমার জানতে ইচ্ছে হল, সে-ও এই সেতুটাকে একটা শয়তানের কাণ্ড বলে মনে করে কিনা।

বললাম, 'জলটা এখানে বেশ পরিষ্কার, কী বলো ?'

'তাই তো আমরা এখানেই কাপড় কাচি,' বলল সে।

এতে আমার চোখ পড়ল ধুয়ে-রাখা কাপড়ের বিশাল স্তূপের দিকে। অবশ্য আরো এক স্তূপ কাপড় জমে ছিল ধোয়ার অপেক্ষায়।

'সমস্তটাই কি আজ সারতে পারবে ?'

সে বলল, 'পারতে পারি কিন্তু নাই যদি পারি তো কাল আবার আসতে হবে।' কিছুক্ষণ থামল সে, সাবানে তার হাত-ভর্তি ফেনা। বাকি কাপড়ের বোঝাটার দিকে তাকালো, আর তাকালো তার চারদিকের ঢেউ-তোলা জলের দিকে।

বললাম, 'জোয়ার আসছে।'

'তাই মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই দেরি হয়ে গেছে। আমি বরং শেষ ক'রে ফেলি। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'

সে আবার কাপড় কাচতে শুরু করল। আমি এমন ভাব করলাম যেন তার কথার মধ্যে আমাকে বিদায় দেবার যে-ইঙ্গিত আছে সেটা লক্ষই করি নি। সেতুটার

বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস না ক'রে আমি যাচ্ছি না কিছুতেই।

বোঝা থেকে সে তুলে নিল আরেক টুকরো কাপড়। স্তূপের দিকে তাকালাম আমি। সত্যিই একটা কঠিন কাজ নিয়েছে সে। ভাবলাম, এমন যদি কোনো কথা বলতে পারতাম যা তার কাজটাকে এতটুকুও হালকা ক'রে তুলতে পারে! তাকালাম তার দিকে। ব্যস্তভাবে সে কেচে চলেছে, আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম আমার উপস্থিতি সম্বন্ধে সে বেশ সচেতন।

আমি বললাম, 'জানো, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি যদি তুমি হয়ে যেতে পারতাম। এত সুন্দর এই জায়গাটা—এত ঠাণ্ডা! আমার জায়গাটা খুব পছন্দ। স্তব্ধতা আর শান্তির মধ্যে কাজ করতে আমায় খুব ভাল লাগে।'

সে বলল, 'অর্টোয়াতে খুবই বেশি স্তব্ধতা আর শান্তি।'

'বেশি স্তব্ধতা আর শান্তি? সেটাই তো আমি চাই।'

'তা বলছি না আমি,' মুচকি হাসল সে। 'আমি আসলে ঐ জায়গাটার কথাই বলছি।'

'কিন্তু বলো তো, এখানে কি তোমার খুবই একঘেয়ে লাগে? এ-গ্রামটা কেমন?

'অর্টোয়াতে করবার মতো এমন কিছুই নেই। তবে আমার এ-জায়গাটা ভাল লাগে।'

এবার নৌকাটাকে আমি একেবারে পাথরটার কাছে নিয়ে এলাম, আর যেই আমি তীরে পা রেখেছি, উদ্বেগে সে বলে উঠল, 'মিস্টার ড্যাংকলার!'

চটপট আমি নৌকায় ফিরে এলাম, সরিয়ে নিতে চাইলাম সেটাকে। আমার কাণ্ড দেখে সে না হেসে পারল না।

বললাম, 'ঠিক আছে। আমার জন্য তুমি অসুবিধেয় পড়ো এ আমি মোটেই চাই না। নিজেই আছি বিস্তর ঝামেলায়।'

সে বলল, 'না না, তা নয়। আপনাকে এখানে যদি কেউ দেখে ফেলে, সেটা খুব ভাল হবে না। লোকেরা কী রকম জানেনই তো! আর বিশেষ ক'রে...'

'জানি জানি। বিশেষ ক'রে গাঁয়ের মধ্যে যখন তারা আমার মুণ্ডুটা চায়। তুমি কি ভাব ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না?'

আবার না হেসে পারল না সে। পরে বলল, 'মনে করবেন না যে আমিও আপনার বিরুদ্ধে। আমি বুঝি যে আপনি কেবল আপনার কর্তব্য ক'রে চলেছেন।'

'ঠিক তাই। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। অনেক ধন্যবাদ। কেউই তো এটা

বোঝে না।'

সে কিছু বলল না। আমি বলেই চললাম, 'মোদ্দা কথা হল—আমি একজন সরকারি চাকুরে, সেতুটা বানাতে এসেছি। আমি কাউকে তার কাজ থেকে তাড়াতে চাই না।'

মেয়েটা তো কাপড় কেচেই চলেছে। সে বলল, 'এজন্য আপনি ভাববেন না।' কিছুক্ষণ পরে আবার জুড়ে দিল, 'প্রায় শেষ ক'রে এনেছেন দেখলাম।'

আশ্বস্তভাবে আমি বললাম, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

মুচকি হাসল সে। 'জানি এ-জায়গাটা ছেড়ে যেতে আপনার কী ভালই না লাগবে!'

'তাই? সেটা অবশ্য আমি ঠিক জানি না। আশ্চর্য! কিন্তু এ-জায়গাটা ভালই লাগছে আমার। এরকম জীবনযাত্রা আমি পছন্দই করি—গাছপালা, নদী, পাখি। এই নির্জন দেশ কেমন ক'রে যেন আমি খুব পছন্দ ক'রে ফেলেছি। অটোয়ার লোকজন যদি আমাকে একলা ছেড়ে দেয়!'

সে হাসল। কাপড়চোপড় এবার সে শুকিয়ে নিচ্ছে। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আমারো। এ-জায়গাটা আমারো বেশ ভাল লাগছে।'

'তাহলে তুমি এখানে থাকো না বুঝি?' আমি অবাক হয়ে গেলাম।

'তা—হ্যাঁ, না, দু'টোই। আমি এখানকারই, কিন্তু আমার গোটা জীবনই প্রায় আমি কাটিয়েছি সাঁগর গ্রাঁদ-এ। কিন্তু আমার বাবা এখন আর কাজ করছেন না বলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য ফিরে এসেছি এখানে।'

'কিন্তু সাঁগর গ্রাঁদ-এ থেকেও কি তাঁকে সাহায্য করতে পারতে না তুমি?'

একটু ইতস্তত করল ও। তারপর বলল, 'কিন্তু, আমি এখানে থাকতেও চাই। উনি এত মুসড়ে পড়েছেন!' তাকিয়ে রইল সে নদীর দিকে।

'এখন তুমি কোথায় কাজ করো?'

'এই তো, এইখানেই!'

হঠাৎ তাকালাম তার দিকে, আর কথা সরল না আমার মুখে। বুকের ভেতরে একটা ধাক্কা খেলাম। আগে ভেবেছিলাম, এই তরুণী বুঝি কোনো পরিবারের বড় বোন, গোটা সপ্তাহের কাচাকাচির ভার নিয়েছে। আমি বুঝি নি যে, অন্য লোকেদের কাপড় ধুতে হচ্ছে ওকে।

কয়েক মুহূর্ত পরে আমি সরে এলাম মেয়েটির কাছ থেকে, খুব মনমরা হয়ে নৌকা বেয়ে চললাম বড় নদীটার দিকে, তারপর আমাদের আস্তানায়। নদীর ওপর

বিশাল সেই কাঠামোটা দেখতে লাগলাম। আর এই একবারের মতো একটুও গর্ব হল না আমার মনে।

মনে হল, জীবন এত পরিহাসময় কেন? এইখানে, এই নদীর ওপর গড়ে উঠেছে একজন ইঞ্জিনিয়ারের সাফল্যের স্বপ্ন, অথচ এই নদীটার ওপরেই আছে দুর্দশা, আছে এমনকি একটি তরুণী মেয়ের লাঞ্ছনা।

সে-রাত্রে যখন আমার ফোরম্যানকে মেয়েটির গল্প বলছিলাম, লক্ষ করলাম সে যেন একটু বিশেষ রকমের চুপচাপ। বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'আপনি চেনেন মেয়েটিকে?'

'না, কিন্তু তাতে কী এসে যায়? কেবল এইটুকু আমি বুঝেছি যে, সে যে-রকম জীবন যাপন করে, অল্পবয়সী একটা মেয়ের পক্ষে সেটা নরক।'

'তাই অনুতাপ হচ্ছে আপনার?'

'অনুতাপ কেন হবে? মানে, তোমার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না।'

আবার ফোরম্যান ফিরে তাকালো আমার দিকে। আর বলল, 'ওরকম করবেন না। ব্যাপারটা কী ঘটেছে আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না এমন ভাব করবেন না।'

'কিছু বিশেষ ঘটনার কথা বলছ? এমন কিছু যা…'

প্রাণ খুলে হাসল সে। তারপর বলল, 'যাকগে, ব্যাপারটা হল আমরা একটা সেতু বানাতে এখানে এসেছি আর সেটা প্রায় শেষ ক'রেও এনেছি। একটা সেতু এ-জায়গায় খুবই দরকার আর এমনকি সেই খেয়ানৌকার মাঝিও শেষমেশ এটা বুঝতে পারবে। এখন যদিও সকলেই বিরক্ত হয়ে একেবারে ক্ষেপে আছে। কিন্তু সেই মেয়েটির কথায় ফেরা যাক। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আপনি ওকে চেনেন না, কারণ ও-তো এখানকারই মেয়ে। এক অর্থে, এই সেতুটার জন্যই তো ওসব কাজ তাকে করতে হচ্ছে। কিন্তু কী আছে এতে? বুড়ো লোকটি তো আর বেশিদিন বাঁচবে না, মেয়েটি সাঁগর গ্রাঁদ-এ ফিরে যেতেও পারবে, খুঁজে নিতে পারবে আর কোনো কাজ। এটা মেনে নিতেই হবে আমাদের। বুড়ো মানুষটি ঐ কাজও তো বেশিদিন আর করতে পারত না। আপনার বাবার কথাই ধরুন না কেন — আশি বছর বয়স হল। ভাবুন, এ-বয়সে উনি নদী পারাপার করছেন একটা গাদাবোট ঠেলে!'

অনুবাদ। শ্রাবন্তী ঘোষ

আন দাক

জন্মেছি এই দেশে

এটা কি চান্দ্রমাস? চাঁদের দিক হতে হিসেব করলে বছরের শেষ মাস। আজ তেইশ তারিখ। ক্রমশই এগিয়ে আসছে ড্রাগনের বছর···ক্রমশই। ঠিক এই সময়ে প্রাদেশিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক দিন আমাকে বলল, 'সিও ডুঅকে যাওয়ার ব্যাপারে কী করলে? ওখানকার "সুরক্ষিত এলাকা[১]" তো ধ্বংস হয়ে গেছে। শত্রুর মুঠো থেকে মুক্ত হয়েছে ওখানকার মানুষ। তাদের সংগ্রামের ওপর ভিত্তি ক'রে তোমার একটা গল্প লেখা উচিত। মুক্তির ঠিক পরে এবারের নববর্ষের একটা আলাদা মূল্য আছে। আর হ্যাঁ, এইসঙ্গে নৌকার ঝামেলাটাও মিটিয়ে ফেলতে পারো।'

বললাম, 'ঠিক আছে, আমি যাবো।'

পরের দিনই তৈরি হয়ে নিলাম। মনের ভেতর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে কত আশা আর কল্পনা! সিও ডুঅক তাহলে সত্যিই মুক্ত হল শেষ পর্যন্ত! পুরনো কত পরিচিত মুখের সাথে দেখা হবে আবার। বহু বছর একসাথে লড়াই করার সময় কত মানুষের সাথেই না পরিচিত হয়েছিলাম! কত প্রৌঢ়, তরুণ, যুবক-যুবতী! আগের কত ঘটনা, কত ছবি ভিড় করছে মনের ভেতর। ওখানে পৌঁছে সেইসব স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—শত্রুদেরই কাটা গাছ থেকে কাঠের বোঝা তৈরি ক'রে গল্প করতে করতে সন্ধ্যেবেলা ঘরে ফিরছে চাষীরা। সুরক্ষিত এলাকার চারদিকের মাটির দেয়াল ধ্বসে পড়েছে—ধ্বসে মিশে যাচ্ছে মাটির সাথে। গোছা গোছা কাঁটাতারের জট আর নদীতে দাঁড়ের শব্দ···ছলাৎ···ছলাৎ···! এই ছবিগুলো বাদ দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার সত্যিকারের রূপকে কি এতটুকু বর্ণনা করা যায়? না, কখনোই নয়।

ওহো···হ্যাঁ, সেই নৌকাটার কথা! সেটাও তো এক পুরনো গাথাই বলা যেতে পারে। এই নৌকার ব্যাপারটা নিয়ে মাঝে মাঝেই ভেবেছি আমি

আর দিন। সেই কবে সিও ডুঅকের অধিবাসীদের কাছ থেকে ধার ক'রে নিয়ে এসেছিলাম নৌকাটা। আজ পর্যন্ত সেটাকে ফেরত দেবার সুযোগ পাই নি।

সিও ডুঅকের অবস্থা সে-বছর ছিল বেশ খারাপ। ওই বিশেষ এলাকাতেই ছিলাম আমরা। কিন্তু শত্রুপক্ষ যখন 'গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী' নামে একটা দালাল গোষ্ঠী গড়ে তুলে ভিয়েতকংদের ধরার জন্য যাচ্ছেতাই কাজ-কারবার শুরু ক'রে দিল, তখন আর সেখানে থাকা ঠিক মনে করলাম না। ওই এলাকা ছেড়ে আমরা জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। সাথে ছিল একটা ছোট্ট পুরনো রেডিও, আর একটা পুরনো মিমিওগ্রাফ যা ছাপার কাজে লাগত। খাবার বলতে তখন একমাত্র ভরসা ছিল 'ভপ' ছোট ছোট খালে শামুকের মতো একধরনের প্রাণী-কুলের দেখা মিলত, তা দিয়েই তৈরি হতো এ-খাবার। সারাদিন ধরে রেডিও থেকে পাওয়া খবর নোট করা আর তা ছাপার ব্যবস্থা করা—এ-দু'কাজেই সারাদিন কেটে যেত।

মাস পাঁচ-ছয় পর, অর্থাৎ তখন উনষাটের দ্বাদশ চান্দ্রমাস হবে বোধহয়, খবর এল যে অন্য এক জায়গায় গিয়ে আমাদের একটা প্রকাশনী সংগঠনের কাজ আরম্ভ করতে হবে। আগে থেকে ঠিক-করা এক রাত্রে আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা নৌকা অপেক্ষায় থাকবে নদীর পারে। সুতরাং জিনিসপত্তর যা ছিল, সব নিয়ে কাঁধে ফেলে রওনা দিলাম। জঙ্গলের ভেতর কাদা-জলময় পথ। কোনোমতে হাঁটতে হাঁটতে নদীপারের সেই নির্দিষ্ট জায়গার কাছে এক জঙ্গলের ধারে এসে উপস্থিত হলাম। এরপর অপেক্ষা করা ছাড়া আর কাজ ছিল না তখন। নির্দিষ্ট সময়ের পরেও একঘণ্টা কাটল, কিন্তু নৌকার কোনো হদিশ পাওয়া গেল না তখনো। কাটল আরেক ঘণ্টা, কিন্তু নৌকার আর দেখা নেই। চিন্তায় পড়লাম। কেননা, নদীপথ ছাড়া গন্তব্যস্থলে যাওয়ার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। আর কাজটাও ছিল জরুরী।

সেদিন ছিল চান্দ্রমাস। চান্দ্র নববর্ষের ঠিক আগের রাত। হামাগুড়ি দিয়ে নদীর পারের চারদিকে খোঁজা হল নৌকাটাকে। যদি আমাদের চোখের ভুল হয়ে থাকে, কিন্তু কোথায় নৌকা! অবশেষে দিন বলল, 'নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলায় পড়ে গেছেন আমাদের কমরেড। নৌকাটা যার নিয়ে আসার কথা তার কথাই ভাবছি। অন্যকিছুও ঘটতে পারে…কী জানি! আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক।'

ধীরে ধীরে নেমে আসে কুয়াশা—ঘন আর ঠাণ্ডা। নিস্তব্ধ জনহীন এই স্থানে অন্ধকার এত ঘন যে নিজের হাতও ঠিকমতো দেখা যায় না। খুব ইচ্ছে করছিল সিগারেট খেতে। কিন্তু আগুন জ্বালাবার মতো অবস্থা তখন ছিল না, অন্তত উচিত নয়। এমন কি মশা কামড়ালেও কিছু করার নেই। আমাদের দৃষ্টি শুধু নদীর দিকে।

কিছুক্ষণ পর দিন বলল, 'এলাকার অন্য কারো কাছ থেকে নৌকার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়?' মনে হল, এছাড়া কোনো উপায় নেই। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। দিন কিন্তু সাবধান ক'রে দিল, 'গ্রেপ্তার কিংবা মৃত্যুর সময় এখন নয় কিন্তু!'

হাতে শক্ত ক'রে একটা গ্রেনেড চেপে ধরে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। মনে মনে ভাবছি কার কাছে যাওয়া যায়। প্রথমেই মনে এল ট্যাম কাকার কথা। নিদারুণ সংকটের সময়েও বিপ্লবের প্রতি তার আস্থা আমাকে অবাক করেছিল। সিও ডুঅকে ট্যাম কাকাই একমাত্র লোক যে পুরনো কায়দায় লম্বা চুল রেখেছে। সত্তুরে বুড়ো হলেও এখনো গায়ে যুবকের মতোই শক্তি। তখনো এ-অঞ্চলের নাম সিও ডুঅক হয় নি, তার আগেই এখানে এসে ট্যাম কাকা একটা কুঁড়েঘর বানিয়েছিল। হামেশাই তখন লোকজনের কুঁড়েঘরে ঢুকে পড়ত বুনো শুয়োরের দল। বাঘের উৎপাতও ছিল। আর ছিল এক ধরনের পাখি, যারা সবসময়ে বাঘের পিছু পিছু উড়ে বেড়াতো, আর অদ্ভুতভাবে ডাকত ...বুং...বুং...ক্রোয়া · ক্রোয়া ..। ট্যাম কাকা ছিল এ-অঞ্চলের এক জীবন্ত ইতিহাস। তাছাড়া নির্ভুল শিকারিও ছিল ট্যাম কাকা—গন্ধ শোঁকার এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তার। সকালের নদীর জল শুঁকেই নাকি বলে দিতে পারত রাতের দিকে কোনো শুয়োর বা অন্য কোনো প্রাণী জল খেতে এসেছিল কিনা। ট্যাম কাকার দিকে তাকালেই ভেসে উঠত কয়েকটা পরিচিত ছবি: ঘন জঙ্গল, গরান গাছের বনভূমি, সমুদ্রের ফেনিল সম্ভার আর উর্বরা মাটির বিস্তীর্ণ এলাকা।

নৌকার ঘাটে পৌঁছোতেই একটা বেঁধে-রাখা নৌকা চোখে পড়ল। দাঁড়গুলো সব ঠিকঠাক আছে। ট্যাম কাকার ঘরের দিকে এগোতেই কুকুরের চিৎকার শুনতে পেলাম। তারপর কয়েকটা দ্রুত পায়ের শব্দ আর ট্যাম কাকার গলা: 'কে ওখানে?'

চাপা গলায় উত্তর দিলাম, 'আমি।'

সেই অন্ধকারেই আমাকে জড়িয়ে ধরল ট্যাম কাকা। তার কাছ থেকেই শোনা গেল যে এক দালাল 'গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী' টহল দিচ্ছে। আমি জানালাম আমাদের সমস্যার কথা, আর নৌকাটা ধার চাইলাম। সে রাজি হল এক কথাতেই।

নৌকায় উঠে দেখি যে এমনি দড়িতে নয়, একেবারে লোহার শেকলে বাঁধা। শেকলে টান দিতেই কড় কড় শব্দ তুলে সেটা প্রতিবাদ ক'রে উঠল। সে-মুহূর্তেই শুনতে পেলাম কয়েকটা অস্থির পায়ের শব্দ, আর সাথে সাথে ট্যাম কাকার কাশি। বিপদ বুঝে শেকলটা শক্ত ক'রে ধরে যথাসম্ভব দম বন্ধ ক'রে বসে রইলাম, যাতে নিঃশ্বাসের শব্দও না হয়। বুকের ধুকপুকুনি বেড়ে গেল। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর লোকেরা চলে যেতেই যথাসম্ভব শব্দ না ক'রে শেকলের বাঁধন খুলতে সফল হলাম। তারপর নৌকা দিলাম ভাসিয়ে। দাঁড় বাইতে লাগলাম যেদিকে দিন অপেক্ষা ক'রে আছে সেদিকে।

সেই রাত। দ্বাদশ চান্দ্রমাসের শেষ রাত। নববর্ষের ঠিক আগের রাত। ট্যাম কাকার নৌকা আমাকে আর দিনকে নিয়ে সিও ডুঅকের মাটিকে বিদায় জানালো। মাঝপথে দড়ির দরকার হওয়ায় নৌকার তক্তা তুলে খুঁজতে শুরু করলাম। দড়ির বদলে পেলাম দেশী চালের তৈরি পিঠে আর দু'প্যাকেট ভাল চা। পিঠেগুলো তখনো বেশ গরম থাকায় বোঝা গেল কিছুক্ষণ আগেই তৈরি করা হয়েছে। একটু অবাক হলাম। ট্যাম কাকা কি কোনো আত্মীয়স্বজনকে পাঠাবার জন্য ওগুলো রেখেছিলেন?

সেদিনের পর নৌকাটা আর ফেরত দেওয়া সম্ভব হয় নি। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির কাজ চালাতেই বেশির ভাগ সময় কেটে গেল। অন্যদিকে সিও ডুঅক এলাকা আরো বেশি ক'রে শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল। চারদিকে আরো কয়েকটা ঘাঁটি গড়ল তারা, ফলে পুরো সিও ডুঅক গ্রামকে কেন্দ্র ক'রে বেশ কিছু অঞ্চল শত্রুপক্ষের তথাকথিত 'সুরক্ষিত এলাকায়' পরিণত হল।

তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। এতদিন পর আবার সেই প্রিয় সিও ডুঅকে যাচ্ছি। আর ঘটনাচক্রে সেখানে পৌছলাম নববর্ষের ঠিক আগের দিনেই। পৌছেই দেখি খুশির জোয়ার চারদিকে। নদীপারে গাঁয়ের মেয়েদের বাসনপত্তর ধোয়া, তাদের গাল-গল্প, হাসি-তামাশা—সবকিছুর মধ্যেই এক অনাবিল আনন্দের ছোঁয়া।

ছোট ছোট দলে ছেলেমেয়েরা গান গাইছে, খেলছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গোধূলির শেষ আলোয় কুঁড়েঘরগুলোর ভেঁতরে জাঁতা-কলে চাল গুড়ো করার ব্যস্ততা। ধোঁয়া উঠছে ঘরের চালের ফাঁক দিয়ে, মিশে যাচ্ছে আকাশে। আগেকার মতো কাঁটাতার পড়ে নেই কোথাও। সেগুলো কাজে লাগানো হয়েছে গাঁয়ের চারদিকে বেড়া দিয়ে। পুরনো সেই মাটির দেয়াল ঠিকই আছে। নদীর পারে একটা লেখা চোখে পড়ল : 'আমাদের গ্রামকে রক্ষা করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ'। ভাবলাম, সেই সুরক্ষিত এলাকা আজ একেবারে উলটো প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

রাত নেমে আসছে। রান্নাঘরে উনুনের আগুনের ছায়া নাচছে দেয়ালে। নিশ্চয়ই নবান্ন উৎসবের জন্য দেশী চালের পুলিপিঠে তৈরির কাজ সব ঘরেই প্রায় শেষ।

ঘন অন্ধকার। কিন্তু ট্যাম কাকার সেই ঘা চিনতেট কোনো অসুবিধে হল না। নদীর ধারে সেখানে একটা মাটির পাঁচিল তৈরি করা হয়েছে। সেই পাঁচিলে চারটে ফুটো, যাতে বন্দুক ঢুকিয়ে গুলি চালানো যায়। কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে কিছুটা ফাঁকও আছে। নৌকাটা ঘাটে ভেড়ালাম। লোহার শেকল দিয়ে নৌকাটা বাঁধতে গেলেই কড় কড় শব্দ ক'রে উঠল। তাতে কান দিলাম না। শব্দ শুনে হয়তো ট্যাম কাকা বুঝতে পারবে অতিথি এসেছে, এখন তো বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। এখন স্বাধীনতা, মুক্তি! অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করার মতো পরিপূর্ণ এক বোধ! অন্ধকারে লোহার শেকলের কড় কড় শব্দ যেন এ-ধরনের এক অনুভূতিরই প্রকাশ। আগে যে-রাস্তা ধরে শত্রুপক্ষ টহল দিত, সে-রাস্তা দিয়ে ট্যাম কাকার বাড়ির দিকে এগোচ্ছি। অনুভব করছি স্বাধীনতাবোধের গভীর স্বাদ!

ট্যাম কাকার বদলে প্রথমে দেখা হল হাইকানের সাথে। হাইকান ট্যাম কাকার ছেলে। কয়েকজন গেরিলার সাথে বসে সে রাতের খাওয়া সারছে। পাশেই ওদের বন্দুকগুলো জড়ো ক'রে রাখা।

ঘরে ঢুকতেই আমার দিকে তাকালো সবাই। কিন্তু আমাকে চিনতে পারল না কেউই। হঠাৎ হাইকান চেঁচিয়ে উঠে লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরল আমাকে। তারপর খানিকক্ষণ অবাকদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। অস্ফুটস্বরে বলল, 'আরে বে! তুমি?'

'হ্যা, হাইণ আমি।'

'কত বছর কেটে গেছে, সিও ডুঅক ছেড়ে গেছ তুমি। এতদিন কোথায় ছিলে?'

'অনেক জায়গায়। তোমরা সবাই আছো কেমন? ট্যাম কাকাকে দেখছি না।'

'বাবা…' হাইকানের গলায় কথা আটকে গেল। তারপর হঠাৎ বলল, 'বাবা মারা গেছে।'

আমি একেবারে চুপ, গলায় কথা আটকে গেছে। হাইকান কোনো কথা না বলে হাত ধরে আমাকে বিছানায় বসিয়ে দিল। এতক্ষণে একজন গেরিলা বলল, 'পুরনো দিনের কথা পরে আলোচনা করবেন। এখন কিছু খেয়ে নিন।'

বসার পর সবাইকেই ধীরে ধীরে চিনতে পারলাম। যে-গেরিলা এইমাত্র কথা বলল তার নাম তু তুয়ং। শক্রর গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য ছিল আগে। একবার আমাদের ঘাঁটি আক্রান্ত হওয়ার সময় সে ছিটকে এসে আমার ট্রেঞ্চে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিল, 'খুব সাবধানে থাকুন, নাহলে সামলাতে পারবেন না।' অন্যদেরও ধীরে ধীরে চিনতে পারলাম। এরা সকলে একবার আমাদের মারতে এসেছিল লোক দেখিয়ে। আসলে এরা সকলে তখন খুব ভাল দেহরক্ষীর কাজ করেছে। সেসময় দমনপীড়নের ধাক্কায় সমস্ত গাঁ-ই ধুঁকছিল। কিন্তু এখন এটাই লড়াকু গাঁ বলে বিখ্যাত। সেসময় শক্রপক্ষের মধ্যে আমাদের লুকোনো গেরিলাবাহিনীই এই গাঁ-কে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সিও ডুঅকের দেশী মদ আগের মতোই সরেশ। ওরা এক গ্লাস আমাকে দিল। গ্লাসের তলা হতে উঠে আসা বুদ্বুদের দিকে তাকিয়ে ট্যাম কাকার চিন্তায় ডুবে গেলাম। মনটা খুব খারাপ লাগল তার কথা ভেবে। কী ক'রে তিনি মারা গেলেন, এখনো জানতে পারি নি। কেউ একজন বলল, 'গ্লাসটা আগে শেষ করুন।'

মাঝে মাঝে চুমুক দিয়ে একটু একটু খাচ্ছিলাম। গ্লাস খালি হতেই ওরা আরো ঢেলে দিতে চাইল। আমি বারণ ক'রে বললাম, 'না থাক। এই যথেষ্ট। এবার উঠতে হবে আমাকে।'

'কোথায়? এখন তো টেট উৎসব শুরু হয়েছে। আজ চান্দ্র নববর্ষ। উৎসবের শুরুতে এখন যাবেন কোথায় আপনি?'

হাইকান অনুরোধ করল, 'রাতটা থেকে যাও। তোমাকে সব বলব ধীরে ধীরে।'

মদের পাট একটু পরেই চুকল। খানিক বাদে গেরিলারা তাদের বন্দুক নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরলো। আর হাইকানের বউ কিছু খাবার এনে বলল, 'মহিলা

সমিতির একটা সভা আছে এখন। আমাকে সেখানে যেতে হবে। আগামীকালের কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হবে। খাবারদাবার যা আছে তোমাদের কাছেই রেখে গেলাম। মুক্তিবাহিনীর কেউ এসে পড়লে ভাল ক'রে খাইয়ে দিও। রান্নাঘরেও আরো কিছু খাবার আছে।'

হাইকে তার বাবার কথা জিজ্ঞেস করলাম আবার। বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল সে। তারপর বলতে লাগল ধীরে ধীরে।

'সেই যে-রাতে তুমি নৌকা ধার চাইতে এসেছিলে, সেদিনই বাবা মনে মনে ঠিক ক'রে রেখেছিল যে টেট উৎসবে নতুন বছরের ঠিক আগের রাতেই তোমাদের জন্যে কিছু পিঠে আর চা দিয়ে আসবে। আমার বউ তৈরি করেছিল সে-পিঠে। গরম গরম কিছু পিঠে বাবা নৌকার পাটাতনের নিচে রেখেছিল। সেইসাথে কিছু পাতা-চা। কিন্তু সেদিন প্রায় সবসময়ই প্রতিরক্ষাবাহিনীর টহলদাররা আনাগোনা করছিল, যেজন্য বাবা আর শেষ পর্যন্ত যেতে পারে নি।'

'তাই নাকি!' আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম সে-রাতের কথা। ট্যাম কাকা তাহলে আমাদের জন্যেই ওগুলো রেখেছিল। অস্ফুটস্বরে বললাম, 'পিঠে-গুলো তখনো গরম ছিল। আমাদেরই ভুল হয়েছিল। আজ…আজ…'

'কী?'

'সে-নৌকাটা ফেরত নিয়ে এসেছি।'

হাই কোনো কথা বলল না। খানিক বাদে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো সে। দেখি, চোখের জল আটকাতে তার সজল চোখদু'টো লাল হয়ে উঠেছে। নৌকার কথায় না গিয়ে সে আবার শুরু করল।

'বাবা গতবছর মারা গেছে। ভেড়ার পালের মতো আমাদের সবাইকেই তখন ওই তথাকথিত সুরক্ষিত এলাকায় ঢোকাবার জন্য প্রচণ্ড দমনপীড়ন চলছিল। অবশ্য অত্যাচার যতই চালানো হোক না কেন, ওই এলাকায় যেতে চাইছিল না কেউই। আমাদের বাড়িটা এই এলাকার একেবারে মুখে থাকার ফলে ওদের সৈন্যরা সবসময়েই আমাদের বাড়িতেই আগে ঢুকত। আর বাবা প্রতিবারই ওই এলাকায় না যাওয়ার একটা-না-একটা কারণ দেখিয়ে দিত। আমাদের বলত যে আমরা যদি ভেঙে পড়ি, তবে অন্যরাও ভেঙে পড়তে পারে। আমরা যাচ্ছিলাম না বলে অন্যরাও কেউ যেতে রাজি হল না। ওদের সৈন্যরা প্রতিদিনের এই একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানানিতে বিরক্ত হয়ে উঠল। ওরা যখন প্রথমবার এসেছিল, বাবা বলেছিল, 'সকলের মতো আমিও আমার ভিটেমাটি ছেড়ে কোথাও যেতে চাই না। আমার

জন্মভূমি এটা। এখানে জন্মেছি আমি। কী ক'রে এ-জায়গা ছেড়ে যাবো? জোরাজুরি কোরো না, আমি যাবো না।" পরের বার এসে ওরা ভয় দেখাতে শুরু করল। না গেলে আমাদের ঘরবাড়ি নাকি ভেঙে দেবে! শুনে বাবা আঁখ-কাটার কাস্তেটা ঘরের ঠিক মাঝখানে রেখে বলল, "দেখো, পরিষ্কার বলছি। তোমরা সব আমার ছোট ভায়ের মতো। কিন্তু তোমাদের কারোর যদি আমার ঘরের কোনো একটা জিনিসে হাত দেবার এতটুকু সাহস থাকে তো এগিয়ে এসো। তাকে আমি কুচি কুচি ক'রে কাটব।" ধীর অথচ শক্ত গলায় কথাগুলো বলেছিল বাবা। ছোট ভাই হিসেবে সম্বোধন করতে এতটুকুও অস্বস্তি হয় নি তার। বাবার সে-মূর্তি দেখে সৈন্যদের তখন আর সাহস হল না কিছু করার। ওরা বেরিয়ে গিয়ে পাশের বাড়ি হামলা চালানোর চেষ্টা করল। সাউ নামে একজন বিধবা থাকত ওই বাড়িতে। সে পর্যন্ত রাজি হল না ওদের কথায়। ওরা ভয় দেখাতেই সে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে ঘরের মাঝখানে বসে বলল, "তাহলে আমাদেরও এই ঘরের সঙ্গে পুড়িয়ে দাও।"

যে-সৈন্যটা মশাল হাতে নিয়ে হম্বিতম্বি করছিল, এসব দেখে রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মশালটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। সং ডক এলাকার জেলাপ্রধান অফিসার সব শুনে তো রেগে অগ্নিশর্মা! সিও ডুঅকের তৎকালীন কমাণ্ডারকে তিনি তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত ক'রে দিলেন। আর সে-জায়গায় নিয়োগ করলেন একটা চূড়ান্ত হিংস্র প্রকৃতির লোককে—নাম তার ডম। সে এখানে এসে সব দেখেশুনে বুঝল, আমাদের শায়েস্তা না করতে পারলে তারো ভবিষ্যৎ তথৈবচ।

পরের দিনই একদল সৈন্য নিয়ে সে হামলা করতে এল আমাদের গাঁয়ে। বাবা কিন্তু এই বিছানায় বসেই ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। ডম খুব হিংস্র প্রকৃতির লোক বলে শুনেছিলাম। সেজন্যেই একটা ধারালো কুড়ুল দরজার পাশে লুকিয়ে রেখে বাবার পাশে এসে দাঁড়ালাম। ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম আমরা। প্রথমেই তারা হানা দিল আমাদের ঘরে। উঠোনে পা দিয়েই পিস্তল থেকে একটা গুলি ছুঁড়ল ডম। তারপর চিৎকার ক'রে বলল, "এ-বাড়ির মালিক কে?"

বাবা ধীরগলায় উত্তর দিল, "আমি।"

ভেতরে এল ডম। আমাকে আর বাবাকে আপাদমস্তক ভাল ক'রে দেখে পিস্তল উচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "হুম! তোরাই তো সেই হাড়জ্বালানো আদমি, না? জানিস, আমি কী জন্যে এখানে এসেছি?"

"হ্যাঁ, তবে এক মিনিট অপেক্ষা করো।" এই বলে বাবা আলমারিটার কাছে

এগিয়ে গেল। সহজেই কার্যোদ্ধার হয়েছে ভেবে ডম একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানার ওপর বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "বেশ ভাল! জিনিসপত্তর সব গোছগাছ ক'রে নাও। নৌকা আছে?"

"আছে।"

বাবা কিন্তু জিনিসপত্তর গোছাচ্ছিল না, কিংবা নৌকার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল না। পূর্বপুরুষদের মৃত্যুবার্ষিকীর দিনগুলোতে যে-কালো সিল্কের আলখাল্লাটা পরত, বাবা আলমারি থেকে সেটা বার করল। অত্যন্ত শান্তভাবে সুন্দর ক'রে পরে নিল সেটাকে, প্রত্যেকটা ভাঁজকে ঠিকঠাক ক'রে নিল। আর তার জড়িয়ে-যাওয়া লম্বা চুলগুলো খুলে ছড়িয়ে দিল। সৈন্যরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। কিন্তু বাবার সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে তার কাজ করে যাচ্ছিল সে। সাজসজ্জা শেষ হলে কয়েকটা ধূপকাঠি বের ক'রে আমাকে বলল, "সমাধিবেদির ওপর প্রদীপ জ্বালো।"

চমকে উঠলাম আমি। সারা শরীরে রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ভেতরে ভেতরে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। কিন্তু বাবার কথামতো তার হুকুম তামিল করতে গিয়ে লক্ষ করলাম, আমার হাত কাঁপছে। ধূপ জ্বালিয়ে দু'হাতে নিয়ে বেদির সামনে হাঁটু গেড়ে বসল বাবা। তারপর মন্ত্রোচ্চারণের মতো বলতে লাগল, "হে আমার পূর্বপুরুষ আর বিপ্লবের অমর শহীদ! তোমরা—আমার পূর্বপুরুষ আর বিপ্লবই আমাকে এই জমি দিয়েছ, ঘরবাড়ি দিয়েছ। আর এখন এগুলো আবার কেড়ে নিতে এসেছে শত্রুরা। কিন্তু যতক্ষণ প্রাণ আছে, আমি তা হতে দেব না কিছুতেই। আমি তোমাদের প্রণাম জানাচ্ছি, আর অনুরোধ করছি আমার ভূমিকার সাক্ষী থাকতে..."

"থামা এইসব, শয়তান বুড়ো!"—চেঁচিয়ে উঠল কমাণ্ডার ডম। ঘটনাটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ততক্ষণে কিন্তু বাবা তার কাজ সেরে ফেলেছে। ঘরের কোণে এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ছোরা হাতে তুলে নিল বাবা। তারপর ডমের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে গেল।

"আমার কাজ শেষ হয়েছে। এবার বলো, তোমার কী দরকার?"

ডমের সারা মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে ততক্ষণে। হঠাৎ সে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। বাবার হাতেও তখন উদ্যত ছোরা। আর সৈন্যরাও তৈরি তাদের বন্দুক উঁচিয়ে।

এর পরের দৃশ্য ভাবা যায় না। বাবা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে, আর সে পিস্তল হাতে পিছু হটছে। ঘাবড়ে যাওয়াতে তার হাত কাঁপছিল। হঠাৎ তার পিস্তল

গর্জন ক'রে উঠল। বাবার মুখ বেয়ে রক্তের ধারা! বাবা একহাতে মুখ চেপে টলতে টলতে ডমের দিকে এগোতে লাগল তখনো। হঠাৎ কমাণ্ডার ডম পেছন ফিরে দৌড়তে শুরু করল। আমি কিন্তু তাকে পালাতে দিলাম না। লুকোনো কুড়ুলটা বের ক'রে মুহূর্তের মধ্যে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ছুঁড়লাম। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। একটা বীভৎস চিৎকার ক'রে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।'

এবার হাই কিছুক্ষণের জন্য থামল। কিছুটা মদ ঢেলে নিল তার গ্লাসে। তাড়াতাড়ি সেটা খালি ক'রে বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে দৃঢ় মুখে সে তাকিয়ে রইল অন্ধকারের দিকে। দেয়ালে তার স্থির নিথর ছায়া।

নিচুগলায় বললাম, 'অন্য সৈন্যরা কী করছিল তখন? গুলিটুলি ছোঁড়ে নি?'

মাথা নেড়ে হাই বলল, 'না। আমিও কিছু করি নি ওদের। কুড়ুল ছুঁড়ে মারার পর বাবার দিকে এগিয়ে গেছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ।

সৈন্যদের একজন বাবার মুঠো থেকে ছোরাটা খুলে নিয়ে বলল, "এক্ষুণি পালিয়ে যাও। আমরা বাদবাকি যা করার করব।" অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতেই ওদের আরো দু'জন এগিয়ে এসে বলল, "শীগগির এখান থেকে পালাও।" তারপর ওরা বাবাকে তুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল। আরেকজন কুড়ুলটা বাবার পাশে রাখল। ওদের বুদ্ধিটা বুঝতে পেরে গেছি ততক্ষণে। বাধ্য হয়েই ছোরাটা হাতে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলাম। পিছনে শুনলাম সৈন্যদের চিৎকার: "নচ্ছার বুড়োটা কমাণ্ডারকে খুন করেছে" ইত্যাদি।

মাসখানেক বাদে ধরা পড়েছিলাম। কিন্তু সেই সৈন্যরা ছাড়া আর কেউ-ই জানতে পারে নি যে আমিই কমাণ্ডারকে কোতল করেছিলাম। কিছুদিন বাদে ছাড়া পেলাম। ফিরে এসে দেখি পুরো গাঁকেই কাঁটাতারের বেড়াজাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর আর কেউই নিজেদের ঘর ছেড়ে যেতে রাজি না হওয়ায়, কাঁটাতার দিয়ে সমস্ত গাঁকেই ঘিরে আরেকটা তথাকথিত "সুরক্ষিত-এলাকা" হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রায় পুরো বছরখানেক লড়াই চলল। মাঝে মাঝেই প্রায় পুরো এক কোম্পানি সৈন্য আসত আমাদের দমন করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত...'

একটু থামল হাইকান। বলল 'তুমি কি জানো আমরা কীভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছি ওদের ওই সুরক্ষিত এলাকা?'

'কিছুটা শুনেছি। পুরোটা জানি না।'

হাইকান মৃদু হেসে বলল, 'কায়দাটা একেবারে অন্য ধাঁচের। স্পষ্ট দিনের

আলোতেই আমরা জয়লাভ করেছি।'

'স্পষ্ট দিনের আলোয়!' আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি।

'হ্যাঁ, স্পষ্ট দিনের আলোয়। আর সেজন্যেই তো আমরা অনেক বেশি খুশি। অন্য কোনোভাবেই আমাদের পুরো শক্তিকে কাজে লাগানো যেত না।'

'পুরো শক্তি?'

'হ্যাঁ, মুক্তিফৌজের কথাই বলছি। নিশ্চয়ই জানো যে এই ধরনের তথাকথিত সুরক্ষিত এলাকাগুলোকে গুড়িয়ে দিতে হলে তার পাশের ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করতে হবেই। ফলে এ-ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যে আমরা আঞ্চলিক মুক্তি-ফৌজকে খবর দিয়ে অনুরোধ জানালাম। কিন্তু সবথেকে শক্ত কাজ ছিল ওই এলাকায় মুক্তিসেনাদের লুকিয়ে রাখার কাজটা।'

'লুকিয়ে রাখার?'

'অবাক হচ্ছো? কিন্তু আসলে কাজটা খুব শক্ত ছিল না। যেসব বাড়িতে আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, তারা সবাই প্রায় এক কথাতেই রাজি হয়েছিল। আমাদের তারা বলেছিল, "ওদের সব একেবারে শেষ করতে হবে। নাহলে অত্যা-চার আরো বাড়বে।" আমরা সেকথা স্বীকার করলাম। ওরা আরো বলল, "মুক্তিফৌজের সৈন্যদের ঘরে লুকিয়ে রাখতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই।" মুক্তিসেনারা শত্রুপক্ষকে নিকেশ করার সাথে সাথেই আমরা ওই তথাকথিত সুরক্ষিত এলাকা গুড়িয়ে দেব—পরিকল্পনাটা ছিল এই রকম। সেদিন রাতেই মুক্তি-সেনারা তথাকথিত সুরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নিল। পরদিন সকালে শত্রুসেনারা ঘাঁটি ছেড়ে যখন এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে হালকাভাবে টহল দিচ্ছিল, সেই মোক্ষম সময়ে মুক্তিসেনারা কুঁড়েঘরগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে অতর্কিতে ওদের ওপর আক্রমণ চালালো। একেবারে শত্রুদের সবাইকেই নিকেশ করা হল। গাঁয়ের আঁকাবাঁকা পথে, খানা খন্দে একেবারে মশা-মাছি মারার মতো ওদের শেষ করা হল। একজনও নিজেদের ঘাঁটিতে পালাবার সময় পায় নি। যে-কজন কোনো রকমে বাঁচতে পেরেছিল, তারা একেবারে সরাসরি আমাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করল। এরপর ওদের ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করতে খুব বেশী বেগ পেতে হয় নি। সুরক্ষিত এলাকা থেকে গেল আগের মতোই, তবে এখন সেটা উলটো প্রয়োজন মেটায়।'

হাইকান আবার চুপ। অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন কানে ভেসে এল শত্রুপক্ষের জাহাটে সৈন্যদের আর্ত চিৎকার আর ট্যাম কাকার দৃঢ় উত্তেজিত কণ্ঠস্বর:

"হে আমার পূর্বপুরুষ, আর বিপ্লবের অমর শহীদ..."

উঠে দাঁড়ালাম। পায়ের তলার মাটি যেন একটু উষ্ণ। মনে হল যেন মাটি অল্প অল্প কাঁপছে আর চারপাশে চাপ চাপ রক্ত।

সম্বিত ফিরলে পাশে হাইকানকে দেখতে পেলাম না। হাঁটু গেড়ে সে বসে আছে সমাধিবেদির সামনে, ঠিক যেখানে তার বাবা সেদিন বসেছিল।

ধূপের গন্ধ-ভরা আকাশ বাতাস! নতুন বছর আসছে। নববর্ষ। নতুন চান্দ্রবর্ষ।

অনুবাদ ॥ সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়

১. 'সুরক্ষিত এলাকা' হল এক বিশেষ ধরনের অত্যাচার-শিবির। মার্কিন সরকার নামকরণ করেছিল : স্ট্রাটেজিক হ্যামলেট।

মি গ জে নি

নিষিদ্ধ ফল

বয়স তিরিশ। বেকার। সিনেমার বিজ্ঞাপনের সামনে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু আজ তা বলে ছুটির দিন নয়। থুঃ! হ্যাঁ, থুতু ছেটাও, ওটার ওপর, স্রেফ থুতু ছেটাও! লোকটা ঘাড় ফেরালো, কে যেন ডাকছে বলে মনে হল। কিন্তু কই! কেউ ডাকে নি। কেউই ওর সাহায্য চায় না। অগত্যা সেই ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন দেখে বেড়ানোই সার। প্রতিদিনই তো এই রুটিন। 'মাইরি, সিনেমার লোকগুলো খাসা আছে!' বিজ্ঞাপনটাকে এবার আরো খুঁটিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল। লোকটা বিজ্ঞাপনটার কাছে এগিয়ে আসে। সেই চিরাচরিত দৃশ্য —একটি লাবণ্যময়ী যুবতী আর তার পাশে এক সুদর্শন যুবক। বেকার মজুরের চোখদু'টো হিংসায় জ্বলে। সিনেমার নায়কের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা অনুভব করে। একটা বাঁকা চাউনি হানে এই প্রতিমূর্তির উদ্দেশ্যে। তারপর থুতু ফেলতে গিয়ে চোখ পড়ে নিজের জুতোর ওপর। এ দু'টোকে যে কী নামে ডাকা উচিত তা ও নিজেও জানে না—খাস্তা শু-জুতো বলবে, না লাখো-তাপ্পিমারা চটি? নিচু হয়ে খাস্তা জুতো ওরফে চটিজোড়ার ওপর এক টুকরো দড়ি পাকিয়ে নেয়। খাড়া হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে মুখ ফুটে হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাতর দীর্ঘশ্বাস—'উঃ!' আবার হাঁটতে শুরু করে। ফুটপাত দিয়েই অবশ্য। আর এই ফুটপাত ধরেই তো কত লোক স্রেফ বাধ্য হয়েই খালি পায়ে হাঁটছে। কাজেই অত দুশ্চিন্তার কারণ নেই।

আর পাঁচজন বেকার শ্রমিকের মতোই ও এলোমেলোভাবে মন্থর গতিতে এগোচ্ছে। কত লোকই তো পথ দিয়ে হাঁটছে, কিন্তু কেউ এমন নিশ্চিন্ত নয়, সবাই উদ্বিগ্ন। একজন নিষ্কর্মা ভদ্দরলোকের মতো নিশ্চিন্ত হতে পারা ভারি সুন্দর নয় কি? না, না, এ আমি কী বলছি? সত্যিই কি দুলকি চালে হাঁটি হাঁটি পা পা ক'রে পথ চলাটা খুব সুন্দর কিছু? না এবং হ্যাঁ! হ্যাঁ এবং না! দুই-ই সম্ভব। মানুষটা যদি ভদ্দরলোক হয় তো তেনার পক্ষে হেলে দুলে পথ চলাটা শোভন তো বটেই! তাঁর খাদ্য পরিপাকের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু একজন ব্যস্ত শ্রমিকের বেলায় তা

হবার নয়। আপনি আবার কারণ জিজ্ঞেস করছেন কেন? সবই তো জানেন। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ করেছেন কি? আমাদের গল্পের শ্রমিকটি কিন্তু যে-কে সেই ধীরে ধীরেই হাঁটছে। ঠিক এক নিষ্কর্মা ভদ্দরলোকেরই মতো। কী-ই বা আর করবে! যা দিনকাল পড়েছে, তাতে যে দুনিয়ায় টিঁকে আছে এখনো—এটাই যথেষ্ট। পছন্দ হোক বা না হোক, যার যা কাজ করতেই হবে। এই শ্রমিকটিও তো আর যেচে একজন ভদ্দরলোকের নকল করছে না। কিন্তু ওই যে বললাম—যা দিনকাল পড়েছে, উপায় কী! এমন নিষ্কর্মার মতো জীবন যাপন করা ও আদপেই সমর্থন করে না। যারা এভাবে জীবন কাটায় তাদের ও সত্যিই ঘৃণার চোখে দেখে।

ঢং ঢং ঢং ঢং! বিকেল চারটে। পেটের মধ্যে একটা যন্ত্রণাদায়ক কাঁপুনি। পবিত্র গির্জা থেকে ভেসে-আসা ঘণ্টার চারটে শব্দ অপবিত্র পেটের মধ্যে চারবার প্রতিধ্বনি তোলে। চার! চার! চার! চার! চতুর্দিকে চার! চার কেন? কেন, কেন? একটা তুমুল আলোড়ন! একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা! এ যেন একটা বিদ্রোহ, একটা বিপ্লবের মহড়া, কান-ফাটানো গোলা ছোঁড়ার আওয়াজ। কামান থেকে গোলা ছুটছে নাকি? উঁহু, ছুটছে ক্ষুধার্ত পেটের ভেতর থেকে।

শ্রমিকটি আমাদেরই সহরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। যেমন এগিয়ে চলে বার্লিন বা লণ্ডনে ওর অন্যান্য শ্রমিক ভাইরা। আশ্চর্য, এমন একটা মালবোঝাই গাড়ি নেই যে ও সেটাকে খালাস করবে। এমন একজন যাত্রী নেই যে ও তার বিছানাপত্র বয়ে নিয়ে যাবে। কোথাও নেই! কোথাও নেই! কেউ ওকে কপালের ঘাম ঝরাতে ডাকছে না। দু-চারটে পয়সা রোজগারের সম্ভাবনাও আজ সুদূরপরাহত।

লোকটি দোকানটির সামনে এসে দাঁড়ায়। যতই দোকানের জানালাগুলো দেখে ততই এ-কালের প্রাচুর্যের তারিফ করে। বইয়ের দোকানের জানালাটায় আবার শিল্পীদের ছবি! এবার ও দাঁত খিঁচোয়। রাগের মাথায় একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে মুঠো পাকিয়ে উঁচু করে—কিন্তু আইন! পুলিশ! পাঁচমিশেলী চিন্তা মাথায় ভিড় করে। শিল্পীদের রেহাই দেয় না। অবজ্ঞাভরে ওদের গায়ে থুতু ছিটিয়ে এগিয়ে যায়। তারপর আবার থুতু ছিটোয়। ডান-বাঁ দেখে নিয়ে থুতু ছিটোয়। ফের থুতু ছিটোয়। নিষিদ্ধ ফলে-ভরা দোকানগুলো সব পেরিয়ে শতচ্ছিন্ন বেশধারী ক্ষুধার্ত মানুষটা এগিয়ে চলে।

এবার ও একটা তাগিদ অনুভব করছে। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিতে

হয়। নিরাপত্তা রক্ষার কথা ভেবে হাতদু'টোকে একত্র ক'রে পিঠের দিকে সরিয়ে আনে। এই হাতদু'টোর ক্ষমতা অসীম। স্বয়ং শয়তানকেও টুঁটি টিপে খতম ক'রে দিতে পারে। আসলে আইন আছে বলেই শয়তানরা রক্ষা পাচ্ছে, রক্ষা পাচ্ছে বদমাইশের দল।

ঢং ঢং ঢং ঢং!

বেশিদিন আর এরকম সহ্য করা সম্ভব নয়।

অনুবাদ॥ সিদ্ধার্থ ঘোষ

শি য়া ং ফে ই

জাইলোফোনের ঝংকার

নালি গ্রামে মার্কিনী বোমাবর্ষণের ঠিক পরেই সমস্ত গ্রামবাসীরা আত্মরক্ষার জন্য গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিল। কেবলমাত্র ফুটোপান এবং তার ভাইপো গ্রাম ছেড়ে যায় নি। পাড়াপড়শি, আত্মীয়স্বজনেরা বার বার তাদের সেই জঙ্গলে, যেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে, যাওয়ার জন্য বুঝিয়েছিল, সমস্ত রকম সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তবুও এই বৃদ্ধ রাজি হল না। বরং সে সবাইকে বুঝিয়েছিল, 'আমি বুড়ো হয়েছি, তার ওপর চোখে দেখি না। এই গ্রামের মধ্যে দিয়েই নদী বয়ে গেছে, আর আমার শাকশবজির বাগানটাও এখানেই। ভাইপো আশং মাছ এবং কাঁকড়া ধরতে পারে, বাগান থেকে তরিতরকারিও তুলতে পারে। আমরা গ্রামে থেকেই কোনোরকমে চালিয়ে নেব। আমার একমাত্র ছেলে মুক্তি-বাহিনীতে যোগ দিয়ে এখন রণাঙ্গনেই আছে। আমি আমার দেশের মানুষের ঘাড়ে বোঝা হয়ে তাদের কাজকর্মের ক্ষতি করতে চাই না। বরং আমারো কিছু করা উচিত, সেটা যত ছোটই হোক না কেন। যতক্ষণ সেটা আমার দেশের এবং প্রতিরোধ-যুদ্ধের কাজে লাগবে ততক্ষণ আমাকে তা করতেই হবে।' এসব কারণেই সে জঙ্গলে আশ্রয় নিতে রাজি হয় নি।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় গেরিলা বাহিনীর নেতা নিজেই তার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বললেন, 'ফু খুড়ো, যদিও আমাদের গ্রামটি মুক্তাঞ্চলে, কিন্তু শত্রু-অধিকৃত অঞ্চলের ঠিক পাশেই এর অবস্থান। ফলে যেকোনো সময় লোক জোগাড়ের জন্য শত্রুরা গ্রামে হানা দিতে পারে। গ্রামের মানুষ এবং গেরিলাদের থেকে এতদূরে তুমি একা থাকবে, এটা ভেবে আমার খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

গেরিলা-নেতার কথাগুলো ফুটোপানের খুব খাঁটি বলেই মনে হল। কারণ একটা প্রধান রাস্তার ঠিক পাশেই নালি গ্রাম, এবং শত্রুরা খুব সহজেই এখানে হামলা করতে পারবে। 'তাইতো! এভাবে শত্রুর হাতের কাছে থাকাটা কি ঠিক হবে? এই দুঃখ-কষ্ট এবং অপমানের কথা আমি আর সাহস ক'রে

ভাবতে পারছি না!' শত্রুদের এই অত্যাচারের কথা ভাবতেই ফুটোপান শিউরে উঠল। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে একবার তার দুই ভুরুর মাঝখানে কাটা দাগটার ওপর আঙুল বোলালো। তাঁবেদার-বাহিনীর এক দালাল-আমলা এই ক্ষতটার জন্ম দায়ী। জীবনেও সে এই ক্ষতটার কথা ভুলতে পারবে না। সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়লেই ফুটোপানের বুকে আগুন জ্বলে ওঠে।

ফিরে যাওয়ার আগে গেরিলা-বাহিনীর নেতা বললেন, 'অপ্রত্যাশিতভাবে যদি কিছু ঘটে যায়, তাহলে আমাদের প্রিয় "ড্রাগন নৌকার বাইচ" গানটি তোমার জাইলোফোনে বাজিও। তাহলেই আমরা চটপট চলে আসব। ভুলে যেও না কিন্তু!'

সেদিন গভীর রাতে, নালি গ্রামে নেমে এসেছে অস্বাভাবিক এক নীরব শান্ত পরিস্থিতি। দূরের জঙ্গল থেকে মাঝে মাঝে থন-ডক পাখির ডাক ভেসে আসছে। পাহাড়ী গ্রামটি রাত্রির সীমাহীন অন্ধকারে ডুবে আছে। একা একা চুপচাপ বসে ফুটোপান মাঝে মাঝে শিরা-ওঠা হাতে জাইলোফোনের গায়ে হাত বোলাচ্ছিল। তার মনের মধ্যে গেঁথে-থাকা সেই পুরনো ঘটনাটি আজ আবার তার মনের মধ্যে ঝড় তুলেছে।

তের বছর আগে কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে কাজ পেয়ে ফুটোপান বউ এবং একমাত্র ছেলেকে ঘরে রেখে কাজ করতে সহরে এসেছিল। কিন্তু যখন তার কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে এল, তখন তাকে বলা হল, সে যেহেতু ভাল জাইলোফোন বাজাতে পারে, অতএব তাকে বাজনা শোনাবার জন্য আরো কয়েক-দিন থেকে যেতে হবে। যখনই তাঁবেদার-সরকারের আমলারা ফুর্তি করবার জন্য সেখানে আসত, তখনই ফুটোপানকে জাইলোফোনে বাজাতে হতো নানারকম বাজনা—ঐতিহ্যময় লোকগীতি থেকে শুরু ক'রে উত্তেজনাময় নাচের বাজনা পর্যন্ত। হঠাৎ একদিন তাদের গ্রামের একজনের মুখে সে খবর পেল যে তার বউ মারাত্মক অসুস্থ। ফুটোপান অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তক্ষুণি কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে বলল, 'ধর্মাবতার, বাড়িতে আমার বউ অত্যন্ত অসুস্থ। সে প্রায় মরতে বসেছে। দয়া ক'রে আমার মাইনের কিছু টাকা দিয়ে আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন, যাতে আমি তার জন্য কিছু ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে পারি। আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসব।'

কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট উদ্বেগের ভান ক'রে বলল, 'ইস! কী দুর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই

তুমি বাড়ি যাবে। তোমার বউয়ের দেখাশোনা করার জন্য কিছু টাকাও তোমাকে দেওয়া হবে। তোমার বউয়ের জন্য সত্যিই দারুণ চিন্তা হচ্ছে।'

'আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব, আপনি মহানুভব!' ফুটোপানকে অত্যন্ত আনন্দিত মনে হল। জিনিসপত্র গোছগাছ করার জন্য বেরিয়ে যাবে, এমন সময় হাত তুলে কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে এখানে একটা খানাপিনার আয়োজন করা হয়েছে। সাভানাকোট থেকে এই প্রথম আমার বাড়িতে কয়েকজন মার্কিন অফিসার আসবেন। আজ তো তোমার যাওয়া হবে না!'

কথাগুলো বলে ফুটোপানের দিকে না তাকিয়েই সে বেরিয়ে গেল। একটু আগেই ফুটোপানের মনের মধ্যে যে-আশার ঢেউ জেগেছিল, তা বুদ্বুদের মতোই মিলিয়ে গেল। ফুটোপানের সারা দেহ কাঁপতে লাগল, দুই চোখ বেয়ে ঝরঝর ক'রে জল পড়তে লাগল।

সন্ধ্যেবেলায় উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো মোহময় আলোর নিচে সাদা কাপড়ে ঢাকা টেবিলগুলোর ওপর নামীদামী সব মদের বোতল এবং খাবারের প্লেট সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ধবধবে পোশাক পরে পরিচারকেরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে খাটা-খাটি করছিল। কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট ফ্যাকাসে মুখে পিছনে হাত রেখে ইতস্তত পায়চারি করছিল আর থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠছিল, 'আমেরিকান অফিসারেরা এখুনি এসে পড়বেন, অথচ জাইলোফোন-বাদক আর নর্তকীদের এখনো পর্যন্ত পাত্তাই নেই! এই অপদার্থরা! এখানে দাঁড়িয়ে তোরা কী করছিস? দেখ ওদের কী হল?'

একজন প্রহরী উত্তর দিল, 'ধর্মাবতার, আমাদের যে জাইলোফোন বাজায়, দুপুরের পর থেকে সে একদানা খাবার বা এক ফোঁটা জলও মুখে তোলে নি। সারাদিন বিছানায় শুয়ে আছে। অসুখ হয়েছে বোধহয়!'

'কক্ষণো নয়! মিথ্যে কথা! ওই শয়তানটা অসুখের ভান করছে। যা, এক্ষুণি ব্যাটাকে এখানে ধরে নিয়ে আয়।'

দু'জন সশস্ত্র প্রহরী ফুটোপানকে টানতে টানতে ধরে নিয়ে এল। কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট ওকে দেখেই রাগে চিৎকার ক'রে উঠল, 'এক্ষুণি বাজনা শুরু করো! পরে বাড়ি যাবে।'

'ধর্মাবতার, আমি অসুস্থ। শরীরে একটুও জোর পাচ্ছি না। বসে থাকতে পর্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। সত্যিই আজ আমি বাজাতে পারব না।'

কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট দাঁতে দাঁত চেপে খেঁকিয়ে উঠল, 'জ্যান্ত অবস্থায় বউ-বাচ্চাকে দেখতে বাড়ি যেতে চাও, না এখানেই মরতে চাও?'

'ধর্মাবতার, আমি এত দুর্বল যে জাইলোফোন বাজাতে পারব না।'

কাউন্টি ম্যাজিস্ট্রেট তার উত্তরে টেবিলের ওপর থেকে একটা বাটি তুলে নিয়ে ফুটোপানের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল। বাটিটা ফুটোপানের কপালে লাগতেই আর্তনাদ ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে, রক্তে ভেসে গেল তার সারা শরীর।

কয়েকদিন পর নিস্তেজ ও অন্ধ ফুটোপান অন্যের সাহায্যে ফিরে এসেছে আবার নালি গ্রামে। সে পৌঁছানোর একটু আগেই তার বউ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। চোখের জল মুছে হাতড়াতে হাতড়াতে সে এসে দাঁড়ালো তার বউয়ের বিছানার পাশে। শেষবারের মতো রুক্ষ হাতটা দিয়ে কোমল নিথর মুখে হাত বোলালো। বউয়ের শোক তার কপালের যন্ত্রণাকে আরো হাজারগুণ বাড়িয়ে তুলল। সে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, 'হায় রে হতভাগিনী! কে আমাদের সুখের সংসারে আগুন লাগালো?' প্রচণ্ড শোকে সে জ্ঞান হারালো। মা'র বিছানার পাশে তার ছেলেটা এতক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসেছিল। সে ছুটে গিয়ে তাকে ধরল। সমস্ত শক্তি দিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগল, কিন্তু ফুটোপানের জ্ঞান ফিরল না। দুঃসংবাদ শুনেই প্রতিবেশীরা ছুটে এল, প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ফুটোপানের জ্ঞান ফিরল।

তারপর থেকে ফুটোপান যেন অন্য মানুষ। কথা প্রায় বলে না বললেই চলে। বউয়ের প্রতি যে-ভালোবাসা ছিল, এখন তার সতের বছরের ছেলে তাওকানই তার সমস্তটা পাচ্ছে। সে তার বাবার মতোই কর্মঠ এবং চালাকচতুর। প্রত্যেক দিনই হয় সে পাহাড়ের উপর শিকার করতে যেত অথবা ঘরের কাজ করত।

একদিন তাওকানের মনটা ভাল ছিল না, বসে বসে মা'র কথা ভাবছিল। তার বাবা তাকে বিভিন্নভাবে আনন্দ দিতে চাইছিল, কিন্তু পারছিল না। অবশেষে তাওকান বাবাকে একটা গান বাজাতে বলল। হঠাৎ ফুটোপানের মনে পড়ে গেল যে, ঘরের কোণে জাইলোফোনটা আছে। ব্যাপারটা সে বেশ কিছুদিনের জন্য ভুলেই গেছিল। সে এটাকে সারাজীবনের মতোই ভুলে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে তার ছেলেকে হতাশ করতে চাইল না। সে বাজাতে শুরু করল। জাইলোফোনের কাঠের দণ্ডগুলোর ওপর আস্তে আস্তে

ফুটোপান হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করতে লাগল। বাতাসে ঝংকার তুলল একটা মিষ্টি সুর, কখনো খুব ধীর এবং শান্ত, আবার কখনো বা ক্রুদ্ধ সাগরের ঢেউয়ের মতো গর্জমান। তাওকান সুরের তালে তালে কখনো শান্ত, কখনো বা উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মুখে প্রফুল্লতা ফিরে এল। তাওকান পুলকিত হয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, 'চমৎকার সুর! এ-সুরের নাম কী?'

'এর নাম "ড্রাগন নৌকার বাইচ"।'

'এটা আরেকবার বাজাও না বাবা!'

মনের সমস্ত আবেগ দিয়ে ফুটোপান আবার বাজাতে শুরু করল। জাইলোফোনের ঝংকার বাতাসে বাতাসে প্রতিধ্বনি তুলে প্রতিবেশীদের কানে গিয়ে পৌঁছল। তাওকান নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে শুনছিল। তার মনে হল, তার চোখের সামনে দিয়ে যেন বয়ে যাচ্ছে মেকঙ নদীর স্বচ্ছ জলধারা।

ফুটোপান বাজনা থামিয়ে মাথা তুলতেই অবাক হয়ে গেল। তার ঘরের দরজার সামনে অনেক মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাওকান ফিসফিস ক'রে বলল, 'বাবা, আমাদের প্রতিবেশীরা তোমার বাজনা শুনতে এসেছে।'

ফুটোপান বাইরে বেরিয়ে এল। বলল, 'বুঝলে, আমি বহুদিন জাইলোফোন বাজাই নি। আজ মা'র জন্য তাওকানের মন খুব খারাপ, তাই ওকে একটু বাজনা শোনাচ্ছিলাম।'

প্রতিবেশীরা উৎফুল্লকণ্ঠে বলল, 'খুড়ো, তুমি যে-বাজনাটা বাজাচ্ছিলে, সেটা আমাদের খুব প্রিয়। মাঝে মাঝে ওটা বাজিও, আমরা শুনব।'

একদিন মাঠ থেকে ফিরে এসে ফুটোপান খেতে বসেছে, এমন সময় তাওকান নিচুস্বরে বলল, 'বাবা, বোফা ভাই গাঁয়ে ফিরেছে। সে এখন লাওস মুক্তি ফ্রন্টের কর্মী।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ বাবা, আমরা সপ্তাহখানেক ধরে তার কাছে পাহাড়ের ওপর গেরিলাযুদ্ধ শিখছি।' ফুটোপান বাটিটা নামিয়ে রাখল, তারপর মাথা তুলে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'ওরা ফিরে এসেছে!'

'বাবা, আজ সন্ধ্যেয় আস্তে আস্তে জাইলোফোনটা বাজিও। অনেক লোক তাহলে তোমার বাজনা শুনতে আসবে। বোফা তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায়।' তারপর তাওকান ওর বাবাকে ফিসফিস ক'রে কিছু বলতেই ফুটোপান সব বুঝতে

পারল, একটু হেসে সে সমর্থনসূচক মাথা নাড়ল।

ফুটোপানের বাড়িতে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বোফার কথাবার্তাগুলো নালি এবং পাশের অন্যান্য গ্রামে বিপ্লবী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করল। প্রচণ্ড খরার পর একরাশ বৃষ্টির মতোই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং খুন, সরকারি সৈন্য-বাহিনীর জন্য জোর ক'রে লোকসংগ্রহ, বেগার খাটা প্রভৃতির বিরুদ্ধে তারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলল। তাঁবেদার সরকারকে খাজনা, অর্থ, ফসল, মুরগি বা শুয়োর প্রভৃতি দিতে অস্বীকার করল। কিছুদিনের মধ্যেই অনেক গ্রামে বিপ্লবী সরকার এবং গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠল। তাওকান নালি গ্রামের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিল। তারপর সে অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে গেল গেরিলাযুদ্ধে অংশ নিতে। তাওকান চলে যাওয়ার পর থেকেই ফুটোপানের তের বছরের ভাইপো আশং তার কাছেই থাকে। তার মা-বাবা শত্রুর আক্রমণে নিহত হয়েছিল।

একদিন ওরা গল্প করছে, এমন সময় তাঁবেদার সরকারের দু'জন সৈন্য জল খাবার জন্য ওদের বাড়িতে এল। ফুটোপান প্রথমে ভাবল, ওদের কিচ্ছু দেবে না। কিন্তু সে তার মত পরিবর্তন করল। ভাবল, সুযোগ পেলে কেন সে তা কাজে লাগাবে না! এদের সঙ্গে গল্প করলে এদের মুখ থেকে কিছু খবর পেলেও পাওয়া যেতে পারে! সে আশংকে ডেকে ওদের জল দিতে বলল।

'আপনারা সৈন্যবাহিনীতে কতদিন আছেন?' ফুটোপান তাদের সঙ্গে গল্প শুরু করল।

'ছ'মাস আগে জোর ক'রে আমাদের সৈন্যদলে ঢোকানো হয়েছে।'

'তাহলে বাড়ি ফিরবেন কবে?'

'জানি না, বোধ হয় জঙ্গলেই মরে পড়ে থাকতে হবে!'

ওদের মধ্যে কমবয়সীটি বলল, 'খুড়ো, আপনি খবর পান নি যে মুক্তিবাহিনী লাংগানতা এলাকায় সরকারি বাহিনীকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়েছে? এখানে আমরা অল্প কয়েকশো লোক আছি। আমার মনে হচ্ছে খুব শীগগির এ-জায়গা ছেড়ে সরে না পড়লে কাউকেই আর বাঁচতে হবে না।'

কথাটা শুনে ফুটোপান মনে মনে খুবই খুশি হল। আবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথা থেকে আসছেন আপনারা?'

'লুয়াংপ্রবাং এলাকার লোহান গ্রাম থেকে।'

'সত্যি, ওটা চমৎকার জায়গা!' ফুটোপান মন্তব্য করল।

'আপনি ওখানে ছিলেন নাকি?' দ্বিতীয় তাঁবেদার সৈন্যটি প্রায় চিৎকার ক'রে উঠল।

'হ্যাঁ, তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম। একটা ভ্রাম্যমাণ দলে জাইলোফোন বাজাতাম। একবার ওধার দিয়ে যাওয়ার সময় ওখানে তিনদিন ছিলাম।'

'আপনি জাইলোফোন বাজান? চমৎকার! আমাদের একটু শোনাবেন?', তাদের মধ্যে একজন অনুরোধ করল। ফুটোপান একটু ভেবে বলল, 'দিনের বেলা আমাকে কাজ করতে হয়। যদি আপনারা বাজানা শুনতে চান, সন্ধ্যেবেলায় আসবেন, আপনাদের বন্ধুদেরও আনবেন, আমি সবাইকেই বাজনা শোনাবো।'

সন্ধ্যের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় কুড়িজন তাঁবেদার সৈন্য তার বাজনা শুনতে এল। ফুটোপান প্রথমে তাদের একটা লোকগীতির সুর শোনালো। শুনে সবাই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। ফুটোপান বলল, 'আমি এবার লুয়াংপ্রবাং অঞ্চলের লোকগীতি "কাটুন" বাজাবো। আপনাদের মধ্যে যারা গান গাইতে পারেন, তারা দয়া ক'রে আমার বাজনার সাথে গলা মেলান।'

'বেশ বেশ!'—তাঁবেদার সৈন্যরা খুশি হয়ে সমর্থন জানালো।

'কাটুন'-এর ছন্দময় এবং বলিষ্ঠ সুরের মধ্যে দিয়ে তাদের প্রিয় ভূমি যেন ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সুরের মূর্ছনায় প্লাবিত হয়ে গেল তাদের হৃদয়। দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠছে মন, অনেক দূর থেকে তারা যেন ফিরে গেছে তাদের প্রিয়জনের মধ্যে…।

বাজনা থেমে গেছে। কিন্তু তাঁবেদার সৈন্যরা চুপচাপ বসে আছে তখনো। অন্য সময় তারা যেমন হৈ-হুল্লোড় করে, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। কিছুক্ষণ পর স্বপ্নোত্থিতের মতো একজন চিৎকার ক'রে উঠল, 'হায়রে! কবে যে আবার বাড়ি ফিরতে পারব!'

অনেক রাত্রে ফুটোপানকে বিদায় জানিয়ে দুঃখভরা হৃদয়ে তারা ব্যারাকে ফিরে গেল।

কিছুদিন পরেই এদের মধ্যে অনেকেই তাঁবেদার বাহিনী ছেড়ে পালিয়ে গেল। খবরটা শুনে ফুটোপান খুব খুশি। আশংকে বলল, 'আমরাও তাহলে প্রতিরোধ যুদ্ধে কিছুটা সাহায্য করতে পারছি!'

একদিন গভীর রাতে ফুটোপান ঘুমোতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ কুকুরের ক্রমাগত ডাক শুনতে পেল। তার বাড়ির চারপাশে বেশ কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ। তারপর হিংস্রকণ্ঠে একজন খেঁকিয়ে উঠল, 'এই এ-বাড়িতে ক'জন

লোক থাকে ?' গলার আওয়াজ শুনেই ফুটোপান বুঝতে পারল যে শত্রুবাহিনী লুটপাট করতে এসেছে। সে ধীরে ধীরে দরজা খুলে উত্তর দিল, 'আমি অন্ধ মানুষ, একাই থাকি এখানে।'

'অন্য সবাই কোথায় ?'

'ওরা জঙ্গলে চলে গেছে।'

'এই বুড়ো, ওখানে আমাদের নিয়ে চল, তোর অনেক পুরস্কার মিলবে।'

'কিন্তু আমি যে চোখে দেখি না!'

'এখন মাঝরাত, সকাল পর্যন্ত বরং অপেক্ষা করা যাক।' তারা নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করল, তারপর সব চুপচাপ। ফুটোপান বুঝতে পারল, এরা শত্রু-সৈন্য, মুক্তিবাহিনীর গেরিলাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলতে চায়। সে গভীর উদ্বেগের সঙ্গে ভাবল, কীভাবে ওদের খবর পাঠানো যায়। সকালে এরা তো···

সেই গভীর রাতে উপায় খুঁজে না পেয়ে সে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। হঠাৎ সে হাত দিয়ে আশংকে ঠেলামেরে জাগালো। জেগে উঠে আশং জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল ?'

'উঠে চটপট দরজাটা বন্ধ করে দে। ভাল ক'রে আটকাস। তাড়াতাড়ি কর!' আশং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিতেই, ফুটোপান হাতড়ে হাতড়ে জাইলোফোনের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর হাতুড়ি তুলে নিয়ে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে বাজাতে শুরু করল। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে জেগে উঠল 'ড্রাগন নৌকার বাইচ'-এর বলিষ্ঠ সুর। জাইলোফোনের চমৎকার সুর জাগিয়ে তুলল আত্মমগ্ন পাহাড় আর নদীগুলোকে, ছড়িয়ে পড়ল বিশাল আকাশে।

বাজনা শুনে শত্রুবাহিনীর ক্যাপটেন প্রচণ্ড রাগে ছুটে এল। প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল দরজায়। কিন্তু দরজা বন্ধ। গায়ের জোরে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সে চিৎকার ক'রে বলল, 'বাজনা থামা শীগগির, নয়তো তোকে খুন করব।'

কিন্তু বেজেই চলল জাইলোফোন। আরো বলিষ্ঠ হয়ে উঠল তার সুর, সৈন্যদের গর্জনকেও তা ছাপিয়ে গেল। ফুটোপান ভাবল, গুলি চালালে তো ভালই হয়, তাহলেই মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা জানতে পারবে, এখানে শত্রুরা আছে। আমি মারা গেলে আর কী এসে যায়! আমাদের সৈন্যরা এসে এদের ধ্বংস করবে।

বাজনার সুরের মধ্যে দিয়েই ফুটোপান ফুটিয়ে তুলল বহু বছরের অত্যাচার-জনিত ব্যথা এবং শত্রুর প্রতি ঘৃণা। সে আরো জোরে হাতুড়ির আঘাত করতে লাগল। আকাশে বাতাসে সবদিকে ছড়িয়ে পড়ল তার বলিষ্ঠ সুর। অবশেষে বন্ধ

দরজাটা ভেঙে পড়ল। শত্রুবাহিনীর ক্যাপটেন বুনো পশুর মতো ফুটোপানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে তার গলা টিপে ধরল। ফুটোপান শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করল, কিন্তু বেশিক্ষণ লড়তে পারল না। হঠাৎ শত্রুবাহিনীর ক্যাপটেন তীব্র আর্তনাদ ক'রে লুটিয়ে পড়ল। আশং ফুটোপানকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। শত্রুবাহিনীর ক্যাপটেনের কাছ থেকে সে ছিনিয়ে নিল বন্দুকটা, নিচে কী ঘটছে বোঝবার চেষ্টা করল। পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো। ক্যাপটেনের আর্তনাদ শুনে তাঁবেদার সৈন্যরা ততক্ষণে ওপরে ছুটে এসেছে। হঠাৎ চারধার থেকে গেরিলাবাহিনীর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ হল। প্রচণ্ড লড়াইয়ের পর কয়েকজন শত্রুসৈন্য নিহত হল এবং ধরা পড়ল আরো কিছু সৈন্য। বাকিরা তাদের রাইফেল ফেলে দিয়েই দৌড় মারল ভয়ে।

গেরিলাবাহিনীর নেতা এবং অন্যান্য কমরেডরা ছুটে এসে দেখল, আশং উনুনে কাঠ গুঁজে দিচ্ছে। লাল আগুনের শিখায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ছোট্ট আশং-এর মুখ আর হাতের বন্দুকটা। গভীর আবেগে গেরিলাবাহিনীর নেতা ফুটোপানের হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'অভিনন্দন খুড়ো, অনেক অভিনন্দন! তোমার দেশ-প্রেমের বাজনাই আজ শত্রুদের সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে।'

অনুবাদ । বিষ্ণু সাহা

লেখকদের সম্পর্কে

দেশকালের অনিবার্য ভিন্নতা সত্ত্বেও প্রতিবাদে সমধর্মা লেখকদের 'আন্তর্জাতিক' একত্র করেছে তীব্র গদ্যের জৌলুসে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধ-যুদ্ধ চলাকালীন সামরিক বাহিনীর একজন হিসেবে তলস্তয় (১৮২৮-১৯১০) সেবাস্ত-পোলে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধের সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর রোজনামচায় 'সেবাস্তপোলের কাহিনী' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করেন। সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গল্পটি তারই অংশবিশেষ। ১৮৬১-১৯০৫ সালের রাশিয়ার এই সংকটকালীন পর্বে কাউণ্ট তলস্তয়ের সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভাব। বুর্জোয়া বিপ্লবের পূর্বক্ষণে যথার্থ মুজিক-সাহিত্য বলে কিছুই ছিল না। তলস্তয়ের লেখায় পাওয়া যায় ১৯০৫-এর বিপ্লব-পূর্বকালের নিষ্ঠুর শোষণ, অসহায় যন্ত্রণা আর গভীর সমাজ-অনুসন্ধান ॥ ত্রিনিদাদের লেখক মাইকেল অ্যাণ্টনির এখন ছেচল্লিশ বছর বয়স, বর্তমানে মিনিষ্ট্রি অফ কাল-চারে কর্মরত। কবি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে কলম ধরেছিলেন, কিন্তু বর্তমানে এক জোরালো গদ্য-লিখিয়ে। লেখার দিক থেকে অনিবার্য বাস্তব তাঁর আগ্রহের বিষয়। তাঁর বাস্তববোধের সাথে যুক্ত হয়েছে আঞ্চলিকতা যা কেবল সমাজ-কাঠামোর দিক থেকেই তাঁকে কৌতূহলী করে নি, পরন্তু ভাষা এবং সামাজিক আচারের ক্ষেত্রেও এই আঞ্চলিকতা অ্যাণ্টনির লেখায় এক ভিন্ন মাত্রা এনে দেয় ॥ বহু বিখ্যাত উপন্যাস এবং ছোটগল্পের স্রষ্টা জার্মানির সিগফ্রিড লেনৎস (জন্ম ১৯২৬ সালে) প্রত্যক্ষ করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। লেনৎসের লেখায় বিধৃত হয়েছে তাঁর আপস-হীন ঋজু ব্যক্তিত্ব ॥ ফ্রানসের সংগ্রামী সন্তান লুই আরাগঁ (১৮৯৭ সালে প্যারিসে জন্ম) মূলত কবি। নাৎসি-বিরোধী প্রতিরোধের লড়াইয়ের সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিখ্যাত গ্রন্থ 'ফরাসিদের দাসত্ব ও গৌরব' রচনা করেন। সংকলন-ভুক্ত গল্পটির উৎস উল্লেখিত গ্রন্থটি ॥ শ্রমিক পিতামাতার সন্তান আমেরিকার হাওয়ার্ড ফাস্ট (১৯১৪ সালে নিউইয়র্কে জন্ম) শিল্পে মন্দার সময় রুটিরুজির খোঁজে দেশবিদেশ পাড়ি দেন নিতান্ত অল্পবয়সে। এই দীর্ঘ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে কমিউনিজমের ভাবাদর্শে আকৃষ্ট করে। 'সিডনীর জন্য স্মারকলিপি' গল্পে ফাস্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেই লক্ষ লক্ষ মানুষেরই একজন হিসেবে সিডনীকে চিত্রিত করেন। সিডনীর মতো যোদ্ধারা একই প্রজন্মের অন্তর্গত

হওয়া সত্ত্বেও কখনই হারিয়ে যায় না যুদ্ধের জুয়াড়ী অপব্যয়ে, ডামাডোলে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পিতামাতার সন্তান ট্রাভেনের জন্ম আমেরিকার শিকাগো শহরে। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের মেক্সিকোর জনজীবন, বিশেষত আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম বি ট্রাভেনের লেখার মূল উপজীব্য। ট্রাভেনের পুরো নাম সম্ভবত বেরিক ট্রাভেন টরসন। রহস্যময় এই লেখক সচেতনভাবে সতত লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকেছেন। গদ্যে ও পদ্যে সমান পারদর্শী আলবেনিয়ার প্রাক-বিপ্লব পর্বের সাহিত্যের পুরোধা মিগজেনি (১৯১০-৩৮) আলবেনিয়ার সংগ্রামী সাহিত্যের ভিত্তি রচনা ক'রে গেছেন স্বহস্তে। মাত্র আটাশ বছর বয়সে এই সংগ্রামী লেখকের অকাল মৃত্যু ঘটে। প্যালেস্টাইনের আবু রায়েদ এবং লাওসের শিয়াংফেই সোজাসুজি রাজনৈতিক গল্প লেখেন। এঁদের লেখার মূল উপজীব্য হল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা। বুলগেরিয়ার লেখক এলিন পেলিন তির্যক শ্রেণীসচেতন লেখায় সিদ্ধ। পাকিস্থানের রশীদ জাহান আপসহীন সংগ্রামী মনোভাবকে তাঁর লেখায় প্রশয় দিয়েছেন। ভিয়েতনামের প্রথমসারির গল্পকার আন দাক ভিয়েতনামী জনগণের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে একজন প্রথমসারির সৈনিকও বটে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী দীর্ঘযুদ্ধে ভিয়েত-নামী জনগণের সংগ্রামী সত্তার বিবিধ ক্রিয়াপ্রক্রিয়া তাঁর লেখায় মর্যাদা পেয়েছে। বাংলাদেশের পরিচিত গল্পকার হাসান আজিজুল হকের জন্ম ১৯৩৮ সালে। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক। হাসানের লেখা বাংলাদেশের গ্রাম্যজীবনের তীব্র অভিজ্ঞতায় পুষ্ট। একেবারে সরাসরি গল্প লেখেন তিনি। কখনো সমাজ, কখনো কুসংস্কার, কখনো নিয়তি, কখনো অন্ধ বিশ্বাস তাঁর গল্পের বিষয়। এবং সবসময়ই তাঁর গল্পে ঠাসা থাকে মানুষ। মানুষের ক্ষোভ, জ্বালা, প্রেম, হতাশা, বিদ্রোহ তাঁর গল্পে তীব্র এবং উজ্জ্বল। অস্ট্রেলিয়ার 'কমিটেড' লেখক অ্যালান মার্শালের এখন ছিয়াত্তর বছর বয়স। পোলিও রোগের শিকার মার্শালকে ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হয়। সমগ্র অস্ট্রেলিয়া তিনি চষে বেড়িয়েছেন এবং এনিয়ে বহু ভ্রমণকাহিনী লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'I can Jump Puddles' বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত। সাউথ পেনিনসুলা স্কুলে ইংরেজী ও লাতিনের শিক্ষক রিচার্ড রাইভ গল্প লেখা শুরু করেন একেবারে ছাত্রা-বস্থায়। রাইভ (১৯৩১ সালে কেপটাউনে জন্ম) দক্ষিণ আফ্রিকার কুখ্যাত ছয় নম্বর জেলার কৃষ্ণাঙ্গদের বস্তিতে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর ছোটগল্পে কালোদের বিদ্রোহের পাশাপাশি এই অন্ধকার এঁদো বস্তিও আবশ্যিক গুরুত্ব পেয়েছে। চেং ওয়ান-লং চীনের সেই নতুন প্রজন্মের অন্যতম যাঁরা বিপ্লবোত্তর সংগ্রামী লাল চীনে পুষ্ট।

লণ্ডের লেখায় নতুন সমাজব্যবস্থা ও তাঁর যুগ তীব্র হয়ে ওঠে ॥ সংকলনে কিউবার আলেহো কার্পেন্তিয়েরের যে-গল্পটি নেয়া হয়েছে, তার উৎস 'নারাটিভা কুবানা দে লা রেভোলুশিয়েন (১৯০৫)'। সাহিত্যের অধ্যাপক, লেখক, সাংবাদিক, সংগীত-বিশেষজ্ঞ কার্পেন্তিয়ের বহুবছর প্যারিস আর কারাকাসে কাটিয়েছেন। বিপ্লবের পরে ফিরে আসেন কিউবায়। লা হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন ১৯০৫ সালে, ফ্রানসে কিউবার দূতাবাসে কিছুদিন কর্মরত ছিলেন ॥ বেরটোল্ট ব্রেশ্‌ট্ (১৮৯৬-১৯০৫) ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতাসীন হলে জার্মানি ত্যাগ করেন। ১৯৩৯-৪৭ সালে আমেরিকায় কাটান। এপিক থিয়েটারের প্রবক্তা ব্রেশ্‌ট্ কবি ও গল্পকার হিসেবেও জার্মান সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ॥ জঁ-পল সার্ত্র্ (১৯০৫ সালে প্যারিসে জন্ম) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রতিরোধে সমর্পিত আত্মা। জার্মান দর্শনের সংস্পর্শে আসেন ১৯৩৪ সালে বার্লিনে ফরাসি শিক্ষায়তনে থাকাকালীন। অস্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠাতা সার্ত্র্ মার্কসবাদের গভীর অনুরাগী ॥ সোজা সরল ভঙ্গিতে গল্প বলার যে-ভারতীয় রীতি প্রেমচন্দ (১৮৮০-১৯৩৬) আয়ত্ত করেন, 'কফন' গল্পটিতে সেই অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। চীনের কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী চরিত্র 'আ কিউ' সৃষ্টিতে লু স্থন যেমন প্রেমচন্দের হাতে তদ্রূপ ভারতীয় দরিদ্র কৃষক প্রথম মূর্ত রূপ পেয়েছে ॥ এজকেল মেফাহেলী দক্ষিণ আফ্রিকার শক্তিশালী লেখকদের অন্যতম। কালো মানুষের লড়াইয়ের প্রশ্নে 'negritude' ব্যাপারটিতে তিনি কম আস্থাবান ॥